প্রবাস বন্ধু

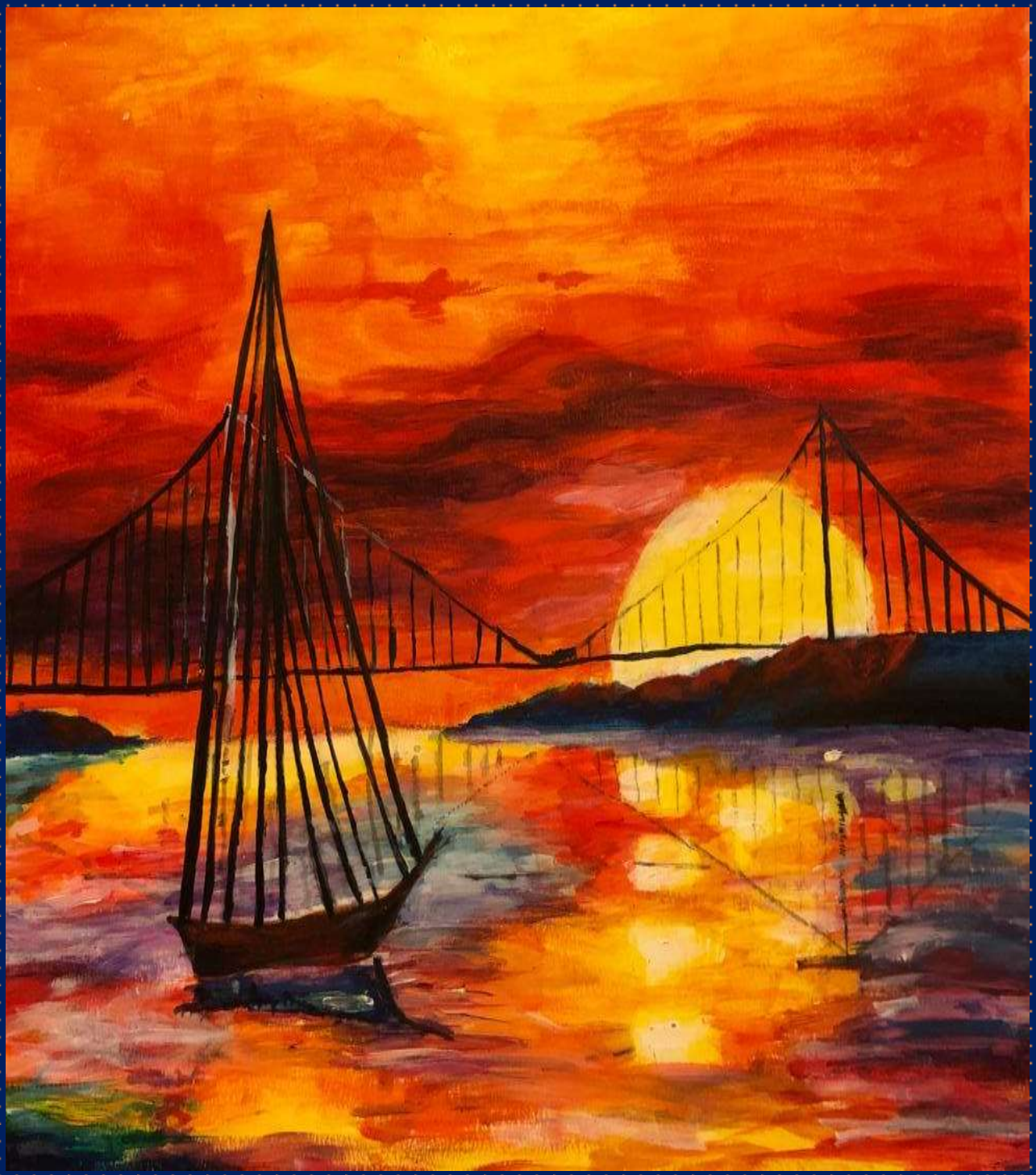

নববর্ষ সংখ্যা ১৪২৮

১৪২৮ : প্রবাস বন্ধু : সূচীপত্র : নববর্ষ সংখ্যা : 2021

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (হিউস্টন, টেক্সাস)	2
গদ্য		
স্মৃতিবাসর: অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	রন্তিদেব সরকার (কলকাতা, ভারত)	3
ডাকাত পদচিহ্ন	অলোক কুমার চক্রবর্তী (কলকাতা, ভারত)	9
মাদার্স ডে	মৃণাল চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	13
আপনজন	সৌমি জানা (বেলমিড, নিউ জার্সি)	15
উত্তরণ	ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	18
সমাধান	সুজয় দত্ত (ক্লিভল্যান্ড, ওহাইও)	21
চক্রব্যূহ	দেবব্রত তরফদার (কলকাতা, ভারত)	28
রক্তঋণ	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	52
কবিতা গল্প স্বপ্ন ইত্যাদি	ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত (কলকাতা, ভারত)	54
কাঠবিড়ালির দুরন্তপনা	হুসনে জাহান (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	58
বাবার স্মৃতিতে	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	62
বন্ধুত্বের রূপান্তর	ভজেন্দ্র বর্মন (হিউস্টন, টেক্সাস)	69
কোদন্ড গ্রহে কুকুন্ড ভাইরাস	শেলী শাহাবুদ্দিন (স্টোন মাউন্টেন, জর্জিয়া)	71
কবিতা		
প্রশ্নের ঋণ	অসিত কুমার সেন (অস্টিন, টেক্সাস)	37
ভাষা, বসন্তের চিঠি	সুজয় দত্ত (ক্লিভল্যান্ড, ওহাইও)	38, 47
চতুষ্টয়, সে	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	39
ইচ্ছেগুলো	সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় (সাউথ ব্রান্সউইক, নিউ জার্সি)	40
উত্তরণ	কমলপ্রিয়া রায় (হিউস্টন, টেক্সাস)	40
আর কবিতা নয়	বৈশাখী চক্কোত্তি (কলকাতা, ভারত)	41
অহল্যা	অনুপ কুমার রায় (কলকাতা, ভারত)	41
মনসঙ্গীত ২, মনসঙ্গীত ৩, মনসঙ্গীত	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	42, 68
অন্তঃসারশূন্য	সুব্রত ভট্টাচার্য (কলকাতা, ভারত)	43
কালো, প্রেমিকা, প্রতিদিন	শ্রাবণী রায় আকিলা (হিউস্টন, টেক্সাস)	43, 44
বন্ধু আমার	কেয়া সেনগুপ্ত (কলকাতা, ভারত)	45
ভিখারী, দহন	গৌতম তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	45
ঘুরন্ত নববর্ষ, সবুজ মন, অতীত জীবন	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	46
হঠাৎ করে, ফিরে চল	শঙ্কর তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	47, 50
অঙ্গীকার, সাঁকো, প্রভেদ	নমিতা রায়চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	48, 49
নীল রঙের পাঞ্জাবিটা	কৃষ্ণা গুহ রায় (কলকাতা, ভারত)	49
নীরব জানালা	পৃথা চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	50
চাওয়া পাওয়া, বন্ধুরা সব	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	51

প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা

বৈশাখ ১৪২৮, এপ্রিল ২০২১

প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ

প্রচ্ছদ ও শেষ পাতা

রিতিকা নন্দী (বয়স ১৫)

সহযোগিতায়

চন্দ্রা দে

রূপছন্দা ঘোষ

ভজেন্দ্র বর্মন

অসিত কুমার সেন

সম্পাদনায়

মালবিকা চ্যাটার্জী

সুজয় দত্ত

সম্পাদকীয়

গত বছর থেকে এযাবৎ আমরা যথার্থই বিপদগ্রস্ত এবং বিপর্যস্ত অবস্থায় কাটিয়েছি | সন্তর্পণে নাক-মুখ ঢেকে, অন্য মানুষের সঙ্গে বিস্তর দূরত্ব বজায় রেখেও পৃথিবীর বুক থেকে লক্ষ লক্ষ চেনা, অচেনা মানুষকে হারিয়ে যেতে দেখেছি দুর্নিবার করোনার প্রকোপে |

এরই মাঝে আমাদের সুখের দিনগুলোও আসা-যাওয়া করেছে | বদলে গেছে স্বাভাবিক স্বভাব, এসেছে নতুন স্বাভাবিকত্ব | প্রতি মাসের শেষে আমাদের সাহিত্য সভার অধিবেশন সম্পন্ন হয়েছে zoom connection-এ | পুজো, জন্মদিন, সভা, উৎসব ইত্যাদি সবই আমরা সেভাবেই উদযাপন করেছি | এসেছে করোনা প্রতিরোধের টিকা | তবু আমরা পুরোপুরি বিপদমুক্ত নই এখনও | 'আশার আশা' আমাদের সবার মনে |

এসেছে নতুন বছর | বাংলা নতুন বছরকে আমরা সাদরে বরণ করে নিই যাতে নতুন ধারায় জীবনের গতি আনন্দময় হয়ে ওঠে | ১৪২৭শে (২০২০) 'প্রবাস বন্ধু' নববর্ষ সংখ্যা আমরা শুধুই অন-লাইন করতে বাধ্য হয়েছিলাম | তখন সবে করোনার দাপট শুরু হয়েছিল, সারা বিশ্ব তখন দিশাহারা |

তারপর পূজা সংখ্যাও তেমনভাবেই প্রকাশিত হ'ল | এই সংখ্যাও কেবলমাত্র অন-লাইনে থাকবে | আমরা new normal-এর পথে পা বাড়িয়েছি |

আশ্চর্য – পার্থিব জীবনে কত কী ঘটে যায়, বদলে দেয় কতকিছু | কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম বদলায় না | নানা দুর্দশার মধ্যেও বছর ঘুরে আসে | ঋতুর রূপে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তারা আসে মহা সমারোহে | সেই উৎসাহেই আমরা যেভাবে পারি সবটা উদযাপন করি | নতুন বছরকে আহ্বান জানানোর সাহিত্য সভা হবে সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করেই | দুবছর আগে পর্যন্ত যেমন কব্জি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া আর দেদার আড্ডাই মুখ্য ছিল এই সভায়, সেই সুখ থেকে আমরা গত বছরের মতো এই বছরেও বঞ্চিত হব | কিন্তু zoom সভায় আমরা এখন বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছি |

সকলের জন্য অনেক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিয়ে আহ্বান জানাই বাংলা নতুন বছরকে |

সব লেখক/লেখিকাদের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ রইল | আমার সহযোগীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই |

এই সংখ্যার প্রচ্ছদ চিত্রটি এঁকেছে রিতিকা নন্দী (বয়স ১৫) |

রিতিকা আমাদের দুর্গাবাড়ির সদস্য শ্রী আশীষ এবং শ্রীমতী শ্রীপর্ণা নন্দীর কন্যা |

রিতিকাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও ভালবাসা জানাই |

মালবিকা চ্যাটার্জী

স্মৃতিবাসর: অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

রন্তিদেব সরকার

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-২০২০) বঙ্গ সংস্কৃতিতে একটি সুরভিত অধ্যায় | সেই সৌরভ থেকে যাবে কালোত্তীর্ণ হয়ে রসিকহৃদয়ে স্থায়ীভাবে | এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস | তাঁর মতো

এমন সর্বরসে রসিকজন, এমন দরদী হৃদয় খুঁজে মেলা ভার | আমি কী করে যে তাঁর ঘাটে তরী বেয়ে এসে নোঙ্গর করলাম, তা ভেবে কূলকিনারা পাই না | তাই এই বিষয়টিকে ঈশ্বরের এক পরম দান বলে কৃতপুটে গ্রহণ করেছি | অবশ্য কাগজে-কলমে আমার একটি বেশ রাশভারী পরিচয় আছে – তা হ'ল গিয়ে কবি আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র প্রথম একক সংকলন-এর ইংরেজি অনুবাদক | এবং এই কৃতিত্ব যতটা না আমার, তার থেকে বেশি অবশ্যই অলোকদার | পঞ্চাশ দশকের এমন এক সাড়া-জাগানো কবি, যাঁর প্রথম কাব্য সংকলন 'যৌবন বাউল' (১৯৫৯) সারা রাজ্যে আলোড়ন তুলেছিল | সেই তো শুরু! তখন আমি অলোকদার ভাষায় নেহাতই ২য় শ্রেণীর এক 'আনপড়ুয়া'| তখন থেকে ক্রমাগত বেরোতে লাগল একের পর এক দুর্বার কাব্যগ্রন্থের মিছিল – 'নিষিদ্ধ কোজাগরী', 'রক্তাক্ত ঝরোখা', যা থামল এসে শেষ কাব্য সংকলন 'বাস্তুহারার পাহাড়তলি'| সব মিলিয়ে পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে তাঁর অসামান্য সংকলনগুলি | তার প্রতিটি, সারা বিশ্বজুড়ে এক সময়ের দলিল | সমাজের দর্পণ |

সেটা ২০০৫ সাল | ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক হল্ডেন সাহেবের বাংলা জীবনীকার প্রয়াত গৌরীশংকর রায়চৌধুরি টেলিফোনের মাধ্যমে তাঁর বাড়িতে বসেই আলাপ করিয়ে দিলেন অলোকদার সঙ্গে; কেননা সেই সময় আমি সবে অনুবাদের কাজ শুরু করেছি এবং নেহাত কৌতূহলবশতঃ একটি শারদীয়া সংখ্যায় তাঁর একটি দুরূহ গদ্য কবিতা অনুবাদ করেছি | সেটি দেখেই গৌরীশংকরবাবুর ভাল লেগে গেল এবং উনি চাইলেন তাঁর কবিতাটির ইংরেজি তর্জমাটি যেন আমি অলোকদার কাছে পাঠাই | কিন্তু আমার কাছে অলোকদার কোন যোগাযোগ মাধ্যম না থাকায় সহৃদয় গৌরীদা স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে আমার সঙ্গে আলাপটি করিয়ে দিলেন | তারপর অবশ্য আর ফিরে তাকাতে হয়নি | অলোকদার কাছে ই-মেল মাধ্যমে আমার করা প্রথম প্রয়াসটি পাঠিয়ে দিতেই উনি 'I like your transcreation' বলে তাঁর পছন্দ বয়ান করলেন, এবং কী আশ্চর্য, তাঁর প্রথম 'মেল'-এই জিজ্ঞেস করলেন আমার অনূদিত কাব্যের কোন সংকলন প্রকাশ করার কোনো ইচ্ছে আছে কিনা | আমি এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করিনি | জানতাম এই দায়ভার খুব সহজ কাজ হবে না কিন্তু কোথাও আমার ভিতরে যেন এক অদৃশ্য শক্তি চালিত করল আমাকে, আর সেই অজানা শক্তির উপর ভর করে লিখেই ফেললাম যে 'আমি যদি কারও কবিতা নিয়ে অনুবাদ সংকলন করি তা আপনার কবিতা নিয়েই'| এবং ২০০৫ থেকে শুরু হ'ল অলোকদার কাব্য সংকলন সংগ্রহ করা | চল্লিশটি অনূদিত কবিতা নিয়ে প্রকাশ পেল আমার প্রথম প্রকাশন – 'লিখে রাখি রুপোলি ডানায়' বা 'Scripted on Silvery Wings' কাব্যগ্রন্থ | মাননীয় অগ্রজ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাত দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ পেল বইটি জীবনানন্দ সভাঘর-এ ২০০৭ সালে | তারপর আরো দুইটি ভাষান্তরিত কাব্য সংকলন | তারপর থেকেই আমার আর কবির সম্পর্ক আরও গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল | তখন আর অনুবাদক নয়, নিজের ছোট ভাই হয়ে গেছি অজান্তেই | এ এক আশ্চর্য সংবেদনশীল সম্পর্ক | একে সংজ্ঞায়িত করা মুশকিল | এ এক অটুট বন্ধন | তিনি যেখানেই যান না কেন, সঙ্গী হিসেবে, বলা যায় ছায়াসঙ্গী হিসেব আমি সদাই পার্শ্বচর | তাঁর সঙ্গে বহু জায়গায় গেছি | সেখানে কিন্তু আমার পরিচয় 'বন্ধু'| বয়সে কুড়ি বছরের ফারাকটা তিনি কবেই যেন ঘুচিয়ে দিয়েছেন | তাঁর সফরসঙ্গী হয়ে যাওয়ার কয়েকটি অবিস্মরণীয় সফর এখানে বয়ান

করলাম।

ঠিক হ'ল অলোকদা আর আমি বর্ধমান যাব। তপু অর্থাৎ আমার সহকর্মী বন্ধু তপন চক্রবর্তী একদিন অলোকদার যাদবপুরের বাড়িতে এল অলোকদার সঙ্গে আলাপ করার তাগিদেই, বর্ধমান থেকে সোজা কলকাতায় । আমি অলোকদাকে ফোন করে তপুকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম যাদবপুরের ফ্ল্যাটে। আলাপ পর্ব শেষ হবার পর তপু বর্ধমানে তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য আকুল আমন্ত্রণ জানাল অলোকদাকে, বর্ধমান শহরের ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত দেখানোর আশ্বাস দিয়ে। অলোকদা সম্মতি জানালেন। সকালবেলায় ব্রেকফাস্ট সেরে আমার গাড়িতে রওনা দেব বর্ধমানের উদ্দেশ্যে। সারাদিন থেকে আবার বিকালে ফেরা। ফোনে তপুকে এই সুখ-সংবাদ পরিবেশন হ'ল। সে তো, বলাই বাহুল্য, আহ্লাদে ছত্রিশখানা। রাত্রিবেলা হঠাৎ অলোকদার ফোন – 'রন্তি, একটা সমস্যা হয়েছে। অপর্ণা আমার কাছে এসে খুব কান্নাকাটি করছে, কী করি বলো তো?' আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। কাল অলোকদার সঙ্গে বর্ধমান যাবার সব ঠিক। এ আবার কোন বিপত্তি! পর মুহূর্তেই অলোকদা প্রাঞ্জল হলেন – 'অপর্ণা কাল আমাদের সফরসঙ্গী হবার জন্য বিষম বায়না ধরেছে।' আমার কাছে এক মুহূর্তে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আসলে অলোকদাকে আমি ভালমতো চিনি, এরকম কিছুই হয়নি, এই স্ক্রিপ্টটা পুরো অলোকদার তৈরি। আমি নিশ্চিত এসব কিচ্ছু ঘটেনি। অপর্ণা হয়তো রোজকার মতো বেড়াতে এসেছিল, তখন অলোকদাই অপর্ণাকে বলেছেন নিশ্চয় – 'অপর্ণা, রন্তি আর আমি বর্ধমান যাচ্ছি, তুমি কি যেতে চাও?' আর অপর্ণা তো একপায়ে খাড়া। এমনটাই ঘটে থাকবে বলে আমার বদ্ধমূল ধারণা। তা আমি বোকা সাজলাম, 'সমস্যাটা কোথায় অলোকদা, অপর্ণা যদি যেতে চায় নিশ্চয় যাবে, ও তো আমাদের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।' অলোকদার আবার সেই দুষ্টুমি মাখানো ছেলেমানুষি গলা, 'না তোমার গাড়িতে যাব যখন তোমার একটা অনুমতি দরকার।' বুঝতে আর কিছু বাকি রইল না আমার। পরের দিন সকালে অলোকদার ফ্ল্যাটে যথারীতি ব্রেড-টোস্ট-বাটার-অমলেটের অমোঘ ব্রেকফাস্ট খেয়ে রওনা দিলাম। আমার পাশে অলোকদা আর পিছনের সীটে অপর্ণা।

গাড়ি কলকাতার যানজট ছাড়িয়ে দুর্গাপুর হাইওয়েতে পড়তেই অলোকদার প্রস্তাব, 'চলো অন্তাক্ষরী খেলা যাক।' অপর্ণা শিশুর খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল, 'দারুণ প্রস্তাব'। অলোকদার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, 'রন্তি, তুমি আমি একদিকে, আর অপর্ণা বিপক্ষ পার্টি। তা সত্ত্বেও যে আমরা অপর্ণার সাথে পাল্লা দিতে পারব এমন নিশ্চয়তা তোমাকে দিতে পারছি না।' শুরু হ'ল খেলা। আমাদের, বিশেষ করে আমার, রবীন্দ্রসঙ্গীত-নির্ভরতা আর মাঝে মধ্যে বলিউডি ভরসা। অপর্ণা তো গানের মানুষ কিন্তু আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম অলোকদার গানের ঝুলি শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতে সীমাবদ্ধ নয়, বলিউড গানেও কী সহজ সাবলীল বিচরণ! সেই পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তর দশকের মুকেশ সাহেব থেকে শুরু করে রফি সাহেব, লতাজি, আশাজি এমনকি বেগম আখতার, সায়গল সাহেবের গান কী অবলীলায় গাইছেন। আমি বারে বারে গাড়ি চালাতে চালাতে আড়চোখে এই আড়-ভাবুকের দিকে চাইছি। কী অপরিসীম রসের আধার এই মানুষটি! সঙ্গীতজ্ঞ মা নীহারিকা দেবীর কাছে উনি যে এককালে প্রথাগতভাবে গানের তালিম নিয়েছিলেন তা তাঁর পরিশীলিত গায়কী শুনলে বোঝা যায়। বয়সের ভারে গলায় কিছুটা ভাটার ছাপ পড়লেও জাত চিনতে অসুবিধে হয় না। এদিকে অন্তাক্ষরী খেলায় অপর্ণাকে পরাস্ত করার আমাদের যৌথ প্রচেষ্টা ক্রমাগত ব্যর্থ হতে লাগল। আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। অলোকদা বলে উঠলেন, 'বৃথা চেষ্টা, রন্তি। আমাদের এই গৌরবজনক হারের জন্য যাবতীয় দায়ভার আমার। কেন যে জেনেশুনে এমন প্রস্তাব দিলাম!' আমি বললাম, 'অপর্ণার গলায় একটা হার-মানা-হার পরিয়ে দিলেই হয়। বর্ধমান একটা বড় জেলা শহর, এখানে আশা করা যাক এই 'হার' পাওয়া যাবে।' সবাই মিলে হো হো করে হেসে উঠল। তালে তালে কখন সময় বয়ে গেছে সুরের ছন্দে মশগুল হয়ে তা টের পাওয়া যায়নি। প্রায় ঘন্টা দেড়েকের জার্নি তবু মনে হ'ল এই তো জার্নি শুরু হ'ল কিছুক্ষণ মাত্র আগে। তাও দেখি গাড়ি চলে এসেছে শক্তিগড়ে। হাইওয়ের দুদিকে অগুণতি গাড়ি আর স্টেট বাসের সমাবেশ। অলোকদাকে সে কথা জানাতেই কৌতুকভরা চোখে বলে উঠলেন, 'ল্যাংচাশায়ার-এ এসে গেছি?' আবার কোরাস হাসির ছররা উঠল। ল্যাংচাশায়ার, থুড়ি শক্তিগড় থেকে বর্ধমানের দূরত্ব খুব বেশি নয়। দেখতে

দেখতেই বর্ধমান শহরে ঢুকে পড়ল গাড়ি | বড্ড ব্যস্ত এখানের ট্র্যাফিক | হাইওয়ের ডানদিকে একটা গলি ঢুকলেই শ্রীপল্লী অফিসার্স কলোনি | গাড়ি তপুর সাজানো বাড়ির সামনে | অলোকদাকে নামিয়ে দিতেই তপু-মীনা, গোরার উচ্ছ্বাস বাঁধ ভেঙে গেল | অলোকদাকে ওদের জিম্মায় দিয়ে আমি গাড়ি পার্ক করে ঘরে ঢুকেই দেখি মজলিস জমজমাট | তপুর ড্রয়িংরুম আলো করে বসে আছেন অলোকদা ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে | সোফার দুরূহ এক কোণে জড়সড় অপর্ণা | স্বাভাবিক, ও পুরো নবাগতা | অলোকদার মতো একজন প্রথম সারির সেলেব ঘরে থাকতে অপর্ণার নবীনবরণ কেই বা করতে যাবে! অপর্ণা সোফার সুদূরতম কোণে বসে এই ফ্যানাটিজম বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে, মুখে মিটিমিটি হাসি ঝুলিয়ে | তপু, তপুর স্ত্রী মীনা, তপুনন্দন গোরা, তপু-ভাইঝি মুনমুন আর রূপা আর আমরা অন্তাক্ষরী-ত্রয়ী, মানে ছোট্ট ঐ মধ্যবিত্ত পরিসরে নাই-নাই করেও আটজনা, মানে ছোটখাটো জনতা | আমি ঢুকতেই অলোকদার স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক – 'সুমন্ত্র এসে গেছে, ওকে বসার জায়গা দাও তপু |' আমিই যে এই দলের সারথি, তাই এ হেন সম্বোধন, তা বুঝতে পেরে সবাই বেশ উপভোগ করল অলোকদার রসিকতা | এদিকে দীর্ঘদিন তপুর বাড়িতে যাতায়াতের সুবাদে আমার সঙ্গে মীনার এক আভ্যন্তরীণ সংযোগ গড়ে উঠেছে, যা একান্তভাবেই আমাদের | তাই নাটকের পরের দৃশ্য আমার মুখস্থ | আমাকে অপাংগ ইঙ্গিত হেনে রান্নাঘরের দিকে ডাকবে | তারপরের দৃশ্য – মীনা লোকচক্ষু আড়াল করে কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করবে, 'রন্তিদা, এখনই কি লুচি-আলুর দম দিয়ে দেব, না চা-টা আগে দেব?' আমি যাই বলি না কেন, মীনা ঘাড় কাত করে সেই কাজটা করবে, কোনো প্রশ্ন নয় | তপুর ঘরে আমি যেমনটি বলব, সেটিই চূড়ান্ত | তপু এসব ব্যাপারে নাকি, মীনার ভাষায় – 'আপনার বন্ধুটি এসব ব্যাপারে একেবারেই অচল'| তা আমি বেশ মজা পাই | মীনা ভাল রান্না জানলেও তার আবার আমার কালিনারি দক্ষতায় অগাধ ভক্তি | আমার ছাত্রীও বটে | যাইহোক, মুহূর্তের মধ্যে মীনা ড্রয়িংরুমে অত্যন্ত দ্রুততায় লুচি-আলুর দমের মতো লোভনীয় নাস্তা নিয়ে অলোকদার সামনে সেন্টার টেবিল সুসজ্জিত করল | তাই দেখে খাদ্যের সুরসিক অলোকদার চোখেমুখে এক স্বর্গীয় দীপ্তি উদ্ভাসিত হ'ল | তাই দেখে আমার কপট আপত্তি, 'মীনা, তুমি এসব কেন করতে গেলে? আমরা তো জলখাবার খেয়েই বেরিয়েছি | তাছাড়া আমরা না হয় বাদ, এই মানুষটার বয়সের কথা তো তোমার বিবেচনা করা উচিত |' তাই শুনে অলোকদার বিগলিত প্রতিক্রিয়া দেখার মতো হয়েছিল | 'তপু দেখেছ, রন্তি বয়স তুলে কথা বলছে |' এটাও যে কপট ভাষণ, তা আমি বিলক্ষণ জানি | শরীরি ভাষায় এক অনিশ্চিত দোলাচলের প্রতিসরণ, যাতে তিনি আমার সদ্য উক্তির পক্ষে না বিপক্ষে কিছু বোঝার উপায় নেই তবু নরম প্রতিবাদে আমার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠলেন, 'না না, এসবের কোনো দরকার ছিল না, মীনা |' মীনা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'রন্তিদা'! আমি ইশারায় মীনাকে চুপ করিয়ে সোফায় নিজের অবস্থান দখল করে ধূমায়িত লুচি-আলুর দমের খোপকাটা থালা নিজের কোলে টেনে নিয়ে বললাম, 'আরে ঠিক আছে মীনা, তোমার এই পরিশ্রম আমরা ব্যর্থ হতে দেব না | আর যতই হোক, আমরা সেই কোন সকালে দু-পিস পাউরুটি-অমলেট খেয়ে বেরিয়েছি, এখন দশটা বাজতে চলল, কখন সেসব ধুসপাশ হয়ে গেছে | তাছাড়া এমন সনাতনী বাঙালি জলখাবারকে সঠিক মর্যাদা দিতে না পারাটাও তো সইবে না, কি বলুন অলোকদা?' বলেই আমি অলোকদার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চোখ মেলাই, তাতে অলোকদার সমর্থন ষোলোআনা | 'নিন দেরি করবেন না, প্লেটটা তুলুন স্যার |' অলোকদার এক অলৌকিক হাসি ঠোঁটে | অপর্ণার দিকে মীনা প্লেট বাড়িয়ে ধরল, লাজুক লাজুক ভঙ্গিতে অপর্ণা খাওয়া শুরু করল |

চা-এর পর্ব চলতে-চলতেই শহরের কোথায় কোথায় যাওয়া হবে তার এক রুট-প্ল্যান ব্রিফ করল তপু | বর্ধমান শহর মানেই ইতিহাসের এক ছিন্নপত্র | বিশেষভাবে বলতে গেলে সবার আগে যে নামটি উঠে আসে তা শেরশাহ | তার সঙ্গে বিখ্যাত মুঘল সুন্দরী নূরজাহান | তাদের সমাধি এই বর্ধমানে | সেগুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য | এছাড়াও আরো অনেক দর্শনীয় ঐতিহাসিক স্থান ছড়িয়ে রয়েছে | ঠিক হ'ল, বেরিয়ে পড়া হবে এক্ষুণি, ঘন্টা দুই যথেষ্ট | আমার গাড়ি তো রয়েছেই | রান্নাঘরের করিডর থেকে আবার মীনার ইশারা | বুঝলাম এটা অনিবার্যভাবে মধ্যাহ্নভোজ সংক্রান্ত | কাছে যেতেই জিজ্ঞাসা, 'খাসির মাংস অলোকদা খান তো? তবে মাছের একটা পদ

থাকছে | তৎসহ মুগডাল, বেগুনভাজা, ধোঁকার ডালনা, চাটনি'| 'চমৎকার, কিছুই তো বাকি রাখোনি প্রায় | এ তো মহাভোজ! তুমি নিশ্চিন্তে চালিয়ে যাও মীনা | আজ তোমার অ্যাসিড টেস্ট'– বলেই প্রস্থান করি বেরোবার তাগিদে | পিছন থেকে মীনার স্বগতোক্তি শুনতে পাই, 'ইস, আপনি আজ পাশে থাকলে বড়ই ভরসা পেতাম | আমাকে এই অগ্নিপরীক্ষায় ফেলে দিয়ে আপনি তো বেশ চলে যাচ্ছেন আর আমার রক্তচাপ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে | এই শীতেও ঘামছি |'
আমি গাড়ির দিকে এগোলাম |

আমরা চারজন | আমাদের দলে একটি মাত্র স্থানীয় সংযোজন – তপু | গাড়িতে সবাইকে তুলে বেরিয়ে পড়লাম | উত্তুরে শীতহাওয়া আর নম্র সোনালি রোদের চমৎকার সংমিশ্রণে আদর্শ বেড়ানোর আবহাওয়া | বর্ধমান শহরের একটা পৌরাণিক রূপ আছে | রাজা মহতাবের শহর | মাঝেমাঝেই ঝলক দেখা যাচ্ছে ইতিউতি রাজ-ইমারতের নমুনার | ভাঙাচোরা দালান আর তারই মাঝে ঝকঝকে অট্টালিকার সহাবস্থান | মূলত কৃষিপ্রধান শহর | অন্যদিকে অন্যতম আকর্ষণ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় | অলোকদা সাগ্রহে জানালায় চোখ রেখে সব দেখছেন | আমার সামনে জনাকীর্ণ রাস্তা | এই শহরে ট্রাফিকের মজা হ'ল, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ নিয়ম মেনে চলে, ট্র্যাফিক রুলের প্রতি খুব যে আনুগত্য, তা জোর দিয়ে বলা যাবে না |
অলোকদা মাঝে মধ্যেই চমকে চমকে উঠছেন | 'দেখো রন্তি, আমাদের এই গাড়ির আরোহীদের প্রত্যেকের প্রাণরক্ষার দায়িত্ব এখন তোমার হাতে | তোমার হীনযান, আর আমি ক্ষীণপ্রাণ |' সবাই একচোট হেসে নিলাম |
এরপর তপু গাইডসুলভ দক্ষতায় আমাদের সব দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল | সেইসব ইতিহাসবৃত প্রাচীন রুক্ষতায় ঢাকা মলিন মর্মর স্থানগুলি অলোকদা সবিশেষ আগ্রহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন | ভ্রমণজনিত ক্লান্তির কোনরূপ লক্ষণ দেখা গেল না | পরিব্রাজকের উৎসাহ নিয়ে ঘুরলেন সারাক্ষণ | মনে মনে অলোকদার তারিফ না করে পারলাম না | এই বয়সেও তারুণ্যের এনার্জি | ঘন্টা দুয়েকের সফর শেষে ফিরে এলাম তপুর বাড়ি | মীনার উষ্ণ অভ্যর্থনা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল |
আবার তপুর ড্রয়িংরুম | হঠাৎ ঘরের কোণে একটি টুলের উপর রাখা এস্রাজ দেখে অলোকদা নিজেই উঠে গিয়ে যন্ত্রটি হাতে তুলে নিলেন | 'বাঃ চমৎকার! এই যন্ত্রটি কার? কে বাজায় এটি তপু?' সলজ্জ মুদ্রায় তপু জানায় যে ঐ এস্রাজটি তারই কিন্তু এখনো বাজাতে শেখেনি | অলোকদা তা শুনে বেজায় খুশি হলেন কিন্তু এখনো কেন তপু এটা বাজাতে শেখেনি বলে মৃদু বকুনি হজম করতে হ'ল তপুকে | তারপরই যন্ত্রটি নিয়ে সোফার কোণে বসে ছড় টেনে পেশাদারি দক্ষতায় একটি রবীন্দ্র সংগীতের নিখুঁত সুর তুলে উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করলেন | দীর্ঘদিন অনুশীলন না থাকা সত্ত্বেও কী অনায়াস দক্ষতায় তিনি বাজালেন! সম্মিলিত প্রশংসা উপেক্ষা করে বললেন, এটায় তেমন কিছু কৃতিত্ব নেই | কেননা কোনো একটা সময় শিখেছিলেন বলেই বাজাতে সক্ষম হলেন | বললেন, 'তারচেয়ে এসো, তপুর প্রশংসা করা যাক যে সে এই অসাধারণ বাদ্যযন্ত্রটি কিনেছে শিখবে বলে | সবাই এমন এক বাদ্যযন্ত্র কেনার কথা ভাববেই না | এখানেই তপু স্বাতন্ত্র্য দাবি করে |'
সময় গড়িয়ে যায় | ক্ষিদের পারদ ঊর্ধ্বমুখী | ঠিক এমন সময়ে মীনার সাদর আবাহন | 'খাবার কিন্তু রেডি | রন্তিদা, আপনি অপর্ণা আর অলোকদাকে নিয়ে আসুন, আমি ততক্ষণে প্লেট সাজাই |' সেইমতো আমরা একে একে খাবার টেবিলে জড়ো হলাম | অলোকদাকে ঘিরে আমরা সবাই বসে পড়লুম | মেনু শুনে অলোকদা মীনার তারিফ করলেন | বললেন, 'এ তো রাজভোগ'! মীনা অবশ্য ভালভাবেই জানে অলোকদা কতটা খাদ্যরসিক | সবাই আমরা মীনার রন্ধনকলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ! হঠাৎ এক ছন্দপতন – অলোকদার গলায় মৎস্য-কন্টক! গোরা ডাক্তারি লাইনের ছেলে | সন্না-টর্চ নিয়ে দৌড়ে এসে অলোকদার গলা পরীক্ষায় ব্যস্ত | ঠিক সেই সময় মীনা আমার কাছে জানতে চাইল আমার আর কিছু লাগবে কিনা | আমি বললাম, 'একটা মাংসের আলু দিলে মন্দ হয় না | বড়ই প্রিয় আমার |' মীনা এনে দিল আমার পাতে | একটু পরেই আলোকদার কণ্ঠলগ্না মৎস্য-কন্টক গোরার হাতে | অলোকদার চোখেমুখে স্বস্তির ছায়া | স্বাভাবিক হতেই অলোকদার মুখে কৌতুকের স্বভাবসিদ্ধ ঝলকানি – 'তপু তুমি কি দেখেছ, আমি যখন কন্টকিত হয়ে জেরবার, তখন রন্তি মাংসের আলু চাইল!

ওকে কি 'দয়ালু' বলা যাবে?' অলোকদার এহেন রসিকতায় ঘরময় উঠল হাসির হিল্লোল|

দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম নিয়ে আমরা সেদিনই আবার সন্ধ্যের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে এলাম, এক অবিস্মরণীয় সফর সেরে | শরীর ক্লান্তির কথা জানালেও মন ছিল কানায় কানায় ভরা সফর-সুধায় | তবু আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে ভবিষ্যতে যদি আবার কোনোদিন বর্ধমান আসতে পারি তবে অবশ্যই একটা রাত্রির বিশ্রাম জরুরী | অলোকদা তাতে মোহর দিয়ে আমার উদ্দেশে বললেন, 'তোমার পক্ষে এতটা রাস্তা গাড়ি চালিয়ে আবার সেইদিনই ফিরে আসাটা, খুবই ক্লান্তিকর| এরপর আমরা তাই করব| যেদিন যাব, সেদিন তপুর বাড়ি রাত্রিবাস করে পরের দিন ফিরব|'

অবশেষে তেমন সুযোগ দরজায় এসে হাজির| পরের বছর, অর্থাৎ ২০১৭, বর্ধমানের উপকণ্ঠে কৃষ্ণপুর-কুকুরা গ্রামে মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্তীর জন্মোৎসব পালিত হবে | আয়োজকেরা অলোকদার যাদবপুরের ফ্ল্যাটে এসে হাজির | আমি সেদিন উপস্থিত ছিলাম না বলে অলোকদা আয়োজকদের পরের দিন আসতে বললেন, কেননা অলোকদা আমি ছাড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি | আমি যে তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী এবং যেহেতু আমার গাড়িতেই অলোকদা যেতে পছন্দ করেন, তাই আমি সেইদিন যেতে পারব কি না জানার জন্য আমার থাকাটা জরুরী ছিল | পরের দিন আয়োজকরা আবার এলেন এবং আমাকেও এই অনুষ্ঠানে যাবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালেন অলোকদার সঙ্গী হিসেবে শুধু নয়, বিশেষ অতিথি ও কবি হিসেবে | অলোকদা যাবেন উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি হিসেবে | উৎসব অনুষ্ঠিত হবার দিন ছিল ৮ই ফেব্রুয়ারি | কথা হ'ল, আয়োজকদের তরফ থেকে দুইজন থাকবেন দুর্গাপুর হাইওয়েতে ঠিক বর্ধমান পূর্তভবনের কাছে ফ্লাইওভারে ওঠার আগে | আমাদের যাতায়াতের খরচ আয়োজক কমিটির দায়িত্ব|

সেইমত ৮ই ফেব্রুয়ারি সকালবেলা বেরোনোর আগে পোশাক পরতে গিয়ে একটা আইডিয়া মাথায় খেলে গেল| ভাবলাম অলোকদা সব অনুষ্ঠানেই প্রিয় সাদা পাজামা-রঙিন পাঞ্জাবিতে ভূষিত হয়ে যান | তাহলে আমিও যদি ট্রাউজার শার্টের বদলে পাজামা-পাঞ্জাবি পরি তাহলে বেশ মজা হবে| অলোকদাকে একটা বেশ চমক দেওয়া যাবে আর এতে অলোকদা নির্ঘাত খুশি হবেন | যেই ভাবা সেই কাজ | ওয়াড্রোব খুলে হাতের কাছেই একখানা পাতিয়ালা ধুতি পেয়ে গেলাম আর তার সাথে মেরুন পাঞ্জাবিতে সজ্জিত হলাম | শীতের প্রকোপ বেশ কমে এসেছে বলে আর সোয়েটার-চাদরের তেমন প্রয়োজন ছিল না | গাড়ি নিয়ে সোজা অলোকদার যাদবপুরের ফ্ল্যাটে ৮টার আগেই পৌঁছে গেলাম| দোতলায় অন্দরমহলে ঢুকতেই দেখি অলোকদা টেবিলে বসে কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে কাপের ঈপ্সিত গতিপথ থমকে গিয়ে প্রবাদ বাক্যের মতো কাপ আর ঠোঁটের মাঝে ভাসমান রয়ে গেল| তাঁর অপলক দৃষ্টি অপাঙ্গে আমার আপাদমস্তকের উপর স্থির হয়ে আছে| আমার অবস্থাও তথৈবচ| এমন স্থাণুবৎ অবস্থান থেকে আমরা দুইজনেই প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলাম, 'এটা কী রকম হ'ল |' খুলে বলা যাক | আমি যেমন অলোকদাকে চমক দেবার ও একইসঙ্গে খুশি করার বাসনা নিয়ে এই অপ্রত্যাশিত ভেকবদলের ছক কষেছিলাম, অপরদিকে অলোকদাও সেই একই ফর্মুলায় প্রিয় পোষাক পাজামা-পাঞ্জাবির খোলস ছেড়ে ট্রাউজার-শার্টে নিজেকে সাজিয়েছিলেন | এ তো O.Henry-র বিখ্যাত ছোটগল্প Gift Of The Magi-র মোড়কে মোড়া আখ্যান হয়ে গেল প্রায়| আমরা সাত সকালে এমন এক ভারি মজার অভিঘাতে ঘরের সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম|

ব্রেড-বাটার-টোস্ট-অমলেট সাথে অলোকদার প্রিয় ব্ল্যাক-কফি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম মঙ্গলকাব্য রচয়িতা মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্তীর জন্মভিটে, কৃষ্ণপুর-কুকুরা গ্রামের উদ্দেশে | কলকাতার ট্র্যাফিকের চিরন্তন জট ছাড়াতেই যা সময় লাগল, তারপর তো গোটা দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ে যেমন সিল্কি মসৃণ তেমনি ফাঁকা | সওয়া ঘন্টার মধ্যেই শক্তিগড় পার হয়ে বর্ধমান পূর্তভবনের ফ্লাইওভারের কাছে পৌঁছে গেলাম | কমিটির দুজন মানুষকে আমরা সহজেই শনাক্ত করতে পারলাম, পাশাপাশি ওরাও গাড়ির রঙ আর গাড়ির ইতস্তত চলন দেখেই আন্দাজ করতে পেরেছিল | ওদের দুজনই ঐ গ্রামের মানুষ আর ভারি সহজ সরল তাদের কথাবার্তা | তাদের মুখে গ্রামের মহাকবির জন্মোৎসবের কথা, তাদের কথা শুনতে শুনতেই আধঘন্টার

ভিতর গাড়ির অভিমুখ ডানদিকে গ্রামের দিকে চলতে লাগল। ঢুকতেই বিশালাকায় তোরণদ্বার। উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি অলোকদার নাম বড় আখরে জ্বলজ্বল করছে। কিছুদূর গিয়েই বাঁদিকে একটি দোতলা বাড়ির সামনে গিয়ে আমাদের নামিয়ে দিল। সঙ্গী দুজন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সেই বাড়ির দোতলায়। দেখেই বোঝা যায় সম্পন্ন চাষীর ঘর এটি। পিছনে বিশাল বড় ধানে নিকোনো খামার সেখানে প্রচুর পাখির কিচিরমিচির সমাবেশ। নিচতলায় অতিথিদের জন্য বড় কড়াই-ডেকচিতে রান্না চেপেছে। তাদের পাশ দিয়ে আমরা দোতলায় উঠে একটি মধ্যবিত্তিয় ঘরোয়া নকশাকাটা পালঙ্কে বসলাম। একটু পরেই একটি স্থানীয় গ্রাম্য কিশোর মিষ্টি-জল-চা ইত্যাদি খুব সিরিয়াসলি পরিবেশন করে দিয়ে গেল একটি ট্রেতে করে। অলোকদা স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তার নাম জিজ্ঞেস করাতে সে খুব কাঠ-কাঠ হয়ে তার নাম বলল – সুশীল। সুশীল-বিদায়ের আশু পরেই অলোকদা ওয়াশরুমে চোখমুখ ধুয়ে প্রথমেই প্যান্ট-জামা ছেড়ে তাঁর প্রিয় পাজামা-পাঞ্জাবিতে অধ্যুষিত হলেন। আর সংলগ্ন খোলা ছাদে গিয়ে গ্রামীণ দূষণমুক্ত হাওয়া বুকভরে নিতে লাগলেন। সব সময়ই নগরকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে কংক্রীটের ঝকঝকে জঙ্গলের সাজানো গোছানো জায়গার থেকে এই গ্রামের পরিবেশ যে অলোকদাকে সেই মুহূর্তে অনেকটাই স্বস্তি এবং আনন্দ দিয়েছে তা তাঁর হাবভাবেই স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। আমার কাছে তো এই গ্রাম্য পরিবেশ আমাকে মাটির টান ফিরিয়ে দেয় বারে বারে, আর সে কারণেই আমি সুযোগ পেলেই যে কোনো গ্রামে যেতে প্রাণের টান খুঁজে পাই। একটু পরেই একটি কিশোর এসে খবর দিল যে রান্না হয়ে গেছে এবং আমরা চাইলে ওরা মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করে উপরে পৌঁছে দিতে পারে। অলোকদা তো বাড়ির বাইরে কোনো ডাল-ভাত-ঝোলের ব্যঞ্জনে জিহ্বাপাত করেন না; অস্বস্তি বোধ করেন। এই কথা শুনে তারা আশ্বাস দিল যে তারা শুকনো খাবারের ব্যবস্থাও রেখেছেন। অলোকদা সম্মতি জানালেন শুকনো খাবারে; আর আমার জন্য ডাল-ভাত-মাছের সম্পূর্ণ বাঙালি খাবার। মধ্যাহ্নভোজ সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে মহাকবির ভিটেমাটির পবিত্র বাসস্থানে। সেখানে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান সেরে মূল মঞ্চের দিকে রওনা দিলাম অলোকদা আর আমি। বিশাল মঞ্চ। চারিদিক ঘেরা। গ্রামবাসীদের উদ্দীপনায় মুগ্ধ হতে হয়। এই জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে গোটা গ্রাম যেন সামিল। স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুল-ইউনিফর্মে পতাকা-ড্রাম-বিউগল নিয়ে গোটা গ্রাম ফেরি করছে। কী অদ্ভুত উন্মাদনা। দেখার মতো। অলোকদা তো দেখেশুনে রীতিমতো চমৎকৃত। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'রন্তি, এখানে না এলে এই অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থাকতে হতো। এখন মনে হচ্ছে আমাদের আসা সার্থকতা পেল। অপূর্ব!' মঞ্চে প্রবেশ করার আগে দেখা গেল স্কুলের ছেলেমেয়েদের গ্রাম পরিক্রমা শেষে লাইন দিয়ে মঞ্চের মূল প্রবেশদ্বারে ঢুকছে। গেটে স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী ইশারায় আমাদের এখানেই থামতে বলল। আমরা গাড়ির মধ্যে বসে আছি। হঠাৎ দেখা গেল এক স্বেচ্ছাসেবক যুবককে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসতে। সেই যুবক আমাকে ইশারায় গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলল। আমি নামতেই জিজ্ঞাসা করি, ওরা কী চাইছে। তাদের নাকি আমাকেই দরকার। অলোকদার কথা বলতেই জানাল, 'পরে'। অগত্যা তাকে অনুসরণ করলাম প্রবেশদ্বারের দিকে। সেখানে ছোটখাটো এক স্বেচ্ছাসেবী-জটলা। ব্যস্ততা। যুবক-যুবতীদের ভীড়। কর্মকর্তাদেরও। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক কর্মকর্তা বিনীতভাবে আমাকে জানালেন যে আমি যেন মূল প্রবেশদ্বারের ফিতে কেটে দিয়ে তাঁদের বাধিত করি। আমি সবিনয়ে জানাই যে হয়তো কোনো প্রমাদ ঘটেছে। কারণ প্রধান অতিথি তো গাড়িতে বসে আছেন – কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। তাঁরা আবার আমাকে জানালেন যে না, তাঁদের কোন ভুল হয়নি। ফিতে আমাকেই কাটতে হবে আর অলোকদা তো মঞ্চে উঠে প্রদীপ জ্বালিয়ে এই জন্মোৎসবের উদ্বোধন করবেন। আমি বুঝতে পারলাম। কিন্তু এমন কোনো অভিজ্ঞতা, মানে 'ফিতে কাটা'-র অভিজ্ঞতা এর পূর্বে কোনোদিন ঘটেনি। আমি যেন বিস্মিত-বিমূঢ় হয়ে সেই অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী রইলাম। ভুল বললাম, আরেকজন এর প্রত্যক্ষদর্শী থাকলেন – অলোকদা। ওদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে হাততালি, ক্যামেরা ক্লিক আর ফ্ল্যাশ-লাইটের ঝলকানি ফেলে যখন গাড়িতে উঠলাম সলজ্জ ভঙ্গীতে, অলোকদার সেই কৌতূকময় ব্যঞ্জনা কানে এল, 'রন্তি, এটা তুমি কী করলে? আমি উপস্থিত থাকতে, আমার চোখের সামনে তুমি

ফিতে কেটে দিলে?’ আর তারপর সেই প্রাণখোলা হাসির শব্দে আমরা দুজনেই ডুবে গেলাম|

এরপর যথারীতি মঞ্চে প্রবেশ এবং সোফালীন হয়ে মঞ্চ উদ্ভাসিত করে অলোকদা বসে রইলেন| তারপর উদ্বোধন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, সম্বর্ধনা, মাল্যদান, ফুলের স্তবক, মানপত্র দান এবং কী আশ্চর্য, অলোকদাকে যা যা করা হ’ল, সেই সেই সব আমাকেও করা হ’ল! আমি তো আকাশে ভাসছি| অলোকদার সঙ্গমাহাত্ম্য| কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি অলোকদাকে ছাপিয়ে গেলাম | প্রস্তুতিহীন এক জোড়াতালি বক্তৃতা দেবার পর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর এক পরমাসুন্দরী ছাত্রী ইংরেজি ঘোষিকা হিসেবে অনেকক্ষণ ধরেই সপ্রতিভ ছিল আর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছিল বাংলা ঘোষক সঙ্গীটির (আকাশবাণী) সঙ্গে মঞ্চজুড়ে| আমার কাছে এসে তার সঙ্গে একটি ‘সেলফি’ তোলার আবেদন জানাল| আমি তো রীতিমত চমৎকৃত | কালবিলম্ব না করে তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম| ছবি তোলা হ’ল| প্রবেশদ্বারের ফিতে কাটার মতো আরেকটি অপ্রত্যাশিত সুরম্য ঘটনা ঘটানোর পর আরো একবার যে অলোকদার তীব্র ঈর্ষাকাতর কটাক্ষ আমাকে সইতে হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য|

তারপর আয়োজক কমিটির কাছে বিদায় নিয়ে সোজা বর্ধমান| সোজা তপুর বাড়ি| তেমন কথাই ছিল| বর্ধমানে রাত্রিবাস করে পরদিন সকালে আমি অলোকদাকে এবং সঙ্গে বেশকিছু স্মরণীয় স্মৃতি নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম বেলা এগারোটা নাগাদ|

…☙✷❧…

ডাকাত পদচিহ্ন

অলোক কুমার চক্রবর্তী

একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলতে গিয়ে খানিকটা ধান ভানতে শিবের গীতের মতো একটু গৌরচন্দ্রিকা করে নিচ্ছি|

মধ্যপ্রদেশের বাঘেলখণ্ড এলাকার পান্না জেলার নাম এখন প্রায় সবার কাছেই পরিচিত, “পান্না টাইগার রিজার্ভ” ও ন্যাশনাল পার্ক এবং সত্যজিৎ রায়ের “হীরক রাজার দেশে”-র শুটিংয়ের জন্য| সড়কপথে খাজুরাহো যেতেও পান্নার ওপর দিয়েই যেতে হয়| এখন এটা নামকরা ট্যুরিস্ট স্পট| কিন্তু আমি বলছি এটা ১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসের কথা, যখন এর ভ্রমণরসিক মহলে বা সাধারণভাবেও তেমন পরিচিতি ছিল না| পান্না অল্প ও মাঝারি উচ্চতার বেলে-কাঁকুরে মাটিভরা অসমতল মালভূমি অঞ্চল| কিছু চাষবাস হয়| মাটির প্রকৃতির কারণেই তা সব জায়গায় সম্ভব নয়| বেশিরভাগ অঞ্চল জুড়ে নানা বন্যপ্রাণীভরা ঘন জঙ্গল| বনজ সম্পদ তো আছেই, কিন্তু এর সবচেয়ে বড় ও অবাক করে দেওয়া সম্পদ হ’ল কাঁকুরে মাটিতে মিশে থাকা হীরের দানা | স্থানীয় মানুষ সরকারী ট্রেজারিতে নামমাত্র টাকা (সেসময়ে ১০-২০ টাকা) জমা দিয়ে ১৫০-২০০ বর্গফুট জায়গা লিজ নিয়ে শুকনোর দিনে দু’আড়াই ফুট বা একটু বেশি গভীর পুকুর খুঁড়ে তার কাঁকরের মধ্যে থেকে হীরে খুঁজে বার করে| বেশিরভাগই দেখেছি বাড়ির বৃদ্ধ, মানে ঘরে বসে থাকা মানুষটি নিজের ছোট নাতি বা নাতনিটিকে নিয়ে সামর্থ্য অনুযায়ী এই কাজটি করছেন | নিয়মানুযায়ী হীরে পেলেই তা ট্রেজারিতে জমা করতে হবে| সেখানে যাচাইয়ের পর সরকারি মূল্যায়ণ অনুযায়ী দামের একটা অংশ তিনি পাবেন| এখানে একটা কথা চালু আছে – “ভাগ্যে থাকলে রাস্তা থেকে মুঠো করে ধুলো তুললেও তার মধ্যে একদানা হীরে পেয়ে যেতে পারো | আর ভাগ্যে না থাকলে হাতের মুঠোয় ধরা হীরেও আঙুলের ফাঁক গলে হারিয়ে যেতে পারে |” হীরে পেয়ে খুব গোপন না রাখতে পারলে বা একটু জানাজানি হয়ে গেলেই ডাকাত দল এসে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা আকছারই ঘটে | হ্যাঁ, এই ডাকাতের উপদ্রবের বদনামটাও এই এলাকার যথেষ্ট আছে|

ঠিক চম্বলের বীহড়ের মতো না হলেও, তারই তুতো ভাই বলা যায়। ঘন অরণ্যের আশ্রয়, আবডাল তো আছেই, আর আছে কলিঞ্জর, বান্দা হয়ে অল্পেই রাজ্য সীমান্ত পার হয়ে উত্তরপ্রদেশে ঢুকে নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার সুযোগ।

আমরা মূলত পান্নাকে কেন্দ্র করে আশেপাশের আরো দুটি জেলা মিলিয়ে ডায়মন্ড এক্সপ্লোরেশনের কাজে নিয়োজিত। কোর ড্রিলিং, এক্সপ্লোরেটরি মাইনিং (ট্রেঞ্চিং, ডিপ পিটিং, ক্রস কাটিং) ও জিওলজিক্যাল স্টাডির মাধ্যমে

হীরার অস্তিত্ব, বিস্তার ও ভাণ্ডার নিরূপণের কাজ। সাতনা শহর থেকে একটি চওড়া নতুন বাইপাস এক্সপ্রেস ওয়ে সরাসরি ৭২ কিমি দূরের পান্না শহরে গেছে। পুরনো রাস্তাটা একটু ঘুরপথ, দূরত্ব বেশি পড়ে, প্রায় ১১৫ কিমি। বেশ কিছুটা ঘন জঙ্গল, পাহাড়ী চড়াই ধরে নাগৌর, পাহাড়িখেড়া, রামখিরিয়া হয়ে পান্না গেছে। এই পথেই পাহাড়িখেড়া থেকে ৩০ কিমি গিয়ে ও পান্না শহরের ৩৫ কিমি আগে রামখিরিয়াতে এন.এম.ডি.সি.-র কিছু পরিত্যক্ত কোয়ার্টার্স নিয়ে আমরা মাইনিং ডিভিশনের শিবির গেড়েছি। পান্না শহরের কাছে লোকপাল সাগরে ড্রিলিং ক্যাম্প। হাটুপুর, অজয়গড়, রামখিরিয়া, পাহাড়িখেড়া, মাঝগাঁওয়া ইত্যাদি নানা ব্লকে হীরের খোঁজে আমাদের ট্রেঞ্চ ও ডিপ পিট (গভীর কুয়া) খোঁড়া চলছে। এই ট্রেঞ্চ বা পিট খুঁড়ে যা মাটি-বালি-নুড়িপাথর উঠছে, তার সবটাই ট্রাকে করে পাঠানো হচ্ছে মাঝগাঁওয়া NMDC-র ডায়মন্ড প্রসেসিং প্ল্যান্টে হীরে খুঁজে বার করার জন্য।

নাগপুর হেড অফিস থেকে আমাকে এই ক্যাম্পে প্রায়ই এসে বেশ ক'দিন থেকে কাজকর্ম করে ও দেখে যেতে হয়। আমার পুরনো বস এখানকার প্রজেক্ট ম্যানেজার মুখার্জী সাহেবের সঙ্গেই তাঁর বিশাল ঘরটিতে থেকে যাই।

এই সময়কার একদিনের ঘটনা।

- "সাহাব! সাহাব!"

সকাল সকাল ক্যাম্পের চৌকিদারের বেশ উৎকণ্ঠিত ডাকাডাকি আর দরজায় ধাক্কা শুনে বুঝলাম গুরুতর কিছু ঘটেছে। ধড়মড় করে উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে দেখলাম ওপাশ থেকে প্রজেক্ট ম্যানেজার মুখার্জী সাহেবও একই সঙ্গে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে আসছেন। দরজা খুলতেই দেখি চৌকিদার সুভগ রামের পাশেই প্রায় বিধ্বস্ত চেহারায় পাহাড়িখেড়ার কাছে ফিরকি নালা ট্রেঞ্চিং সাইটের স্থানীয় রিক্রুট চৌকিদার বিরজু রাওয়ল। প্রায় ২৫-৩০ কিলোমিটার দূরের জঙ্গলের ভিতরকার সাইটের রাত ডিউটির চৌকিদারকে এই কাক ভোরে এখানে দেখেই মুহূর্তে বুঝে গেলাম গুরুতর গণ্ডগোল হয়েছে।

- "ক্যায়া হুয়া?" জিজ্ঞাসা করতে বিরজু হাউমাউ করে কান্নার সঙ্গে বলে উঠল,

- "সাহাব ডকেইত! সাহাব ডকেইত! সবকুছ লুঠ কর লে গ্যায়া, সাহাব!" বলেই কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল মাটিতে অবসন্ন হয়ে। ক্যাম্পের অন্য লোকজনও অনেকেই তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওদেরকেই বললাম, - "ইসকো পানি উনি পিলাকর চাঙ্গা করো পহলে।" ওই সাইটে রাতে দুজন চৌকিদার থাকে। এ তারই একজন।

বিরজু চৌকিদার একটু জল খেয়ে দু'তিন মিনিটের মধ্যেই কিছুটা তাজা হতে জানা গেল, গাঢ় জঙ্গলের মধ্যে ফিরকি নালার ধারে আমাদের ট্রেঞ্চিং সাইট নম্বর পিপিটি-থ্রিতে কাল মাঝরাতে একদল ঘোড়সওয়ার ডাকাত এসে প্রচণ্ড হম্বিতম্বিসহ হামলা করেছে। ওদের দুজনের প্রায় দশদিনের রসদ যা সেদিনই কিনে নিয়ে গিয়েছিল, তা লুঠ করে নিয়ে গেছে। বিরজু শেষ রাতেই ওখান থেকে দৌড়তে দৌড়তে আট কিমি দূরে ওদের গাঁয়ে এসে সেখান থেকে সাইকেল নিয়ে বেস ক্যাম্পে পৌঁছেছে।

মোটামুটি শুনেই মুখার্জী সাহেব ও আমি তক্ষুনি সাইটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ক্যাম্পের কয়েকজনকে ডেকে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে বলে নিজেরাও তৈরি হয়ে নিলাম কয়েক মিনিটের মধ্যেই। ক্যাম্প লাইফে আমাদের মোটামুটি "ওয়ার ফুটিং" অর্থাৎ যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে সবসময়ই থাকতে হয়। পনেরো মিনিটের মধ্যেই রওনা দিলাম জিপ নিয়ে। সামনে আমি ও মুখার্জী সাহেব, চালক বিপিন

গোপ, আর পিছনে বিরজু ছাড়াও আরও পাঁচজন | উঁচুনীচু ঢেউ খেলানো রাস্তায় বেশ কিছুটা যাওয়ার পর শুরু হ'ল ঘন জঙ্গল ও পাহাড়িখেড়ার চড়াই | চড়াইয়ের মাথায় ছোট জনপদ পাহাড়িখেড়া | সোজা গেলে সাতনা, ডানদিকে কলিঞ্জর ফোর্ট হয়ে বান্দা, উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত | পাহাড়িখেড়ার পাঁচ কিলোমিটার মতো আগেই জিপ বাঁদিকের কাঁচা রাস্তা ধরল আরো গাঢ় জঙ্গলপথে | বেশিরভাগই খয়ের গাছ, শাল, পিয়াশাল বা বিজা, শিশু, মহুয়া ইত্যাদিও প্রচুর | হঠাৎই গাড়ির শব্দকে ছাপিয়ে যেন একটা বাদামি ঝড় সশব্দে গাড়ির পিছন থেকে এসে বাঁপাশ দিয়ে অতিক্রম করে সামনের ছায়াঢাকা আরো ঘন জঙ্গলের বাঁকে মিলিয়ে গেল | গরুর চেয়ে একটু ছোট একদল প্রাণী | চমকে উঠে আবিষ্কার করলাম, ওটা ছিল নীলগাইয়ের ঝাঁক | ডানদিকে পাহাড়ের চড়াই, বাঁদিক একটু ঢালু | কিছুটা এগোতেই একটু নীচের দিকে চোখে পড়ল একঝাঁক বারাশিঙ্গা গাড়ির শব্দে সচকিত হয়ে শব্দের উৎস ও প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করছে | মোটামুটি চার কিমি মতো ঢুকে এক জায়গায় আমাদেরই লোকেদের ছোট গাছ, ঝোপঝাড় কেটে বানানো রাস্তার ঢাল বেয়ে বেশ খানিকটা নীচে নেমে পৌঁছলাম সাইটে | প্রথমেই ডানহাতে সিকিউরিটির তাঁবু, তারপরে G.I. Sheet-এর সাইট স্টোর – গাঁইতি, কোদাল, বেলচা, শাবল ইত্যাদি এবং অন্যান্য কিছু একান্ত দরকারী জিনিস সামান্যই রাখা আছে | খুবই বদখৎ চেহারার, সাময়িক প্রয়োজনে বানানো | তারও ডানদিকে টানা ট্রেঞ্চ খোঁড়া, ওর একটু ওপরদিকে মার্কিং করা বা খুঁড়ে তোলা কাঁকর মাটি,

আমরা বলি গ্র্যাভেলস, ডাঁই করা আছে মাঝগাঁওয়া প্ল্যান্টে নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় | আমাদের সামনে একটু নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে ১৫ ফুট মতো চওড়া স্বচ্ছ জলের এক মাঝারি স্রোতস্বিনী – ফিরকি নালা | বর্ষার দিনে এর জলধারা আরও চওড়া ও উঁচু হয়ে ওঠে | এখানে খানিকটা সোজা গেলেও এর প্রায় পুরো পথটাই আঁকাবাঁকা | তাই এমন নাম |

সিকিউরিটির তাঁবু পুরো লণ্ডভণ্ড অবস্থায় | দ্বিতীয় গার্ড জগন রাওয়ল তখনও হতাশা ও ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি | যা জানা গেল, রাত প্রায় বারোটা নাগাদ ঘোড়ায় চড়ে "মলেট্রি জ্যায়সা পেহনাওয়া", অর্থাৎ মিলিটারির মতো পোশাক পরা জনা দশেকের একটা দল নালার দিক ধরে এসেছে | প্রায় সকলেই বিশাল চেহারার, পাকানো গোঁফ, মাথায় সাফা (পাগড়ি) বাঁধা | এসেই প্রচণ্ড চোটপাট | এটা নাকি ওদের চলাফেরার রাস্তা | দলের সর্দারের প্রথম ধমকানি,

- "তোরা এখানে কেন? কী করছিস?"
- "মালিক, আমরা তো গাঁয়ের গরিব মানুষ | এখানে সরকারী কাজ চলছে, তাই কাজ পেয়ে এখানে চৌকিদারি করছি |"
- "ও, সরকারী নৌকর | জাসুসি করত হও হমনকে উপ্পর | তু লোগ জানত হে কি য়ে হমরে আনজান কে রাস্তা হওয়ে | তু জাসুসি করকে ইনাম লেনে কে ধন্ধা করত হও?" বলেই রক্তচোখে দলের দিকে তাকিয়ে বজ্র ঘোষণা,
- "আববে এ, কাট ডাল দোনো কুত্তেকো | সালা জাসুসকে বচ্চে, হমনকো জানত নাহি!"

শুনেই তো এরা দুজন ঝাঁপিয়ে পড়েছে মাটিতে, (সর্দার তো ঘোড়ার ওপর!)

- "না না, হুজুর সর্দার, ঐসন ন করবো | হমন কনো জাসুস নই হে | আমরা কোনো গোয়েন্দাগিরি করছি না | আমরা সত্যিই কিচ্ছু জানি না | এখানে হীরে খাদানের কাজ চলছে | ওর যে মাল উঠছে, সেটাই পাহারা দিচ্ছি, মালিক |" এবারও বিপদ!
- "অও, হীরা খাদানকে চৌকিদার হও! তব তো তোহর পাস হি হীরা হোওয়ে! নিকাল সারে হীরে | নহি তো হেনেই কাটকে রখ দেব কুত্তে কহীঁকা |"

অনেক বুঝিয়ে, রামজী, সীতামাইয়া, শেরাওয়ালী মাতা ইত্যাদি সবার কসম খেয়ে বহু কষ্টে সবটা যখন বোঝানো গেল, তখন হ'ল নতুন ফরমান,

- "তুমন তো সরকারী নৌকর হও | তলব (বেতন) মিলত হে | হমরে ভাইমানকে ভুখ লগেল | তোহর রাশনপানি (খাদ্যবস্তু বা রসদ) তো হোওয়ে | যা, খানা বনা দে, তোহর মাফি হো যাইস্ |"

ততক্ষণে দলের দুজন তাঁবুতে ঢুকে তল্লাশি করে দেখে

নিয়েছে এদের সেদিনই কিনে আনা দিন দশেকের রসদ – আটা, ডাল, ভঁইসা ঘি, গুড়, আলু, পেঁয়াজ, সব্জি ইত্যাদি | সর্দারকে সেই তল্লাশি রিপোর্ট জানাতেই সর্দার খুশদিল | হুকুম হয়ে গেল, "সবটা দিয়েই খাবার বানিয়ে দে | এখনকার খাওয়া হয়ে বাকিটা কালকের কাজে লেগে যাবে |"

এখানে মাঝেমধ্যে সাইটে কাজ করা লোকদেরও খাবারদাবার বানানো হয় বলে বড় লোহার কড়াই ও ডেকচি দেওয়া হয়েছিল অফিস থেকে | মাটিতে খুঁড়ে বানানো উনুনও আছে | আদেশ হ'ল সবটা আটা আর গুড় দিয়ে ঘি-পরোটা, ডাল আর আলু-পেঁয়াজের তরকারি বানানোর | দুজনে পুরোটা পেরে উঠবে না বলে এদের সঙ্গে ওই দলের দুজন হাত লাগাল নিজেদেরই সময় বাঁচানোর গরজে | ডেকচিতে ডাল বসানো হ'ল, আর ঘচাঘচ আলু পেঁয়াজ কেটে কড়াইয়ে সব্জি | স্তূপাকার আটা-গুড় মাখতে মাখতে লকড়ির দাউদাউ আঁচে তরকারি প্রায় তৈরি | ঘিয়ে পরোটা ভাজা কিছুটা হতেই ওরা বসে পড়ল খেতে | এ তো আমাদের বাড়ির মতো তেকোনা বেলে সাজিয়ে গুছিয়ে পরোটা বানানো নয়! পরের পর রুটির মতো বেলে তাওয়াতে একটার ওপর আরেকটা ফেলে একটু সেঁকা হতেই ঘি লাগিয়ে তাওয়ায় এপিঠ ওপিঠ গরম করে নেওয়া | কাঠের দাউ দাউ আগুনে মিনিটে মিনিটে গরম গরম পরোটা ফটাফট তৈরি হয়ে পাতে পড়া আর উড়ে যাওয়া চলতে চলতে একসময় ওরা থামল | আসলে এইসব ডাকাতদল পাহাড়-জঙ্গলে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে প্রায়ই ঠিকমতো খাবারদাবার পায় না | নদীর পাশ দিয়ে ঘুরলেও নিশ্চিন্তে স্নানটাও করতে পারে না | সেখানে আজ এই অভাবিত ভরপেট খাবার পাওয়া ওদের কাছে এক বিরাট প্রাপ্তি | দলপতিসহ সবাই মহা খুশি | চৌকিদারদের আটা রাখার টিনে বেঁচে যাওয়া ডাল ও তরকারি আর একটা গামছায় বাকি পরোটা বেঁধে নিয়ে অনেক আশীর্বাদ ও কিছু হুঁশিয়ারি – ওদের চলাফেরার খবর যেন কাউকে না দেওয়া হয়, এখানকার কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে যেন উঠে যাওয়া হয় ইত্যাদি দিয়ে ওরা নালা ধরেই এগিয়ে গেছে | পুলিশকে বললে নাকি ওরাই সবচেয়ে আগে জানতে পারবে এবং এসে শুধু কুচিকুচি করে কেটে ফিরকি নালায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবে | খুবই সাধারণ হিসেব!

সব শুনে চমৎকৃত আমরা নালার দিকে একটু নেমে আবিষ্কার করলাম, সত্যিই এক পরিষ্কার পদচিহ্ন বা trail দেখা

যাচ্ছে নালা বরাবর একটু ওপর দিয়ে | মাটি ও পাথুরে চাট্টান মনে হয় প্রায় নিত্য ব্যবহারে বেশ মসৃণ | এখান থেকে একটু বাঁদিকে এগিয়ে কিছু বিশাল বোল্ডার এবড়ো খেবড়ো ছড়িয়ে পড়ে আছে | যেন ওপর থেকে গড়িয়ে নামতে গিয়ে হঠাৎ সামনে নালা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর পেছনের পাথরগুলো হুড়মুড়িয়ে সামনেরগুলোর ঘাড়ে এসে পড়েছে | আরও অবাক হওয়া বাকি ছিল | কাছে গিয়ে দেখি, নীচের খুব বড় বোল্ডারগুলোর ওপরের চ্যাটানো বা ফ্ল্যাট জায়গাটা একদম তেলতেলে, মসৃণ | ওপরের বোল্ডারগুলো একটার

ওপর আরেকটা আটকে গিয়ে যেন আচ্ছাদন বা আধা গুহার আদল দিয়েছে | নালার দিকে মুখ করা, ওপরদিকে পাথর ও জঙ্গল, ঝোপঝাড়ের আবডাল | ওপর থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই | সম্পূর্ণ নিরাপদ | বোঝা গেল চলার পথে এটা ডাকাতদলের বিশ্রাম ও আলোচনা ইত্যাদির জন্য একটা চমৎকার বিরতিবিন্দু | ওদের এই অভিসার বা অভিযানপথ ধরে ওরা কখন কোথা দিয়ে কোথায় যায় আসে তা ওরাই জানে | ধড়ে তো একটাই মাথা, খোঁজ করার বুকের পাটা কার আছে?...

মাদার্স ডে

মৃণাল চৌধুরী

মে মাসের গরমে বিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক স্কুলের বাগানে অতি যত্ন সহকারে একমনে কাজ করছিল মালিটি | কয়েক বছর আগেই এই কাজটি পেয়েছে সদ্য গ্রাম থেকে আসা লোকটি | শহরের এত বড় নামী স্কুলের আদবকায়দা সবটাই তার কাছে নতুন, এসবে সে একেবারেই অভ্যস্ত নয়|

হন্তদন্ত হয়ে স্কুলের এক বেয়ারা এসে বলে, "রামদাস, প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডাম তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, খুব জরুরী| তাড়াতাড়ি ওঁর ঘরে গিয়ে দেখা করো|"

রামদাস থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে মুছে প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডামের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় | আগে কোনদিনই ওঁর ঘরে যাওয়ার সুযোগ বা প্রয়োজন হয়নি | প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডামকে দূর থেকে দেখেছে মাত্র, কথা বলার সুযোগ হয়নি| বুকের ধড়ফড়ানি সামলে রামদাস প্রিন্সিপ্যালের ঘরে ঢোকে; বুঝতে পারে না, বাগানের কাজে কি কোনও ভুল বা অন্যায় হয়ে গেছে যে ম্যাডাম তাকে ডেকে পাঠালেন!

ভয়ে ভয়ে দরজার কাছ থেকে বলে, "ম্যাডাম, আমাকে ডেকেছেন?"

অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুরে "ভেতরে আসুন" শুনে রামদাস আরও ঘাবড়ে যায়|

প্রিন্সিপ্যাল টেবিলের ওপর একটা কাগজ দেখিয়ে বলেন, "এটা পড়ুন"|

"কিন্তু আমি তো তেমন লেখাপড়া জানি না, ইংরেজি পড়তে পারি না", বিব্রত রামদাস উত্তর দেয়| ভয়ে ভয়ে বলে ওঠে, "বাগানের কাজে আমি কি কিছু ভুল করেছি? তাহলে আমাকে আরেকটা সুযোগ দিন | আমি আরও ভাল করে কাজ করব | আমার মেয়েকে বিনা খরচে স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি সারাজীবন আপনাদের কাছে ঋণী থাকব| আমি কখনও ভাবতে পারিনি আমার মতো গরিব মানুষের মেয়ে এত বড় একটা স্কুলে পড়ার সুযোগ পাবে|" এই কথা বলে রামদাস কান্নায় ভেঙে পড়ে|

প্রিন্সিপ্যাল বলে ওঠেন, "আমরা তোমার মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করেছি কারণ তোমার মেয়ে লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভাল আর তুমি একজন সৎ কর্মী| আমি তোমার মেয়ের ক্লাস টিচারকে ডেকে পাঠাচ্ছি, উনি এসে তোমার মেয়ের ইংরেজিতে লেখা রচনাটি পড়বেন আর তোমার জন্য হিন্দিতে অনুবাদ করে শোনাবেন|

কথামতো রামদাসের মেয়ের ক্লাস টিচার এসে লেখাটি পড়তে শুরু করেন, আর হিন্দিতে অনুবাদ করতে থাকেন|

লেখাটিতে ছিল –

১০ই মে ভারতে 'মাদার্স ডে'| আজ ক্লাসে মাদার্স ডে-র ওপর রচনা লিখতে বলা হয়েছে|

আমি বিহারের একটি ছোট গ্রামে জন্মেছি | সেখানে চিকিৎসা ও লেখাপড়া করার সুযোগ নিতান্তই কম, বলতে গেলে স্বপ্নের অতীত | আমাদের গ্রামে অনেক 'মা' সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যান; আমার মাও তাদেরই মধ্যে একজন| প্রসবের পর মা তাঁর দুহাতে আমাকে ধরতে পর্যন্ত পারেননি | আমার বাবাই প্রথম এবং একমাত্র, যিনি আমাকে কোলে নিয়েছেন | শুনেছি, পরিবাবের আর সকলেই আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন| প্রথমতঃ আমি মেয়ে, তারপর তাঁরা মনে করেন যে আমিই আমার মায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী| ওঁরা সকলেই আমার বাবাকে আবার বিবাহ করার জন্য জোরাজুরি করেছিলেন, কিন্তু আমার বাবা কিছুতেই রাজী হননি|

তার ফলে আমার পিতামহ পিতামহীরা শেষ পর্যন্ত বাবাকে ত্যাজ্যপুত্র করে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন | কিন্তু আমার বাবা একবারের জন্যও কিছু না ভেবে সম্পত্তি, জমিজমা, বাড়িঘর, গরুবাছুর সবকিছু ফেলে আমাকে কোলে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে এই শহরে চলে আসেন| গ্রামে থাকলে বাবার ভালভাবেই চলে যেত | কিন্তু এই শহরে একা একা আমাকে নিয়ে বাবার কঠিন দিনগুলির কথা ভাবলে আমি অভিভূত হয়ে যাই | সারাদিনের শারীরিক পরিশ্রম সামলে কোমল ভালবাসা দিয়ে বাবা আমাকে লালন-পালন করেছেন|

আজ আমি বুঝতে পারি, আমি যা কিছু খেতে ভালবাসতাম বাবা কেন সেই খাবারগুলোর প্রতি অনীহা প্রকাশ করতেন | কারণ বেশিরভাগ দিনই দুজনের জন্য যথেষ্ট খাবার থাকত না| আজ আমি বুঝতে শিখেছি, আমাকে বড় করতে বাবার এই আত্মত্যাগের কথা| বাবার এই ত্যাগ স্বীকার আজ আমি মর্মে

মর্মে উপলব্ধি করতে পারি|

এই স্কুল আমাদের আশ্রয় দিয়েছে আর দিয়েছে সবচেয়ে বড় উপহার – আমাকে পড়াশোনা করার সুযোগ| তাই এই স্কুলের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ|

আর আমার বাবার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, যদি দরদ আর ভালবাসা বলতে মাকে বোঝায়, তবে আমার বাবা সেখানে যথাযোগ্য| যদি করুণা বলতে মাকে বোঝায় তবে আমার বাবা সেখানে পরিপূর্ণ| যদি ত্যাগ বলতে মাকে বোঝায় তবে আমার বাবা সেখানে অভিন্ন|

এক কথায়, মা বলতে যদি দরদ, ভালবাসা, করুণা আর ত্যাগ বোঝায়, তবে আমার কাছে আমার বাবা জগতের সবচেয়ে ভাল মা| তাই আজ মাদার্স ডে-তে আমি আমার বাবাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল 'মাদার' বলে চিহ্নিত করতে চাই| আমি ওঁকে প্রণাম জানাই, আর অতি গর্বের সঙ্গে জানাতে চাই এই স্কুল বাগানের অত্যন্ত কর্মঠ ও পরিশ্রমী মালি আমার বাবা|

আমি জানি, এই রচনা লেখার প্রতিযোগিতায় হয়তো আমি বাতিল হয়ে যাব| কিন্তু এই রচনার মাধ্যমে আমি আমার বাবার আত্মত্যাগ আর আমার প্রতি বাবার ভালবাসার কথা প্রকাশ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি|

রচনাটি পড়ার শেষে সারা ঘরে এক নীরবতা বিরাজ করতে থাকে| শুধু শোনা যায় রামদাসের চাপা-কান্না| রামদাস হাত গুটিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকে| প্রিন্সিপ্যালের নির্দেশে যে শিক্ষক লেখাটি পড়ছিলেন, উনি সেটি রামদাসের হাতে তুলে দেন| রামদাস কাগজটা হাতে নিয়ে বুকের কাছে চেপে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে|

প্রিন্সিপ্যাল দাঁড়িয়ে উঠে রামদাসকে চেয়ারে বসতে বলেন| নিজের হাতে জলের গ্লাস এগিয়ে দেন|

আন্তরিকভাবে ও অত্যন্ত কোমল স্বরে বলেন, "রামদাস, তোমার মেয়েকে এই রচনা লেখার জন্য ১০০তে ১০০ দেওয়া হয়েছে| এই স্কুলের ইতিহাসে 'মাদার্স ডে' রচনা লেখার বিষয়ে এমনভাবে কেউ কখনও লেখেনি| আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে যত লেখা হয়েছে, তার মধ্যে এটি অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ| তাই আগামীকাল এই বিষয়ে যে অনুষ্ঠান হবে, সেই অনুষ্ঠানে স্কুলের কর্তৃপক্ষ তোমাকে "প্রধান অতিথি" হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে|"

প্রিন্সিপ্যাল আরও বলেন, "শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ভালবাসা ও আত্মত্যাগ করে কীভাবে সন্তানকে মানুষ করা যায় তার এক বিশেষ নিদর্শন তুমি| আরও একটা কথা – সন্তান মানুষ করতে হলে বিবেক বোধ আর আত্মত্যাগটাই আসল; সেটা পিতা বা মাতা যার কাছ থেকেই আসুক না কেন| তোমার মেয়ের তোমার প্রতি অসীম বিশ্বাস, ভালবাসা আর শ্রদ্ধার কথা ভেবে স্কুল কর্তৃপক্ষ গর্ব অনুভব করছে – এই ভেবে যে সে এই স্কুলের ছাত্রী, যে তার বাবাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জননী হিসাবে চিহ্নিত করেছে| তুমি সে অর্থে এক সত্যিকারের মালি যে শুধু বাগানের পরিষেবা করে ফুল ফোটাওনি, তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদকে সমৃদ্ধশালী করেছ|"

{ইন্টারনেট এমন একটি লেখা দেখে অসম্ভব ভাল লেগেছিল| বাংলায় নিজের মতো করে লিখলাম| আশা রাখি ভাল লাগবে আপনাদের|}

আপনজন

সৌমি জানা

এদেশে গরমকালেও যেন বাতাসে একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব থাকে | শান্তিনিকেতনী সূতির চাদরটা গায়ে একটু জড়িয়ে নিয়ে ভাবলেন সুপূর্ণা – এই নিয়ে প্রায় বার চারেক আমেরিকায় ছেলে বৌমার কাছে এলেন; তবু কলকাতার গরম থেকে এখানে এলে এখনো একটা শীত শীত ভাব লাগে তাঁর| এবার অবশ্য আসাটা একটু অন্য কারণে | পুত্রবধূ সোহিনী মা হতে চলেছে| ওকে একটু যত্নআত্তি করতেই তাঁর আসা| তাঁর পৌঁছানোর ক'দিন পর থেকেই পৃথিবীজুড়ে শুরু হয়েছে ভাইরাসের তাণ্ডব | সকলেই গৃহবন্দী | আসার পর থেকে তিনিও তাই ছিলেন| এখন একটু গরম পড়তে দুপুরের দিকে মাস্ক পরে অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের রাস্তায় একপাক হাঁটতে বেরোন | বাইরে বেরিয়ে প্রায়ই একটি কমবয়সী মেয়েকে রাস্তার পাশের বেঞ্চিতে বসে থাকতে দেখেন| রোগা একহারা চেহারা, গায়ের রঙ বেশ ফ্যাকাশে সাদা, সোনালি চুল কিছুটা উস্কোখুস্কো, পরনে ঢোলা জামা আর সঙ্গে জিন্স-এর প্যান্ট অথবা শর্টস| বেশিরভাগ সময় মাথা নীচু করে বসে থাকে, আর মেয়েটির ডানহাতের আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেট থেকে ধোঁয়ার রিং ছড়ায় হাওয়ায়| কিছুটা অবাক হন সুপূর্ণা| এদেশে দুপুরবেলা সবাই কাজেকর্মে ব্যস্ত | একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মেয়ের এভাবে এসময় বসে থাকা খুব একটা পরিচিত দৃশ্য নয় এখানে | আড়চোখে একটু দেখে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে যান সুপূর্ণা | মেয়েদের কথায় কথায় সিগারেট খাওয়াটা এখনো চোখে বেশ বিসদৃশ ঠেকে তাঁর|

তবে সেদিন যেন একটু অন্যরকম দেখতে লাগল মেয়েটিকে | মাথা নীচু করার বদলে চেহারাটা পিছনের দিকে হেলিয়ে বেঞ্চের দেওয়ালে মাথা রেখে বসে আছে | বেশ শিথিল ভাব, শরীরে যেন একরাশ ক্লান্তি | হাতে ধরা আছে সেই আধখাওয়া সিগারেট | কিন্তু ও কি! ওর পেটটা কি একটু বেশি ফোলা লাগছে বাকি চেহারার তুলনায়? হ্যাঁ তাইতো, ঠিক যেন একটা "বেবী বাম্প", অবিকল সোহিনীর মতো| তবে কি এই মেয়েটিও প্রেগন্যান্ট? তাহলে রোজ রোজ এত সিগারেট খায় কেন? ওতে তো ওর পেটের বাচ্চাটারও ক্ষতি | কী আশ্চর্য! কেউ সাবধান করে না ওকে?

নিজের অজান্তেই হাঁটার গতি কমে এল সুপূর্ণার| সাইড ওয়াক ছেড়ে এগিয়ে গেলেন বেঞ্চের দিকে, যেখানে বসে ছিল মেয়েটি | ওর সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলবেন কিনা ইতস্তত করছিলেন | এদিকে তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে মেয়েটি চোখ খুলে একটু সোজা হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল | আহা ক্লান্ত শীর্ণ মুখটায় কিন্তু একটা আবদারি মায়া জড়ানো, মনে মনে ভাবলেন সুপূর্ণা | ওর হাতে তখনো ধরা জ্বলন্ত সিগারেট|

সুপূর্ণা হঠাৎ বলে উঠলেন, "সিগারেট নট গুড নাউ, ভেরি ব্যাড ফর বেবি|"

মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে | তারপর কী মনে করে হাতের সিগারেট মাটিতে ফেলে পা দিয়ে চেপে আগুনটা নিভিয়ে দিল|

সুপূর্ণা এবার বললেন, "গুড গার্ল"|

মেয়েটির ঠোঁটেও যেন একটা হালকা হাসির রেখা ফুটল| সঙ্গে কথাও বলে উঠল মেয়েটি, "হ্যালো, আই অ্যাম কেটি | নাইস টু মিট ইউ!"

বাহ্, ভারী মিষ্টি গলা তো ওর... মনে মনে ভাবলেন সুপূর্ণা|

"হ্যালো, আই অ্যাম পূর্ণা| ইউ কল মি আন্টি|"

মাথা নেড়ে সায় জানিয়েছিল কেটি | সেদিন অতটুকুই কথা হয়েছিল|

এরপর হাঁটতে বেরিয়ে কয়েকদিন কেটিকে আর দেখতে পেলেন না সুপূর্ণা| হয়তো তাঁর মুখোমুখি হতে হবে বলে আসছে না! নিজেকে বেশ অপরাধী মনে হ'ল তাঁর | কী দরকার ছিল যেচে গিয়ে অচেনা অজানা মেয়েটির সাথে কথা বলার | ওদের ভাষা সংস্কৃতি অনেক আলাদা, হয়তো কিছু মনে করেছে| কিন্তু তিনি তো ওর ভালর জন্যই বলেছিলেন | হাঁটুর বয়সী মেয়ে পেটে বাচ্চা নিয়ে যদি রোজ বসে বসে সিগারেট খায় তাহলে কি মুখ বুজে থাকা যায়? আর তাছাড়া তিনি তো খারাপভাবে কিছু বলেননি | এইসব সাতপাঁচ চিন্তা করে একটু উতলা হয়ে পড়েছিলেন সুপূর্ণা|

প্রায় দিনদশেক পর আবার একদিন কেটিকে দেখলেন সেই বেঞ্চিতে বসে থাকতে| বুক থেকে যেন একটা

ছোটখাটো পাথর নামল সুপূর্ণার | সেদিন আর ওর হাতে সিগারেট নেই | কাছে এলেন তিনি | ভাঙা ইংরেজিতে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ তুমি? তোমাকে ক'দিন দেখতে না পেয়ে আমার চিন্তা হচ্ছিল | সব ভাল তো?"

উত্তরে কেটি জানাল যে কয়েকদিন ওর শরীরটা ভাল ছিল না, তাই বাইরে বেরোয়নি |

"ডাক্তার দেখিয়েছ? তোমার বেবি ভাল আছে তো?"

"হ্যাঁ, বেবি ভাল আছে | এখন বেশ নড়াচড়া করে পেটের ভেতর | ইট ফিলস গুড |" শুকনো মুখে একটা হাসির রেখা ফুটল কেটির |

"বাহ, খুব ভাল! তুমি ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করছ তো? এখন কিন্তু তোমায় ভাল করে খেতে হবে, নিজের যত্ন নিতে হবে |"

"হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করছি যতটা ভালভাবে থাকা যায় | তবে প্যান্ডেমিকের পর চাকরিটা নেই তো, তাই বেশ অসুবিধা |" চোখদুটো ছলছল করে উঠল মেয়েটার |

"সেকী! আর তোমার বাড়ির লোকজন? তোমার হাসব্যান্ড? ওঁরা নিশ্চয়ই এই সময়ে তোমার দেখাশোনা করছেন?" বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সুপূর্ণা |

উত্তরে যা বলল কেটি তা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল তাঁর | কেটির ভাল নাম কেটলিন | ও একটা রিটেল স্টোরের কাউন্টারে চাকরি করত | বিবাহিত নয়, বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে থাকত | ছেলেটি মাস তিনেক আগে ওকে ছেড়ে চলে গেছে! কেটির মা বাবাও ওর স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ডিভোর্সড | বাবা মা'র নিত্যদিনের ঝগড়ার জন্য ও খুব মানসিক কষ্টে ভুগত, পড়াশুনাতেও ঠিকমতো মন বসাতে পারেনি | সেজন্যই বেশিদূর পড়া সম্ভব হয়নি ওর | নিজের জীবন চালাতে একটা ছোট চাকরি করত, সেটাও হারালো এই কোভিডের প্রকোপে! যে দোকানে ও কাজ করত সেটি বন্ধ হয়ে গেছে কোভিডের ধাক্কা সামলাতে না পেরে | একে তো সিঙ্গল মাদার, তার ওপর চাকরি হারিয়ে কেটি এখন খুবই হতাশ ও বিপর্যস্ত! চিন্তা আর অবসাদ কাটাতেই মাঝেমধ্যে ধূমপান করে ও | কিন্তু আগের দিন সুপূর্ণা বারণ করার পর থেকে আর সিগারেট ছোঁয়নি |

শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন সুপূর্ণা | তবে কেটির পরিস্থিতি চিন্তা করে খুব মনখারাপ হয়ে গেল তাঁর | আহা কতই বা বয়স, এর মধ্যেই জীবনের এত কঠিন পরীক্ষার সঙ্গে লড়তে হচ্ছে ওকে একা একা | তাও এমন সময়ে যখন সব মেয়েরই একটু আদর যত্ন নির্ভরতার দরকার হয়! কেটির কাঁধে হাত রেখে প্রত্যয়ের সাথে বললেন সুপূর্ণা, "ভয় পেও না | তুমি ঠিক পারবে সব বিপদ জয় করতে | খুব সাহসী মেয়ে তুমি | আর তাছাড়া এখন তো তুমি মা হতে চলেছ | জানো তো, মায়ের ক্ষমতা অনেক বেশি হয় | নিজের সন্তানের জন্য একজন মা অনেক কিছু করতে পারে | তুমিও পারবে, তোমার কোলে যে আসছে তার জন্য তোমায় শক্ত হতে হবে | তুমি ঠিক জিতবে এই যুদ্ধ!" ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে সুপূর্ণার মুখে মায়ের স্নেহভরা প্রত্যয়ের কথা শুনে সেদিন চোখদুটো চিকচিক করে উঠেছিল কেটির |

পরের দু'মাস এভাবেই কাটল | মাঝেমাঝে কেটির সঙ্গে দেখা হতো হাঁটতে বেরিয়ে | সোহিনীর জন্য বিশেষ কিছু রান্না করলে কেটির জন্যও একটু নিয়ে আসতেন তিনি | সুপূর্ণার হাতের তৈরী ভারতীয় খাবার খুব ভাল লাগত ওর | কেটির ফোন নম্বরটা নিয়ে রেখেছিলেন তিনি | সেই সঙ্গে ছেলের বাড়ির ল্যান্ডফোনের নম্বরটাও ওকে দিয়েছিলেন, "কোনো দরকার হলে ফোন কোরো কেটি | আমি আছি |"

"নিশ্চয়ই, আন্ট পারনা | তুমি আমার অনেকখানি ভরসা |" মাতৃসমা সুপূর্ণাকে নির্দ্বিধায় বলেছিল বিদেশিনী তরুণী | এদিকে গ্রীষ্ম শেষে হেমন্তের হাওয়া শুরু হয়েছে | এখন রাস্তায় বেরোলে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে | তাছাড়া সোহিনীর ডেলিভারির সময় প্রায় আসন্ন | এখন ওকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন সুপূর্ণা | মনে মনে ভাবেন কেটিরও তো প্রায় একই অবস্থা | কী করে সামলাচ্ছে মেয়েটা কে জানে | এরমধ্যে একদিন রাত দুপুরে সোহিনীর লেবার পেইন শুরু হ'ল | পরদিন সকালে সুপূর্ণার সংসারে এল ফুটফুটে ছোট্ট নতুন সদস্য, এঞ্জেলা | নাতনিকে পেয়ে ক'দিন সবকিছু যেন ভুলে গেলেন সুপূর্ণা | তারপর হঠাৎ একদিন ফোনে একটা ভয়েস মেসেজ শুনে একেবারে চমকে গেলেন |

"আন্ট পারনা, আমি কেটি বলছি | জানো, আমার বেবি হয়েছে; কিন্তু আমার ছোট্ট ছেলেটা একদম ভাল নেই | ও

হাসপাতালে, তুমি ওর জন্য প্রার্থনা কোরো | ও যেন সুস্থ হয়ে আমার কোলে ফিরে আসে | আমি ওকে হারাতে চাই না |" বলতে বলতে কান্নায় গলাটা ধরে এসেছিল কেটির |

সেকি, এ কী বলছে কেটি! ওর তো আরো কদিন দেরি ছিল ডেলিভারির | তাহলে কি কোনো এমার্জেন্সি হ'ল? ছেলে হয়েছে ওর, কিন্তু বাচ্চাটা ভাল নেই বলছে | মনটা হু হু করে উঠল সুপূর্ণার | সত্যি তো, নিজের আনন্দে একলা মেয়েটার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি কদিন |

আর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন কেটির অ্যাপার্টমেন্টের দিকে | তাকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটা | কাঁদতে কাঁদতে জানাল, সপ্তাহ দুয়েক আগে হঠাৎ তীব্র পেটের যন্ত্রণা হয় ওর | কাতরাতে কাতরাতে এমার্জেন্সিতে ছোটে | ডাক্তার বলে তক্ষুনি সার্জারি করতে হবে, তা নাহলে ওর বাচ্চাকে বাঁচানো যাবে না | সেদিন রাতেই ছেলে হয় কেটির | কিন্তু বাচ্চাটা প্রিম্যাচিওর, তার সাথে শ্বাসজনিত সমস্যা | ওর অনেক চিকিৎসার প্রয়োজন | ওরা কেটিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে দিনকয়েক পর, কিন্তু ওর ছেলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন | অবস্থার সেরকম উন্নতি হয়নি, ডাক্তার ভরসা দিতে পারছে না | সদ্য মা হওয়া মেয়েটা নিজের সন্তানকে হারানোর ভয়ে যেন কঙ্কালসার হয়ে গেছে, কেটির সাথে নিজেও ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন সুপূর্ণা | কয়েক মুহূর্ত কাটল এভাবেই | তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে চোখের জল মুছে দৃঢ় স্বরে বললেন "কেটি, আর কেঁদো না | ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো, তোমার ছেলে সুস্থ হয়ে তোমার কোলে ফিরবে | তোমায় এখন নিজের যত্ন নিতে হবে | তুমি সুস্থ না থাকলে তোমার বাচ্চাকে কে দেখবে বলো? ছেলের জন্য শক্ত হতে হবে তোমায় | আমি একটু পাস্তা আর সুপ্ এনেছি, এটা খাও | মনে জোর পাবে |"

এর পরের কিছু মাস মাঝে মাঝেই কিছু খাবার বানিয়ে কেটির জন্য নিয়ে যেতেন সুপূর্ণা, গল্প করতেন ওর সাথে | সাহস জোগাতেন ওকে | কেটি প্রথমদিকে খুবই সংকোচ করত এত সাহায্য নিতে | সুপূর্ণা বুঝিয়ে বলেছিলেন, "দেখো তুমি সোহিনীর মতোই আমার আর এক মেয়ে | তোমার এত লজ্জা পাওয়ার কোন ও কারণ নেই | আমি তোমার 'আপন-জন' |" তারপর আর কিছু বলেনি ও | একজন প্রায় অপরিচিত বিদেশিনী প্রৌঢ়ার থেকে পাওয়া মাতৃস্নেহ ওকে নতুন করে শক্তি দেয় | পরিবার, পরিস্থিতি, ধর্ম, সংস্কার, বয়স, জীবনবোধ সবেতেই আকাশ পাতাল তফাৎ সুপূর্ণা আর কেটির | তবু যেন এক অদ্ভুত স্নেহ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয় দুই ভিন্ন জগতের দুটি নারী | এ বুঝি শুধুই মানবতার বন্ধন!

আজ দেশে ফিরে যাচ্ছেন সুপূর্ণা | মাস তিনেকের নাতনি, এঞ্জেলাকে ছেড়ে যেতে মনটা বড়ই খারাপ লাগছে তাঁর | উপায় নেই, অনেকদিন বাড়িছাড়া | তাছাড়া ভিসার মেয়াদও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে | ছেলে গাড়িতে তাঁর সুটকেস দুটো তুলছে | এঞ্জেলাকে কোলে নিয়ে সোহিনীর সাথে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন সুপূর্ণা | যাওয়ার আগে প্রাণভরে আদর করে নিলেন নাতনিকে | তারপর হঠাৎ দেখতে পেলেন পেরাম্বুলেটারে ছেলেকে বসিয়ে তাদের দিকে হেঁটে আসছে কেটি | ওর ছেলে জনাথন কয়েক সপ্তাহ আগে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে | ছেলেকে পেয়ে কেটলিনও যেন এক নতুন মানুষ, হাসিখুশি আর আত্মবিশ্বাসী |

"কেটি মাই ডিয়ার, তুমি আবার কষ্ট করে এলে কেন?" বললেন সুপূর্ণা |

"আন্ট পারনা, তুমি চলে যাচ্ছ, আর আমি তোমার সাথে দেখা করব না, তা কি হয়? তাছাড়া জনাথনও ওর গ্র্যান্ডমাকে খুব মিস করবে | তুমি তো আমাদের আপনজন," এই বলে ছেলেকে সুপূর্ণার হাতে তুলে দিল কেটি | জনাথনকে কোলে নিয়ে অনেক আদর করলেন সুপূর্ণা |

"আবার কবে আসবে তুমি? আবার কবে দেখা হবে আমাদের?" ছলছল চোখে জিজ্ঞেস করল কেটি |

সুপূর্ণা আস্তে আস্তে হাসিমুখে বললেন, "খুব তাড়াতাড়ি | এবার তো আমি আমার দুই নাতি নাতনিকে রেখে যাচ্ছি। ওদের জন্য ফিরে আসতেই হবে আমায় |"

আর তার কথা শুনে কি জানি কী বুঝে এঞ্জেলা আর জনাথন দুজনেই খুশিতে হেসে উঠল খিলখিলিয়ে |

উত্তরণ

ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবা চলে গেল | ডেথ সার্টিফিকেট পেতে আরও চার ঘন্টা | বাবার কথা একান্তে ভাবার জন্যে হাসপাতালে ওয়েটিং হলের একটা কোণ বেছে নিয়ে অনিন্দ্য বসল | বাবার পরিণত বয়সে মৃত্যু, তার ওপর শেষকালটা বেশ অসুস্থতাতেই কেটেছে | বার বার হাসপাতালে ভর্তি হতে হতো | বাবাকে শারীরিক আরাম দেওয়ার জন্যে বাড়িতে যথাসম্ভব আধুনিক ব্যবস্থা করেছিল অনিন্দ্য | কিন্তু শারীরিক কষ্ট তো কেউ কারও নিতে পারে না | তাই বাবার চলে যাওয়া এক অর্থে মুক্তি | তবু বাবা তো | তাই এই দীর্ঘ সময়টা তার দীর্ঘ বলে মনে হ'ল না | বড় হলটার এক কোণে বসে বাবার সঙ্গে সময় কাটাতে তার ভালই লাগছিল | বাবা ছিল কমিউনিস্ট | 'তুমি কবে কমিউনিস্ট হয়েছিলে বাবা?' অনিন্দ্য ছোটবেলায় বাবাকে প্রশ্ন করত | বাবা হাসত – 'সে কি আর মনে আছে রে? সেই কলেজে পড়ার সময় বোধহয় |' অনিন্দ্যর 'কমিউনিস্ট' ব্যাপারটা তখনও বোঝার সময় হয়নি, তবু প্রশ্ন করত, কারণ কমিউনিস্ট হবার জন্যেই সে বাবাকে বেশি পেত না | অফিস থেকে ফিরে বাবা ইউনিয়ন অফিস, পার্টি অফিসে চলে যেত | বাবার কর্মজীবন ছিল পুরুলিয়া জেলা সংলগ্ন ধানবাদ জেলায় | ভোটের আগে ছুটির দিনগুলো সাইকেল নিয়ে পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে ঘুরত | সারা বছর কে অসুবিধায় আছে, সাহায্য করতে হবে, কে অসুস্থ – কলকাতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, বাবা এইসব নিয়েই ব্যস্ত থাকত | ছেলের দিকে নজর না দেওয়ার জন্য মা অনুযোগ করলে বাবা বলত, 'তুমি তো রয়েছ, আমি নিশ্চিন্ত |' মা বিয়ের আগে এক স্কুলে চাকরি করত, বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে বাবার কর্মস্থলে চলে গিয়েছিল | সে সময় মায়ের চাকরি পাওয়া খুব শক্ত ছিল না | কিন্তু স্বামীর বাইরের কাজ আর ছেলে মানুষ করার তাগিদে মা চাকরির কথা আর ভাবতে পারেনি | অনিন্দ্য আজ পেছন ফিরে তাকিয়ে বুঝতে পারে মায়ের জন্যেই হয়তো সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে | বাবা ছিল বন্ধু | কোনও কিছুতেই জোরাজুরি ছিল না | বাবা বলত জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাদের গণতান্ত্রিক হতে হবে | দেশ চালানোর জন্য যেমন গণতন্ত্রের প্রয়োজন তেমনি ইউনিয়ন চালাতে, ক্লাব চালাতে এমনকি সংসারেও গণতন্ত্রের প্রয়োজন | সকলের কথা শুনতে হবে, তারপর সিদ্ধান্ত | যদি সবাই একমত না হয়, তবে ভোটাভুটি | অনিন্দ্যর বাড়িতে তিনজন ভোটার | মাঝে মাঝেই ভোটাভুটি হতো | বাবা বলত ভোটাভুটি, ফাটাফাটি হবে বাড়িতে | বাইরের লোক সেসব জানবে না | বাইরে আমরা এক | অনিন্দ্যর মনে পড়ে বাড়িতে প্রথম বড় ভোটাভুটি হয়েছিল সে তখন ক্লাস ফোরে | বাবা, মা সিদ্ধান্ত নিল ছেলেকে ভাল স্কুলে, হস্টেলে রেখে পড়াতে হবে | ভোটের দরকার হ'ল না কারণ দুটো ভোট হস্টেলের পক্ষে পড়ে গেছে | কিন্তু কোথায় পড়ানো হবে তা নিয়ে হ'ল মতভেদ | বাবা রাজনীতির কারণে পুরুলিয়ায় যেত, সেখানে বাবার পরিচিতি ছিল, ছেলেকে দেখাশুনার সুবিধা হবে | তাই বাবার ইচ্ছে 'পুরুলিয়া সৈনিক স্কুল'| মায়ের পছন্দ 'দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন'| এই নিয়ে টানাপোড়েন – ঠিক হ'ল ভোট হবে | কিন্তু ভোটের আগে প্রচার দরকার, বিতর্ক দরকার | বাবা মাকে বলেছিল, 'কেন রামকৃষ্ণ মিশন তুমি ওকে বোঝাও | আমি বোঝাব কেন সৈনিক স্কুল |' দুই স্কুলের প্রসপেক্টাস হাতে নিয়ে প্রচার করল বাবা, মা | বাবার কথা ছিল – না বুঝে ভোট নয় | অবশেষে ভোট হ'ল | অনিন্দ্য রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে ভোট দিয়েছিল | বাবা দুই-একে হেরে গিয়েছিল | একদিন ওরা তিনজনে পৌঁছে গিয়েছিল দেওঘর |

বাবা বলত নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে কখনও সমঝোতা নয় | কিন্তু অন্যের বিশ্বাসকেও মর্যাদা দিতে হয় | বাবা ছিল ঘোষিতভাবে নাস্তিক আর মা ঘোরতর ঈশ্বর বিশ্বাসী | পুজো-আচ্চা, বার-ব্রত কোন কিছুই মায়ের বাদ যেত না | এ নিয়ে বাবা মায়ের কোনও বিবাদ ছিল না | বাবা সমস্ত অর্থেই মাকে সহযোগিতা করত | বাবা বলত 'প্রত্যেক মানুষ আলাদা, তাদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ আলাদা | কেউ কারও ব্যক্তিগত পরিসরে নাক গলাবে না | তাহলেই বাড়িতে সুস্থ পরিবেশ থাকবে |' মাকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বাবা বাইরের সিঁড়িতে বসে থাকত |

আমি তখন দেওঘরে ক্লাস নাইনে | গার্জেন কল – অনিন্দ্য সিগারেট খেয়েছে | মা একদম বিধ্বস্ত, বাবা এসে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল | অনিন্দ্য চুপ | চুপ করে থাকার অর্থ

'হ্যাঁ'| তবু বাবা বলল, 'হ্যাঁ বা না বল |' অনিন্দ্য বলেছিল, 'হ্যাঁ'| তখন মহারাজকে গিয়ে বাবা বলেছিল, 'অনিন্দ্য অন্যায় তো নিশ্চয়ই করেছে | কিন্তু ও তো আমার কাছে থাকে তিন মাস আর আপনাদের কাছে ন'মাস | আপনারাই তো ওর ভালমন্দ দেখবেন |' মহারাজের সঙ্গে দেখা করে ফেরবার সময় বাবা বলেছিল, 'তুই সত্যি কথা বলেছিস তাই আমি খুব খুশি | যদি দন্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নয় | আর খাস না, কেমন? বড় 'হ তখন আমরা একসঙ্গে খাব |' বাবা কথা রেখেছিল, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বেরনোর পর বাবা সিগারেট অফার করেছিল | তারপর যখন বাবার শ্বাসপ্রশ্বাসের অসুখ শুরু হ'ল তখন সিগারেট খাওয়া বারণ হয়ে গেল | বাবা সিগারেট খেতে এত ভালবাসত – বাবার দুঃখে অনিন্দ্যও ছেড়ে দিয়েছিল |

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও বামপন্থী রাজনীতির সমর্থক হয়ে উঠছিল | চাকরি জীবনের বন্ধুদের নিয়ে গোষ্ঠী তৈরি করে মোটা টাকা চাঁদা তুলে পার্টিতে পাঠাত | খবরের কাগজে, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় লেখালেখি করে পার্টির আদর্শ প্রচার করত | বাড়িতে রাজনৈতিক আলোচনা হতো, তর্ক-বিতর্ক হতো | বাবাকে বোঝাত পুরনো ধ্যান-ধারণা বদলাতে হবে, পৃথিবীর উন্নত দেশের কমিউনিস্ট পার্টি কীভাবে চলছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে | দাবী দাওয়ার আন্দোলনের পাশাপাশি নিজের নিজের দায়িত্ব পালনের কথাও কর্মীদের শেখাতে হবে | কিন্তু বাবাকে এসব বলে কোন লাভ হোতো না, কারণ বাবা তো পার্টির নীতি নির্ধারণের জায়গায় ছিল না | পার্টি যখন প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করল না, সংসদে যথেষ্ট শক্তি থাকলেও সরকারে অংশগ্রহণ করল না, তখনও বাবার মুখে নেতৃত্বের কোন সমালোচনা শোনা যায়নি | অনিন্দ্য বাবাকে যুক্তি দিত, বৃদ্ধ বয়সে একজন মানুষ যত বড় নেতাই হোন না কেন রাজ্য রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতিতে গিয়ে কতটা সফল হতেন সেটা একটা প্রশ্ন বটে, কিন্তু এতগুলো এম.পি নিয়ে সরকারে যাব না এটা কোনও যুক্তি হ'ল? অসৎ নেতায় দেশ ছেয়ে গেছে | পার্টি তো দেখিয়ে দেবার সুযোগ পেয়েছিল কেমন করে সৎ ও দক্ষভাবে মন্ত্রীত্ব চালাতে হয় | তোমরা দায়িত্ব নেবে না মানুষ কেন তোমাদের ভোট দেবে? বাবার একটাই উত্তর, 'সিদ্ধান্তটা গণতান্ত্রিক ছিল | ভুলে গেলে চলবে না যে পুনর্বিবেচনা করার জন্যে প্রস্তাবটা আবার কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল | কিন্তু আবার সেই একই ফল হয়েছিল | গরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত তো মানতেই হবে |'

যে পার্টিকে নিয়ে বাবা স্বপ্ন দেখত সেই পার্টি যখন দুর্বল, দুর্বল থেকে আরও দুর্বল হয়ে উঠল, অনিন্দ্য তখন আরও বেশি করে পার্টি-সমর্থক হয়ে উঠল | দুর্দিনেই তো পার্টির সঙ্গে থাকতে হবে | পার্টির দুর্বলতা, দোষের কথা বাবার সামনে আর বলত না | বাবা অন্তত দেখে খুশি হোক যে তার ছেলে একজন সাচ্চা পার্টি সমর্থক |

বন্ধু, আত্মীয়, পার্টিকর্মী অনেকেই হাসপাতালে এসে গেছে, তারাই যা করার করছে | তারা এসে জানাল এবার সময় হয়েছে | তারা আরও ঠিক করেছে যে মধ্যরাতে শেষযাত্রা হবে না | কাল সকাল দশটায় বাবাকে লাল পতাকায় ঢেকে, আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গেয়ে বিদায় জানানো হবে | রাতে বাবাকে কোথায় রাখা হবে সে ব্যবস্থাও তারা করে ফেলেছে |

সকালবেলা বাড়িতে অনেক মানুষের ভীড় | বাইরের ঘরে সকলে বসে আছে | সকলে যে যার মতো স্মৃতিচারণ করছে | অনিন্দ্য সকলকে অনুরোধ করল বাইরের ঘরটা খালি করে দেবার জন্যে | একজনকে ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে মুছতে বলল | মানুষের পায়ের ধুলোয় বাবাকে শোয়াতে ইচ্ছে হ'ল না | ওর কানে এল কেউ একজন বলছে 'এইখানে বডি রাখা হবে'|

তখন ক্লাস নাইন – গরমের ছুটিতে অনিন্দ্য বাড়ি এসেছে | বাবা বলল, 'ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ছিস | বাংলা তো অবহেলা হচ্ছেই | ছুটিতে কিছু ভাল বাংলা বই পড়ে নে |' প্রথমদিনই বাবা এনেছিল সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' – 'একটু শক্ত লাগবে, ধৈর্য ধরে পড় সারা জীবনের গল্প |' আজ হঠাৎ মনে পড়ল |...

বিলু এক নম্বর সেলের কয়েদী, কয়েক ঘন্টা পরেই তাঁর ফাঁসি | প্রথম প্রথম ফাঁসির কথা শুনলেই মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠত | পরে সব সয়ে গেল | নিজের জীবনের চেয়ে স্বদেশপ্রেমকে বেশি মূল্যবান বলে মনে হ'ল | জেল সুপারিন্টেনডেন্ট যখন জিজ্ঞেস করলেন তার কোনও কিছু প্রয়োজন আছে কিনা – বিলু চোখে চোখ রেখে উত্তর দিয়েছিল তার কিছুই প্রয়োজন নেই | কিন্তু ওয়ার্ডার যখন তাকে আসামী বলল তার পছন্দ হ'ল না | মনে হ'ল তাকে চোর ডাকাত খুনেদের সাথে এক

করে দেওয়া হ'ল | যে দেশের জন্যে সে প্রাণ দিতে চলেছে সেই দেশের মানুষদের কি তার প্রতি কোনও কৃতজ্ঞতা নেই? তাকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বলা যেত না?

বিলুর মনে পড়েছিল কাশীযাত্রী মাসিমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বলেছিল মোট বত্রিশটা 'মাল' আছে, গুনে গুনে নামাতে | মাসীমার চোখে জল এসেছিল | রেশমী কাপড় দিয়ে ঢাকা মাসীমার স্বর্গীয় গুরুদেবের ছবিকে বিলু একটা 'মাল' হিসাবে গুনেছিল |

বাবাকে শেষবারের মতো বাড়িতে আনা হচ্ছে, তাঁর প্রিয় বসবার ঘরটাতে তাকে শোয়ানোর জন্যে ঘরটা পরিষ্কার করা হচ্ছে | সকলের মুখে 'বডি' শব্দটা শুনে বাবার উৎসাহে পড়া সারা জীবনের গল্পের বইটার কথা মনে পড়ল |

শ্মশানে গিয়ে ধর্মীয় আচারের কথা উঠতে ওর মনে হ'ল বাবা এসব বিশ্বাস করত না, ও নিজেও করে না | কিন্তু মা তো করে | আর বাবা তো মায়ের আবেগকে সব সময় সম্মান দিত | ফলে নিয়ম যতটুকু না মানলে নয় ততটুকু মেনে শ্মশান পর্ব মিটল |

সেদিন থেকে বডি কথাটা ওকে তাড়া করে ফিরছিল | প্রাণ বেরিয়ে গেলেই কি প্রিয়জন সঙ্গে সঙ্গে বডি হয়ে যায়? তাহলে বাবা? ও এক অদ্ভুত দোটানায় পড়ল | বাবা অবশ্য বলত মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বন্ধ হয় মানেই ব্রেন ডেথ | তারপর একে একে অন্য অর্গানগুলো কাজ বন্ধ করবে, ব্যস, সব শেষ | তার পরে কিছু নেই | জন্মের আগে কিছু ছিল না, মৃত্যুর পরে কিছু থাকে না | ওসব আত্মা-টাত্মা বলে কিছু হয় না |

অনিন্দ্যর এমনিতে বাবার কথা মেনে নিতে ভাল লাগে, কিন্তু সবকিছু এককথায় মেনে নিলে তো তর্ক আলোচনার কিছুই থাকে না | তাই পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল, 'তাহলে আমরা মহাপুরুষদের জন্ম-মৃত্যুদিনে তাঁদের স্মরণ করি কেন? তাঁদের আশীর্বাদ চাই কেন?' অনিন্দ্য মিটিমিটি হাসে, ভাবে বাবাকে কেমন বাউন্সার দিলাম | কিন্তু বাবা নিমেষে কবজির মোচড়ে ছক্কা হাঁকিয়ে বলেছিল, 'আমরা কি হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো আত্মাকে স্মরণ করি নাকি? আমরা স্মরণ করি মহাপুরুষদের শিক্ষাকে, তাঁদের আদর্শকে | আসলে শিক্ষার, আদর্শের তো মৃত্যু নেই | আর প্রিয়জনকে স্মরণ করি তাঁদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যে | তাঁদের যেন ভুলে না যাই, তাঁদের জন্যেই তো আমরা আছি | সুতরাং মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নয় স্মরণসভা |'

অনিন্দ্যর বাবার কথা মেনে নিতে ভালই লেগেছিল | কিন্তু দু'দিন ধরে নানান দ্বিধাদ্বন্দ্বে মনটা দুলছে | এইরকম পরিস্থিতিতেই তো ভোটাভুটির কথা বলত বাবা | বাবা আরও বলত ভোটাভুটির আগে ভাল করে আলোচনা দরকার, যাতে সবাই বুঝে ভোট দেয় | এইসব ভেবে মা আর মহুয়ার কাছে অনিন্দ্য কথাটা পাড়ল | মহুয়া বলল, 'ঠিকই তো | বডিই তো | আমরা মৃতদেহই তো দাহ করেছি, বাবাকে কি দাহ করা যায়? বাবা আছে |'

কিন্তু বাবাই তো বলত মৃত্যুতেই সব শেষ, তারপর কিছু অবশিষ্ট থাকে না | তাহলে এসবের দরকার আছে কি? কাকা শ্রাদ্ধশান্তির আয়োজন করছে – অনিন্দ্য সেইদিকে ইঙ্গিত করল |

মা বলল, 'শ্রাদ্ধকে শ্রদ্ধা ভাব, দেখবি আর কোনও দ্বিধা নেই |'

মহুয়া বলল, 'বাবা আগে কী বলেছিল সেসব ভুলে যাও | তোমাকে শেষ কথা কী বলেছিল সেটা মনে করো |'

বাবার কথা তখন জড়িয়ে গেছে, বোঝা যায় না | ঠিক আগের দিন কথগুলো যেন একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল | বাবা বলেছিল, 'ভাল থাকিস, চিন্তা নেই আমি তো তোদের সঙ্গেই থাকব সব সময় |'

অনিন্দ্য ভোটাভুটিতে গেল না | কারণ মা আর মহুয়ার ভোট তো পেয়েই গেছে | আর বাবা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছে | ও নিজের ভোটটা দিয়ে ফলাফল তিন/এক করে বাবাকে হারিয়ে দিল | অনিন্দ্য জানে বাবা ভোটে হেরে গেলেও হাসিমুখে গরিষ্ঠের মত মেনে নেয় |

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অনিন্দ্য বসল | সামনেই বাবার ছবিটা, চোখ জুড়ানো ছবি | চোখে স্মিত হাসি | নানা উপাচারে সাজানো শ্রাদ্ধবাসর | চারদিকে চেয়ার পাতা, মা বসে | আত্মীয় বন্ধুরা মাকে ঘিরে | মা তাদের সঙ্গে অনুচ্চস্বরে কথা বলছে | পুরোহিত তাঁদের কাজ শুরু করে দিয়েছেন | অনিন্দ্য তাঁদের নির্দেশ মতো যা করণীয় করছে | মন্ত্র যেটুকু বুঝতে পারছে বলছে, নইলে ঠোঁট নেড়ে যাচ্ছে |

এমন সময় কানে এল – 'প্রেতা ঘোরায় নমো বঃ, প্রেতা জীবায় মন্যবে স্বধায়ৈ প্রেতায় নমঃ' | অনিন্দ্য চমকে উঠল | 'প্রেতায় নমঃ'? মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল | মায়ের কানে মন্ত্রটা যায়নি, মা অন্যমনস্ক | বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে অবাক

হ'ল, ছবির চোখদুটো কি একটু হেসে উঠল? আবার কানে এল 'প্রেতায় নমঃ'| অনিন্দ্য উচ্চারণ করল 'পিতায় নমঃ'| পুরোহিত যতবার 'প্রেতায় নমঃ' বললেন অনিন্দ্য স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল 'পিতায় নমঃ'| এক অপরূপ প্রশান্তিতে ভরে গেল ওর মন|

সমাধান

সুজয় দত্ত

"আজ আপনাকে একটু বেশীই ক্লান্ত লাগছে যেন –"

- "কই, না তো! "

- "বললেই হ'ল? জানেন তো, আমার ভুল হয় না এসব ব্যাপারে|"

- "হ্যাঁ, মানে, ওই – আজ প্রাইভেট বাস ধর্মঘট তো, পুরোটা পথ অটো বদলে বদলে আসতে হ'ল, তাই –"

- "ও, আচ্ছা, শুনেছিলাম বটে | ফেরার সময় ট্যাক্সি নিয়ে নেবেন | অটোর ঝামেলা আর করতে হবে না | শিউপ্রসাদকে বলে রাখব, ডেকে দেবে|"

- "না না, কী দরকার? অটোতে তো এমনি কোনো..."

- "ব্যস ব্যস, আর কথা নয় | ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন | যান, টিচার্স কাউন্সিলের মিটিংটা আজ খুব ইম্পর্টেন্ট | আপনি না গেলে শুরু হবে না|"

- "হ্যাঁ স্যার |" বলে দ্রুত পা বাড়ায় শিল্পী | দোতলার সিঁড়ির দিকে | পনেরো ধাপ সিঁড়ি, উঠেই ডানদিকে টিচার্স রুম|

- "অভিভাবকদের তরফ থেকে যে কমপ্লেনগুলো এসেছে, তার সবকটা নিয়েই কিন্তু আলোচনা দরকার | নাহলে বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ সহজে ছাড়বে না|"

শান্ত, ভরাট গলাটায় সামান্য উদ্বেগের আভাস | শুনে পিছন ফেরে শিল্পী, আশ্বাস দেয়, "চিন্তা করবেন না স্যার, আমাদের জবাবও তৈরী | পয়েন্ট বাই পয়েন্ট | খসড়া আমার ব্যাগেই আছে|"

- "ঠিক আছে তাহলে | ফাইনাল করার আগে আমাকে একসময় শুনিয়ে যাবেন ওটা |" হুইলচেয়ার এবার পিছন ফেরে, গড়িয়ে গড়িয়ে চলে পাশের দরজা দিয়ে লাগোয়া সেক্রেটারীর ঘরের দিকে|

হ্যাঁ, হুইলচেয়ার | কাঁকুড়গাছির সি আই টি মোড়ের অলকেন্দু বোধ নিকেতনের ডিরেক্টর দীপ্তেন্দু সেন শেষ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আজ থেকে ঠিক চোদ্দ বছর এক'শ পঁচাত্তর দিন আগে | স্মৃতির ক্যালেন্ডারে একটা নাছোড়বান্দা দুঃস্বপ্নের মতো রয়ে গেছে দিনটা | ছাব্বিশে

জানুয়ারী | উনি তখন ডিরেক্টর নন, প্রধান শিক্ষক | স্কুল কম্পাউন্ডে প্রজাতন্ত্র দিবসের পতাকা উত্তোলন হবে, তাই সাতসকালে বিবেকানন্দ রোডের বাড়ী থেকে মোটরবাইক চেপে আসছিলেন | আর মানিকতলা মোড় থেকে ওই রাস্তায় পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে করতে আসছিল একই রুটের দুই যমদূত মিনিবাস | বাগমারীর একটু পরেই যখন ওভারটেক করতে গিয়ে তাদের মধ্যে একটা দীপ্তেন্দুর বাইকে দুরন্ত বেগে ধাক্কা মারল, রাস্তায় লোকজন তেমন ছিল না | পুলিশও না | ছুটির দিনের সকাল বলে কথা | ছিটকে গিয়ে উল্টোমুখী রাস্তার ধারে অনেকক্ষণ পড়ে ছিল তাঁর অচৈতন্য, রক্তাক্ত দেহটা | ডান পা-টা সম্পূর্ণ চুরমার |

পা হারালে তাও ক্রাচ আছে, হুইলচেয়ার আছে | কিন্তু চোখ? সেদিনের সেই কুয়াশা-কুয়াশা ঠান্ডা সকালে সূর্যটা একটু দেরীতে উঠেছিল – মনে আছে আজও | তারপর আর কখনো সূর্যোদয় দেখেননি দীপ্তেন্দু | সেই ভীতু-ভীতু, জড়তা মাখানো, নিষ্পাপ মুখগুলোকেও না, যারা প্রতিদিন সকালে প্রার্থনা সংগীতের লাইনে উনি গিয়ে দাঁড়ালে সমস্বরে বলত, "গুড মর্নিং, স্যার"| বলত মানে বলার চেষ্টা করত | অনেকেরই মুখ দিয়ে কয়েকটা অর্ধস্ফুট শব্দ বা গোঙানিই বেরোত শুধু | অনেকের সেটুকুও না | ওরা যে আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মতো নয় | অলকেন্দু বোধ নিকেতন আসলে মূকবধির আর জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের জন্য একটা বিশেষ আবাসিক স্কুল | সঙ্গে অটিজম স্পেকট্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে থাকা ছেলেমেয়েও আছে | তাদের দেখাশোনা আর যতটা সম্ভব শিখিয়ে পড়িয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য আছেন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিশু-চিকিৎসক | আর আছেন কিছু মনস্তত্ত্ববিদ |

সেই সূত্রেই শিল্পী রায়ের এখানে আসা | মধ্যবিত্ত পরিবারে মানুষ, তিন ভাইবোনের মধ্যে ও-ই বড় | ছোটবেলা থেকেই ভাল ছাত্রী | ক্লাস নাইনে পড়ার সময় মাকে হারাল ক্যান্সারে | তখন থেকে একহাতে সংসার সামলেছে, অন্য হাতে পড়াশোনা | যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ত্ব নিয়ে স্নাতকোত্তর করছিল যখন, অটিজম ছিল ওর স্পেশ্যাল পেপার | শিশু-মনস্তত্ত্ব বিষয়টা ওকে টানত, গবেষণার ইচ্ছেও ছিল | কিন্তু পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী বাবা হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে আংশিক প্যারালিসিসে কর্মক্ষমতা হারানোয় তাড়াতাড়ি একটা চাকরি খোঁজা ছাড়া উপায় রইল না | খুঁজতে গিয়ে দেখল সরকারী চাকরির পথে অনেক কাঁটা | ওপরমহলে বা রাজনীতির আঙিনায় জানাশোনাও তো তেমন নেই | এমন সময় কাঁকুড়গাছির এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটিতে ইন্টারভিউ দিয়ে অফার পেয়ে যাওয়ায় খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরেছিল সেটা | পারিশ্রমিক ভাল, কিন্তু বেসরকারী স্কুলে যা হয় আরকি – শুরুতে লম্বা সময় ধরে প্রোবেশন | তাই নিশ্চিন্ত থাকার কোনো অবকাশ নেই | আজও মনে পড়ে, ইন্টারভিউয়ের দিন সেই পালিশ-করা লম্বা টেবিলটার উল্টোদিকে যে চারজন বসেছিলেন, তাঁদের বেশীরভাগই মনস্তত্ত্ব আর অন্য নানা বিষয় নিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন, শুধু একজন ছাড়া | চোখে কালো চশমাপরা মিতবাক সেই ভদ্রলোক শুধু শেষদিকে একবারই মুখ খুলেছিলেন | শান্ত, ভরাট গলায় জানতে চেয়েছিলেন, "বিজ্ঞাপনে যাই বলা থাক, ইউনিভার্সিটির কাগজপত্রে যাই লেখা থাক, আসলে আমরা কী খুঁজছি জানেন? পৌনে এক'শ অভাগা, অসহায়, দুঃখী ছেলেমেয়ের জন্য একজন দরদী, স্নেহময়ী মা | বলুন, পারবেন সেই মা হতে?" এমন আচমকা, অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের উত্তরে কী করে যে সেদিন বলতে পেরেছিল "পারব স্যার, মা না থাকার কষ্ট আমি জানি", আজও ভাবলে অবাক লাগে ওর |

পরে জেনেছিল পঞ্চাশোর্ধ্ব সেই দৃষ্টিহীন ভদ্রলোক ওই স্কুলের বর্তমান ডিরেক্টর | গত চব্বিশ বছর ধরে জড়িয়ে আছেন এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে | একদিন তিনিও ওরই মতো স্নাতকোত্তর-শেষে চাকরির খোঁজে এসেছিলেন এখানে | অবশ্য মনস্তত্ত্ববিদ হিসেবে নয়, প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী অপ্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে | প্রথমে অস্থায়ী সহকারী শিক্ষক, তারপর নিজের কর্মদক্ষতায় আর নিরলস পরিশ্রমে বছর দশেকের মধ্যে একবারে প্রধান শিক্ষক | তাঁর সেই সময়কার সহকর্মীদের মধ্যে এখনো যাঁরা আছেন, শিল্পী তাঁদের কাছে শুনেছে কীভাবে অকৃতদার মানুষটি শুরু থেকেই এই স্কুলের সঙ্গে আর তাঁর আবাসিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মনেপ্রাণে জড়িয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে, পরিবার ভাবতে শুরু করেছিলেন তাদের | আর তার পরেই সেই দুর্ঘটনা | একইসঙ্গে দৃষ্টিশক্তি আর চলৎশক্তি হারাবার পর যখন জানতে

পারলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে অকাল-অবসরের জন্য বেশ ভাল প্যাকেজ দিতে রাজী, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজকে নাকি বলেছিলেন, "এটা তো প্রতিবন্ধীদেরই স্কুল – আরেকজন প্রতিবন্ধীর জন্য একটু জায়গা হবে না?" ব্যস, সেই থেকে বিবেকানন্দ রোডের বাড়ীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে উনি এখানকারই বাসিন্দা। কর্তৃপক্ষ যোগ্য মর্যাদা দিয়েই রেখেছিল ওঁকে – ডিরেক্টরের বিশেষ উপদেষ্টা করে। স্কুলবাড়ীর লাগোয়া ছোট্ট একতলা গেস্ট হাউসটার পূর্বদিকের দুটো ঘরই তাঁর গত চোদ্দ বছরের ঠিকানা। এমনকি বছর সাতেক বাদে সহকারী ডিরেক্টর আর তার চার বছরের মধ্যেই ডিরেক্টর হওয়ার পরও। ডিরেক্টরের জন্য বরাদ্দ মোটা আবাসন ভাতা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন ও দিয়ে আরো কিছু ছেলেমেয়ের কম পয়সায় ভর্তির ব্যবস্থা করতে।

প্রথমে এসব শুনে একটু আশ্চর্য লাগলেও বছর দুয়েক ভদ্রলোককে কাছ থেকে দেখার পর শিল্পীর এখন মনে হয়, ওরকমটা না হলেই বরং অবাক হওয়ার কারণ থাকত। হঠাৎ করে সবকিছু হারাবার পর মানুষ যখন তার বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাকে ধরে রাখার কোনো অবলম্বন পায়, তাকে অন্ধের যষ্টির মতো এভাবেই আঁকড়ে ধরে। তাছাড়া এই স্কুল আর তার আবাসিকদের প্রতি ওঁর ভালবাসাটা সত্যিই আন্তরিক। সেই ভালবাসা ওঁর সংস্পর্শে থাকতে থাকতে সহকর্মীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে যায়। শিল্পীরও গেছে। কিন্তু ওর তো আর এই স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যেই সমস্ত জগৎ, জীবন বাঁধা পড়ে নেই। ওর একটা বাড়ী আছে, বাবা-ভাই-বোনের প্রতি দায়দায়িত্ব আছে, সামান্য হলেও নিজের কিছু শখ-আহ্লাদ আছে। আর এসবের বাইরেও অন্য একটা গল্প আছে, যা খুব বেশী কেউ জানে না। বাড়ীর লোকেও না। সেই গল্পের নায়ক অবশ্য এখন অনেক দূরে। শুধু মোবাইলেই ধরা দেয় সে মাঝে মাঝে। আর তার সেই দূরাগত বার্তার প্রতীক্ষায় শিল্পীর নিজের অজান্তেই সারাদিন বারবার চোখ চলে যায় নিঃশব্দ করে রাখা মোবাইলটার স্ক্রীনের দিকে। ঠিক যেমন যেত এই কয়েক বছর আগেও কলেজ স্ট্রীটের কোনো চেনা বইয়ের দোকানে বা গড়িয়াহাটের মিত্র ক্যাফেতে বা ইস্টার্ন বাইপাসের রেলগেট মোড়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে। কাউকে সময় দিয়ে সময় রাখাটা কোনোদিনই ধাতে ছিল না তার। চিরকালই একটু অবিন্যস্ত, অগোছালো। কী করে যে এখন মাল্টিন্যাশনালের ঘড়ি-ধরা কর্পোরেট কালচারের সঙ্গে মানিয়ে চলছে কে জানে! শিল্পীর মনে হতো ও যেন বসন্তের একরাশ এলোমেলো হাওয়া – হঠাৎ কোথা থেকে অচেনা ফুলের গন্ধ নিয়ে এসে চকিতে উষ্ণ আদরের পরশ দিয়ে যায়, স্নিগ্ধতার আবেশ রেখে যায়।

ওদের প্রথম দেখাও এইরকম এক ঘটনার মধ্যে দিয়েই। একটা আধা-ছুটির দিনে ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে একদল উচ্ছল ছেলেমেয়ে চুটিয়ে আড্ডা মারছিল। শিল্পী তখন ফার্স্ট ইয়ারে। সকলের সঙ্গে ভাল করে আলাপ-পরিচয় হয়নি। পড়াশোনার বাইরে ইউনিভার্সিটি চত্বরে সময় কাটানোর অভ্যেসও তৈরী হয়নি। প্রতিদিন ক্লাস শেষ হলেই সোজা বাড়ী। কিন্তু থার্ড ইয়ারের মোনালিসাদির পাল্লায় পড়ে ও-ও সেদিন ওখানে। হঠাৎ আড্ডার মাঝপথে একটা বুকের বোতাম খোলা চকরাবকরা শার্ট আর জিন্সপরা ছেলে হন্তদন্ত হয়ে এসে শিল্পীর দুপাশের দুই খালি চেয়ারের একটায় ধপাস করে বসে হাঁফাতে লাগল। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, তীক্ষ্ণ নাকমুখ, গালে হালকা দাড়ি। ওকে দেখে টেবিলের উল্টোদিকে বসা অয়নাভ আর ইন্দ্রনীলের সরব অভিযোগ, "কী মাইরি তুই? সেই পরশু থেকে বলা আছে ঠিক দেড়টায় এইট বি বাসস্ট্যান্ডে মীট করব, আর তুই এখন থোবনা দেখাতে এলি?" ছেলেটি অপ্রস্তুত, কী অজুহাত দেয় ভেবে পাচ্ছে না, আমতা আমতা করে বলল, "কী করব বস, ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট সেট আপ করা আছে কাল থেকে। মালটাকে নাবিয়ে তবে তো আসব? নাহলে টিকেসি তো আবার খিস্তি মারবে। যাকগে, চল চল, এখন রওনা দিলে ট্রেলারটা শুধু হয়তো মিস করব...।" শুনে সঙ্গীরা আরো খাপ্পা, "মানে? তোর শ্বশুরের হেলিকপ্টারে যাব নাকি? পৌনে দুটো বাজে, আর এখন গেলে শুধু ট্রেলার মিস করব?" উত্তর আসে, "আরে চ না, একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিই। ঠিক আছে বাবা, ভাড়া আমি দেব। একদিন নাহয় ফোকটেই চড়ালাম..." বলে তিন সঙ্গীকে আড্ডা থেকে খুবলে নিয়ে আবার ঝড়ের মতো বেরিয়ে যায় সে। আর শিল্পীরই প্রথম চোখে পড়ে যে যাওয়ার সময় ব্যাগটি ফেলে গেছে চেয়ারে। ও সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অন্যরা বলল, "চেপে যা না, মজাটা দেখি, এক্ষুণি আবার বাছাধন দৌড়ে আসবে।" শিল্পী এমনিতেই এতক্ষণ উসখুস করছিল, ভাবছিল কী করে আড্ডা

কেটে বেরিয়ে যাওয়া যায়, বাড়ী ফিরতে দেরী হয়ে যাচ্ছে। এমন সুবর্ণ সুযোগ কেউ ছাড়ে? "না না, এই তো বেরোল, এখনো গেট পেরোয়নি বোধহয়, ছুটলে ধরে ফেলা যাবে" বলে ব্যাগটা নিয়ে ছুট লাগাল। খানিক যেতেই দেখে গেটের ঠিক মুখটা থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে ক্যান্টিনের দিকে ফিরছে ছেলেটা।

- "এই যে, নিন আপনার ব্যাগ, চেয়ারেই ফেলে এসেছিলেন।"

- "ওহ, থ্যাঙ্কস এ মিলিয়ন। আমি তো আবার... তা, প্রণাম-টনাম করবে নাকি? চটিতে কিন্তু কাদা।"

- "মানে?"

- "না, মানে, ওই 'নিন', 'ফেলে এসেছিলেন' – ওসব যে যুগের ভাষা তখন তো গুরুজনদের প্রণাম করারও চল ছিল, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

শিল্পী মনে মনে হেসে ফেলে, কিন্তু জবাব দেয় না। ওর নীরবতা দেখে ছেলেটিই বলে, "আমি স্বপ্নিল। ইলেক্ট্রনিক্স। থার্ড ইয়ার। নতুন দেখছি মনে হচ্ছে?"

- "হ্যাঁ, আমি শিল্পী, ফার্স্ট ইয়ার সাইকোলোজি।"

- "এই মেরেছে। সে তো পাগলের কারবার। শিল্পী হয়ে আবার ওসব নিয়ে টানাটানি কেন? অবশ্য হ্যাঁ, ফ্রয়েড-টয়েড ইত্যাদি সেক্সি ব্যাপারস্যাপারও আছে..."

ঠিক এই সময় গেটের বাইরে থেকে প্রবল হাঁক, "কিরে, তুই আসবি?" শুনে সে তাড়াতাড়ি "ঠিক আছে, পরে দেখা হবে" বলে এক দৌড়ে গেট পেরিয়ে বাসরাস্তায়। আর সেদিন বাড়ী ফেরার পথে শিল্পীর মনে বারবার শুধু সেই ক্ষণিক-আলাপ ও কথোপকথনের রিপ্লে।

তারপর আর কী? সত্যিই দেখা হ'ল আবার। হতেই থাকল। প্রথমে শুধু ক্যাম্পাসেই, তারপর বাইরেও। অনিয়মিত থেকে নিয়মিত। পারস্পরিক "তুমি" তো সেই প্রথম আলাপের পরেই। সেখান থেকে "তুই"-এ অভ্যস্ত হতেও বিরাট কিছু সময় লাগল না। একজন অধীর অপেক্ষায় থাকে তার পাগল হাওয়ার জন্য। আরেকজন ডুব দিতে চায় দীঘির জলের শান্ত, শীতল গভীরতায়। হাওয়া এসে ঢেউ তোলে দীঘিতে। দীঘির ঘাটে বাঁধা মন-নৌকো উতল হয়ে বলে উঠতে চায় – "তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, টুকরো করে কাছি আমি ডুবতে রাজি আছি, আমি ডুবতে রাজি আছি... । কিন্তু দীঘি তার হৃদয়ের অনুভূতি পরম গোপনীয়তার মোড়কে লুকিয়ে রাখে বুকের মাঝে, কাউকে জানতে দেয় না। শুধু হাওয়া জানে।

ওদিকে চারপাশের জগৎ ও জীবন নিজের নিয়মে গড়িয়ে চলে। স্বপ্নিলের ডিগ্রি শেষ হয়ে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ শুরু হয় সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের এক নামকরা কম্পানীতে। শিল্পীও একসময় স্নাতক পর্যায়ে বেশ ভাল রেজাল্ট করে স্নাতকোত্তর শুরু করল। কিন্তু মানুষের জীবনের চিত্রনাট্য যিনি লেখেন, শুধু তিনিই জানতেন এর পরের সিনে কী হতে চলেছে। স্বপ্নিল ভাবতে পারেনি দুবছর অ্যাপ্রেন্টিস থাকার পরেই বেঙ্গালুরুর উইপ্রো থেকে ইন্টারভিউয়ের ডাক আসবে তার আর তাতে সে সফলও হবে। শিল্পীও কি ঘুণাক্ষরে জানত, যেদিন বেঙ্গালুরুর খবরটা আসবে ঠিক তার পরের দিন ভোররাতেই ঘুমের মধ্যে স্ট্রোক হবে বাবার? হাসপাতাল থেকে যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, প্রায়-অচল শরীরটা ফিরে এল বাড়ীতে, তাকে বাবা বলে কল্পনা করতে চোখ ফেটে জল আসছিল ওর। কিন্তু দীঘির গভীরের সেই তোলপাড় তার জলের উপরিতলকে একটুও কাঁপায়নি। ভাইবোন এখনো সাবালক হয়নি, দিদিকে তাই শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে – এটাই বারবার বলছিল সেদিন ও নিজেকে। শুধু একবার বাবার শোওয়ার ঘরের বাইরে এসে অপেক্ষমান স্বপ্নিলের হাতদুটো ধরে বলল, "এই সময়ে তোকে পাশে পাওয়াটা খুব ভাইটাল হতো রে।" চোখ নাবিয়ে স্বপ্নিল মৃদুস্বরে উত্তর দিয়েছিল, "সামনের উইকেন্ড অবধি তো আমি আছি। তারপর অবশ্য...। কিন্তু তুই চিন্তা করিস না, আমি সৈকত আর পল্টুকে বলে দিয়ে যাব, তোর কোনোরকম দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে পাবি ওদের। আর দাঁড়া না, ওখানে গিয়ে একটু সেটেল্ড হয়ে নিই, তারপর মেসোমশাইকে আমি ওখানকার ফোর্টিস হাসপাতালে নিয়ে যাব – ওদের ফিজিও-রিহ্যাব সেন্টারটা টপ ক্লাস। ওখানে না হলে মণিপালে তো সিওর।"

দমদম থেকে স্বপ্নিলের প্লেন বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে ডানা মেলেছিল যেদিন, শিল্পী যেতে পারেনি বিদায় জানাতে। দু'ভাইবোনের একজন মাধ্যমিক দেবে সামনের বছর, একজন উচ্চমাধ্যমিক। দুজনেরই প্রিটেস্ট পরীক্ষা ছিল সেদিন। অগত্যা মোবাইলেই বিদায় জানাতে হয়েছিল ওকে। ভালই

হয়েছিল, কারণ এরপর থেকে তো শুধু ওতেই টুকরো টুকরো ছবি দেখবে স্বপ্নিলের নতুন জীবনের | প্রথমদিকে উৎসাহের আতিশয্যে ওদিক থেকে প্রতিদিন বহুবার করে ফোন, অনেক মেসেজ – তারপর আস্তে আস্তে তার ঘনত্ব কমতে কমতে এখন তো বেশীরভাগ সময় ডাকটা এদিক থেকেই যায় | ঘোষিত কারণ – কাজের চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত | কোনো অঘোষিত কারণও আছে কিনা সেটা তো আর শিল্পী দেখতে যাচ্ছে না | আর আজকাল যেটুকু কথা হয় ওদের মধ্যে, তার বেশীটাই জুড়ে থাকে স্বপ্নিলের অসহিষ্ণু আবদার, "তিন বছর হতে চলল, কবে আসছিস বল তো এখানে কলকাতার পাট চুকিয়ে? শিমুল-শিশির দুজনেই এখন অ্যাডাল্ট, কলেজে পড়ছে | দে ক্যান টেক কেয়ার অফ দেমসেল্ভস | আর মেসোমশাইয়ের জন্য টুয়েলভ আওয়ার শিফটে আয়া না রেখে ওটা টোয়েন্টিফোর আওয়ার করে দে – ব্যস, তাহলেই নিশ্চিন্ত | বলেছি তো খরচ আমি দেব |"

- "আর আমার চাকরি? ওটার কী হবে?"

- "আর ইউ কিডিং মি? আই মীন, তুই এত খেটে পড়াশোনা করলি, ডিগ্রি করলি, সারাজীবন একটা মেন্টালি রিটার্ডেডদের স্কুলে জাস্ট দিদিমণি হয়ে থাকার জন্য? বেঙ্গালুরুতে একবার একটা প্রাইভেট প্র্যাকটিসের লাইসেন্স পেয়ে গেলে ক্যান ইউ ইমাজিন হোয়াট উইল হ্যাপেন টু ইওর ক্যারিয়ার?"

- "জাস্ট দিদিমণি – তাই না? এই তিন বছরে তুই কেমন যেন বদলে গেছিস নীল, মাঝে মাঝে চিনতে পারি না তোকে |"

- "স্যরি, আমি ঠিক ওটা মীন করিনি, কিন্তু তুই আমাকে বল তো, একটা সাজানো গোছানো সুখী সংসার চাস না তুই? দুজনে মিলে স্বপ্ন দেখতে চাস না? চাস না মা হতে? চুপ করে থাকিস না, উত্তর দে |"

- "বলেছি তো, সময় এলেই উত্তর পাবি |"

নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলে ভয় দেখানো, স্পিচ থেরাপির নামে বকাঝকা, দিনকে দিন আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের খাবারের মেন্যুতে ব্যয়সংকোচের চেষ্টা, আবাসিক শিশুরা এসব নিয়ে মা-বাবার কাছে নালিশ করলে তাদের মানসিক নিপীড়ন, কর্মচারীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় সত্যিকথাগুলো প্রকাশ্যে আনতে চাইলে জোর করে তাদের মুখ বন্ধ করা – বোর্ড অফ ট্রাস্টির কাছে একদল অভিভাবকদের তরফ থেকে পেশ করা এই লম্বা অভিযোগ তালিকার প্রতিটির খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জবাব দেওয়ার ভার ছিল শিল্পীদের কমিটির ওপর | কাগজে কলমে যার নাম স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ওভারসাইট কমিটি | অভিযোগগুলো যে ভিত্তিহীন, তা প্রমাণের জন্য বিশদ তথ্যসম্বলিত একটা রিপোর্ট তৈরীর কাজটা নিখুঁতভাবেই করেছিল কমিটি, ফলে বোর্ড অফ ট্রাস্টির জরুরী সভায় সেইসব অভিযোগের অধিকাংশই খারিজ হয়ে গেল ধ্বনিভোটে | কিন্তু বাকবিতণ্ডায় উত্তপ্ত সেই সভায় কিছু অভিভাবক সরাসরি আঙ্গুল তুলল স্কুলের ডিরেক্টরের দিকে | দাবী করল তাদের কাছে অকাট্য প্রমাণ আছে ডিরেক্টর বেআইনীভাবে আর্থিক অনুদান নিয়ে, অর্থাৎ সোজা কথায় ঘুষ খেয়ে, কিছু অভিভাবককে ভর্তির ব্যাপারে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছেন ভর্তি-তালিকার বাইরে গিয়ে | আর তা ঢাকতে স্কুলের বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসেবে ব্যাপক কারচুপি করেছেন | অতএব তাদের দাবী ডিরেক্টরকে অবিলম্বে সব সত্যি স্বীকার করে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে আর পদত্যাগ করতে হবে | নাহলে অভিযোগকারীরা শুধু সোশ্যাল মিডিয়া আর সংবাদমাধ্যমে এই খবর ছড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত থাকবে না, স্কুল কর্তৃপক্ষকে রীতিমতো হুমকি দিয়ে গেল যে শিগগিরই আদালতে দেখা হবে |

সেদিন বিকেলে স্কুল ছুটির পর টুকটাক কিছু কাজ সেরে বাড়ীমুখো হতে একটু দেরী হয়েছিল শিল্পীর | আর সবাই তখন চলে গেছে | হাজিরা খাতায় সই করতে ডিরেক্টরের অফিসে ঢুকে শিল্পী দেখে হুইলচেয়ারের হেডরেস্টে মাথা পিছনে হেলিয়ে, দুহাত দুদিকে ঝুলিয়ে কোণের দিকের টেবিলটায় নিঃশব্দে বসে আছেন দীপ্তেন্দু | চোখের কালো চশমাটা টেবিলে খুলে রাখা | ঘর অন্ধকার | শিল্পী কথা না বলে নিজের মোবাইলের আলোয় সই করে বেরিয়ে যাচ্ছিল | হঠাৎ পিছন থেকে পরিচিত গলায় প্রশ্ন, "জানতে ইচ্ছে করে না আপনার?" একটু বেশী গভীর থেকে উঠে আসছে কি সেই কণ্ঠস্বর? একটু বিষাদমাখা কি?

ঘুরে আবার ঘরে ঢোকে শিল্পী, "কী স্যার?"

- "নাঃ, আপনার কৌতূহল বড়ই কম | নাহলে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতেন গলা না শুনেই আমি বুঝলাম কী করে যে এটা আপনি |"

- "হ্যাঁ, মানে, আমি ঠিক..."
- "ল্যাভেন্ডারের গন্ধ আমার খুব প্রিয়, জানেন? আজ সকালে মিটিং-এ যাওয়ার আগে আপনাকে যখন ডেকে পাঠিয়েছিলাম এঘরে, ওই গন্ধটাই পেয়েছিলাম।"
- "ওঃ, আচ্ছা, আপনি স্যার খুবই..."
- "আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো – নাঃ, তার আগে বসুন ওই চেয়ারটা টেনে। খুব তাড়া নেই তো?"
- "না স্যার, ঠিক আছে" বলে বসে শিল্পী। একটু অস্বস্তি নিয়েই, কারণ সন্ধ্যেবেলায় এভাবে একা ডিরেক্টরের সঙ্গে এক ঘরে কখনো কাটায়নি। তাছাড়া আজ দুপুরের সেই অগ্নিগর্ভ মিটিং-এর পর অফিসে ফিরে আর কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেননি ভদ্রলোক। দরজা বন্ধ ছিল সারা বিকেল।
- "হ্যাঁ, যা বলছিলাম – আচ্ছা, হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে শুনেছেন আজ দুপুরে মিটিং-এ কী হয়েছিল?"
- "হ্যাঁ, মানে, উনি যতটুকু..."
- "শুনে তো আপনার খুশী হওয়ার কথা। আপনাদের কমিটির পয়েন্ট-বাই-পয়েন্ট জবাবী রিপোর্ট বোর্ড অফ ট্রাস্টির ভোটে জিতে গেছে।"
- "জানি স্যার, কিন্তু শুনলাম ওরা আবার নতুন করে কীসব..."
- "হ্যাঁ, বলেছে। একঘর লোকের সামনে চীৎকার করে বলেছে আমি ঘুষখোর, জালিয়াত – বলেছে আমার কাছ থেকে প্রকাশ্য অ্যাপোলোজি আর রেজিগনেশান চায়। নাহলে এই স্কুলকে ওরা আদালতে দেখে নেবে।"
- "স্যার, এ এমন অলীক, অবাস্তব কথা যে একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও কেউ..."
- "গঙ্গা খুব পলিউটেড হয়ে গেছে মিস রায়। সবাই সব মিথ্যে আজকাল গঙ্গায় ডুব দিয়েই বলে তো, তাই।"
- "কিন্তু আদালতে এমন জলজ্যান্ত মিথ্যে ওরা প্রমাণ করবে কী করে স্যার?"
- "সত্যিকে মাটিচাপা দেওয়ার মতো মাটির যে ওদের অভাব নেই। আচ্ছা, গোড়াতেই আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনার জানতে ইচ্ছে করছে না কেন ওরা প্রথমে গার্জেনদের খেপিয়ে, তারপর আমার গায়ে নোংরা ছুঁড়ে এভাবে আমাকে টেনে মাটিতে নামাতে চাইছে?"
- "কেন স্যার?"
- "বলি তাহলে, শোনো। সে অনেকদিন আগের কথা। তখন তুমি আসোনি। এই দ্যাখো – 'তুমি' বলে ফেললাম। কিছু মনে করলে না তো?"
- "আরে না না স্যার! এতদিন পর বাঁচালেন একটা অস্বস্তি থেকে। আমাকে 'তুমিই' তো বলবেন।"
- "হ্যাঁ, তুমি তো আমার মেয়ের বয়সী। যাক, যা বলছিলাম, বছর সাত-আট আগে, তখনও আমি ডেপুটি ডিরেক্টর, ডিরেক্টরের জন্য আমার নাম বিবেচনা করার কথা ভাবছে ম্যানেজমেন্ট, আমার কাছে একদিন প্রীতম খৈতান আর হর্ষ মহেশ্বরী বলে দুজন লোক এল। এর অল্প দিন আগেই আমি এখানে ভর্তির জন্য নীড-বেসড সাবসিডি চালু করেছিলাম প্রাইভেট ডোনেশন ফান্ড থেকে। শুনলাম ওরা নাকি দুজনেই তার ডোনার। তা, ওদের আবদার হ'ল, ওরা আমাকে একটা নামের তালিকা সুপারিশ করে পাঠাবে, সেই তালিকার সবাইয়েরই মানসিক প্রতিবন্ধী সন্তান আছে, আমি যেন ওদের বার্ষিক আয়ের বা মোট সম্পত্তির কোনো প্রমাণ ছাড়াই ওদের ছেলেমেয়েদের সাবসিডিতে ভর্তি করে নিই।"
- "তারপর স্যার?" ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যাচ্ছে। ফিরতে দেরী দেখে ভাই আর বোনের কাছ থেকে উদ্বিগ্ন টেক্সট আসছে। তাও কথা চালিয়ে যায় শিল্পী। এই মানুষটাকে এরকমভাবে ও আগে কখনো দেখেনি।
- "আমি শুনেই বুঝলাম যাদের কথা বলছে তাদের কেউ দুঃস্থ তো নয়ই, বরং গভীর জলের মাছ। তাদের আয়-সম্পত্তির হিসেবে খুব সম্ভবত কোনো গন্ডগোল আছে। তাদের ছেলেমেয়েরা সাবসিডিতে স্কুলে ভর্তি আছে এটা দেখিয়ে নিজেদের কাগজে কলমে দুঃস্থ প্রমাণ করার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কুমতলব। মুখের ওপর বললাম, ওই প্রস্তাব নিয়ে আর যেন দ্বিতীয়বার এই স্কুলের চৌহদ্দিতে না ঢোকে ওরা। নাহলে কিন্তু ওদের ওই লিস্ট সোজা রাজস্ব আর শুল্ক দপ্তরের হাতে চলে যাবে। ওদের মুখের চেহারা তো আর দেখতে পাইনি, কিন্তু গলার স্বরে বুঝেছিলাম এবার প্রতিশোধের জন্য তৈরী থাকতে হবে।"
- "কী ভয়ংকর! ওরা কি কিছু..."
- "অনেক কিছু। প্রথমে ডোনার ফান্ড থেকে নিজেদের

ডোনেশন উইথড্র করল, তারপর বোর্ড অফ ট্রাস্টিতে প্রভাব খাটিয়ে আমার ডিরেক্টর হওয়া আটকাতে চেষ্টা করল, তারপর স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের মিথ্যে মামলা এনে বহুদিন ভোগাল | সে-মামলা লড়তে গিয়ে স্কুলের প্রায় নিঃস্ব হওয়ার জোগাড় | এসবই তোমার আসার আগে | আর এখন গার্জেন্স কাউন্সিলে নিজেদের পেটোয়া লোক ঢুকিয়ে কী করছে তা তো দেখছই | আমি নিঃসন্দেহ ওরাই পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে | মিথ্যে ভয় ওরা দেখায় না | মামলা করবে বলেছে যখন, করবেই | আর মিডিয়ায় স্কুলটার নামে বিষ ছড়াবে | এমনিতেই এ বছর আবাসিক কমে যাওয়ায় স্কুলের বাজেটের যা টালমাটাল অবস্থা, লম্বা মামলা চাপলে স্কুলটাই না উঠে যায় | তাছাড়া ওরা যা লোক, মামলায় না হলে হয়তো গুন্ডা লাগিয়ে হামলা করবে |"

- "কী করবেন তাহলে স্যার?"

- "একটা রাস্তা বার করতে হবে... একটা রাস্তা বার করতেই হবে | দেখি ভেবে | যে অপরাধ আমি করিনি তার জন্য ক্ষমা চাওয়ার বা স্বীকারোক্তি দেওয়ার প্রশ্নই উঠছে না | কতগুলো নর্দমার নোংরা কীটের কাছে মাথা নোয়াতে তো আমি পারব না | আবার আমার জন্য একদল নিষ্পাপ শিশুর কোনো ক্ষতিও হতে দেওয়া যায় না | যাকগে, ওসব নিয়ে ভেবো না, আমার ওপর ছেড়ে দাও | কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল... শিউপ্রসাদকে দিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে নাও |"

- "না না, ট্যাক্সি নিয়ে ব্যস্ত হবেন না স্যার, আমি ঠিক চলে যাব | আপনি এবার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন তো | আর আপনি যতক্ষণ মাথার ওপর ছাতা হয়ে আছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস কেউ এই স্কুলের কিচ্ছু করতে পারবে না |"

- "পাকামি করো না তো, যা বলছি শোনো | একটা কথা মনে রেখো – তোমরা, মানে তুমি, তপতী, অনিন্দিতা, সুপর্ণা, পারমিতা, শতরূপা হলে এখানকার এই গড-ফোর্সেকেন ছেলেমেয়েগুলোর সত্যিকারের মা | বেঁচে থাকার অবলম্বন | বাবা ছাড়াও বাচ্চারা ঠিকঠাক বড় হতে পারে, কিন্তু মা ছাড়া হয় না | আমার বাবা যখন মারা যান আমার বয়স কত জানো? আট | তারপর মা-ই তো আমায় এত বড়টি করেছে | এখানকার এই ফুটফুটে বাচ্চাগুলো ভাল করে কথা বলতে পারে না, পড়তে-লিখতে পারে না, নিজেদের দেখাশুনো করতে পারে না, কিন্তু এদের চোখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেছ কখনো? দেখবে একটু ভালবাসার জন্য কী গভীর আকুতি সেখানে | আর যদি একফোঁটাও ভালবাসা দাও, তার দশগুণ ফিরিয়ে দেয় ওরা | ওদেরও স্বপ্ন দেখতে শেখানো যায়, জানো? সিরিয়াসলি – আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি | জীবনের এই এতগুলো বছর ওদের নিয়েই তো ছিল আমার সুখের সংসার |"

- "সত্যি | এই অল্প ক'বছরে অনেককিছু শিখলাম, অনেককিছু পেলাম আপনার কাছে | আশাকরি আপনার এই মিশন আমরা ঠিকঠাক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব | আপনার আস্থার মর্যাদা রাখতে পারব |" চেয়ার ঠেলে উঠতে উঠতে বলে ওঠে শিল্পী |

- "এস তাহলে | তুমিও আজ আমাকে কী দিলে, তুমি নিজেই জানো না | বুকটা হালকা হওয়া দরকার ছিল আজ রাতে | বড় দরকার ছিল |"

- "গুডনাইট স্যার | কাল রবিবার, আর অফিসে আসবেন না | আপনি আজকাল ছুটির দিনেও বড্ড পরিশ্রম করেন | সোমবার দেখা হচ্ছে তাহলে |"

না, সে দেখা আর হয়নি | কারণ মিথ্যের কাছে মাথা না নোয়ানোর অনমনীয় প্রতিজ্ঞা আর নিজের প্রাণাধিক প্রতিষ্ঠানটিকে দুষ্টচক্রের প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে বাঁচানোর সেই কঠিন সমীকরণের একটিই সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন দীপ্তেন্দু সেন | সোমবার সকালে তাঁর কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায় অলকেন্দু বোধ নিকেতনের কর্মচারীরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে ঘুমের ওষুধের একটি খালি শিশি খুঁজে পেয়েছিল | আর সহকর্মীদের টেক্সট মেসেজ থেকে খবরটা পাওয়ার পর দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে স্কুল কমপাউন্ডে ছুটে যেতে যেতে শিল্পী রায় তার ফিয়াঁসের সম্প্রতি করা প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেয়েছিল |

তার সুখের সংসার, স্বপ্ন, মাতৃত্ব – কোনোকিছুর ঠিকানাই আর কর্ণাটক নয় | কাঁকুড়গাছি |

চক্রব্যূহ

(একজন ভাল মানুষের উপাখ্যান)

দেবব্রত তরফদার

১

আবির লেখাপড়ায় গবেট কিন্তু তাকে কেউ হাবাগোবা বলতে পারবে না | সরল, পরোপকারী হওয়ার জন্য সবাই তাকে পছন্দ করে | তার সঙ্গে এই জটা বাগদির ঝামেলা বেধে যাবে তা আবিরই কস্মিনকালে ভাবেনি | জটা বাগদির বাড়ি সীতানাথপুরে, তার বাবা যখন তবলদারী করত আর রোগাপটকা জটা বাবার পিছনে কুড়ুল হাতে ঘুরে বেড়াত | তখন কেউ ভাবেনি এই ছেলেটি একদিন অনেকের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে | সামান্য চুরি ছিনতাই দিয়ে হাতেখড়ি, আর এরপর রাজনৈতিক নেতাদের বদান্যতায় তার সাহস বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে ছিনতাইয়ের পর দরকারি কাগজপত্র থাকলে পরে তা ওই লোকের কাছে ঠিক পৌঁছে দেয় | বিধায়কের বাড়ি পাশের গ্রামে, সি পি এম-এর টিকিট নিয়ে বহু ভোটে জিতলেও তার অতীত খানিকটা জটার মতোই ছিল | বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার সাত/আট বছরের মধ্যেই এই অবস্থা । বিধায়কের প্রচ্ছন্ন মদতে জটার এতই বাড়বাড়ন্ত যে এতে আসাননগরের পাটব্যবসায়ীদের রাতের ঘুম নেই | কখন জটা কোন গদিঘরে লোক পাঠিয়ে টাকা চেয়ে বসে | আসলে পাটের ব্যবসা ধারে নগদে হলেও এদের অত্যাচারে অনেক চাষী এখন বাঙাল মোকামগামী | পাটের অনেক বড় মোকাম ভিমপুর আসাননগরে, প্রায় শ'খানেক গ্রামের পাটখন্দের কারবার হয় এখানে | জটার বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে এলাকার ছোটবড় সমাজবিরোধীরা তার সঙ্গে এসে জুটেছে | পাশেই বাংলাদেশ বর্ডার, গরুপাচারকারীদের স্বর্গ আর সেখানেও বখরার লোভে যুবসমাজের একটি অংশ জটার মতো মানুষের অনুগামী | আবিরের ঝামেলা বেধেছিল অবশ্য জটার হাতাচামচাদের সঙ্গে | ঘটনা তেমন কিছু নয় | মোহিনী এই মোকামের বড় পাটব্যবসায়ী বৃন্দাবন সাহার একমাত্র মেয়ে, সুন্দরী এবং মেধাবী | বৃন্দাবন সাহা ব্যবসাদার হলেও তার ঘরে একসঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী বিরাজমান | বড় ছেলে সরকারী আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে দিল্লির জাতীয় আর্ট গ্যালারিতে কর্মরত, ছোট ছেলে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মেকানিক্যালে তৃতীয় বর্ষ আর একমাত্র মেয়ে মাধ্যমিকে এলাকার সেরা রেজাল্ট করে কৃষ্ণনগরে মেয়েদের সরকারী স্কুলে সায়েন্স পড়ে এগার ক্লাসে | তার টার্গেট ডাক্তারি পড়া | এরা আবিরের আত্মীয় নন, প্রতিবেশী, তবে ভবিষ্যতে আত্মীয় হবার সম্ভাবনা রয়েছে |

আবিরের বাবা জগবন্ধু সাহার ঘরে লক্ষ্মী চঞ্চলা হলেও সরস্বতী একেবারে তাঁকে ছেড়ে যাননি | নোয়াখালীর বাসিন্দা জগবন্ধু সাহা এদেশে আসেন ষাটের দশকের প্রথমদিকে | প্রথমে ছোটখাট ব্যবসা শুরু করেন | কিছু বছর পর তাঁর শিক্ষক বাবা অবসর নেবার পর সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা নিয়ে এদেশে আসার পর অনভিজ্ঞ জগবন্ধু বিরাট বাড়ি আর গোডাউন ফাঁদিয়ে বসে প্রায় সব টাকা শেষ করার পর সেই যে ব্যবসার মূলধনে টান পড়ে, এখনো পর্যন্ত তার সমাধান হয়নি | সঠিক ব্যবসায়ীবুদ্ধি আর ট্যাঁকের জোর না থাকায় কোনো রকমে ব্যবসা চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে | আর তার বাবা মারা যাবার পর একেবারে ন্যাজেগোবরে অবস্থা | আবির বাদে জগবন্ধু সাহার আরো একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে | বড় ছেলে সঞ্জয়, আচার আচরণ মেধা সবদিক থেকেই এলাকার সেরা | এখন কলকাতা মেডিকেল কলেজের এম বি বি এস-এ তৃতীয় বর্ষের ছাত্র | মেয়ে সোনালীও বড়দার পিছু পিছু কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ইংরেজি অনার্সের ছাত্রী | এসবের মধ্যে আবিরই ব্যতিক্রম | সে এদের কারো মতোই নয় | ছোটবেলা থেকেই ফুটবল মাঠ, ডান্ডাগুলি, ঘুড়ি লাটাই, লাট্টু লেত্তি এসবের সঙ্গেই তার সখ্যতা ছিল বেশি | অথচ ছোটবেলা থেকেই ঘর এবং বাইরে দাদার সঙ্গে এক অসম লড়াইয়ে ফেলে দিত মানুষজন | এখন তার মনে হয় স্কুলের রবিস্যার দাদার সঙ্গে তুলনা করে প্রতিদিন নির্যাতন না করলে লেখাপড়াকে বোধহয় একটু ভালবাসতে পারত, সঞ্জয় সাহার ভাই হয়ে পরপর দুবার ফেল করে মা সরস্বতীকে টা টা করতে হতো না | তার কথা শোনার মানুষ কই! ছোটবেলা থেকেই বাবার মুখের চাইতে হাত চলত বেশি | মোটা চামড়ার ধ্যাতলা আবির নিজেকে তাই ছেড়ে দিয়েছে সময়ের উপর | তাই সাড়া জাগিয়ে তার দাদা যখন মেডিকেল পড়তে যায়, বোন উঠে যায় তার উপরের ক্লাসে,

আর পরপর দুবার ফেল করে সে সামিল হয় বাবার প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া ব্যবসায়।

তাদের ব্যবসা! এই কথাটা শুনলে হাসি পায় আবিরের। ফাঁকা ঘরের পাহারাদার সে। গোডাউন যে কেন বানিয়েছিল তার বাবা তা ভগবানই জানেন। সংসার আর ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচ চালাতে গিয়ে জগবন্ধু সাহা জেরবার। চারবিঘে ধানজমির একবিঘে বিক্রি হয়ে গেছে বড়ছেলের ভর্তির বছরেই। চাপ আর হতাশায় তার সব রাগ পড়ে আবিরের উপর; যেন সেই সবকিছুর জন্য দায়ী। আবিরের অবশ্য এসব ছোটবেলা থেকেই গা-সহা। রান্নাঘরে খেতে বসলেও তাকে কথা শুনতে হয়, একটু বেশি খাওয়াও যেন তার অপরাধ। এসব সত্ত্বেও সে হাসিখুশি আর চনমনে তাই তাকে অনেকে নির্বোধ হাবাগোবা ভাবে। এই অবস্থায় বাবা কীভাবে খরচাপাতি চালায় সেটাই ভাবে আবির। তবে আগে কানাঘুষোয় যা শুনেছে এখন তা জলের মতো পরিষ্কার। মোহিনীর বাবা মেয়ের জন্য সঞ্জয়কে নির্বাচন করে রেখেছেন। প্রয়োজনে খরচাপাতি দেন হয়তো। এমনিতেই বৃন্দাবন সাহা আবিরের সঙ্গে একটু অতিরিক্ত ভাল ব্যবহার করেন যা আবিরের না পসন্দ। দেমাকি মোহিনীর সঙ্গে কোনোদিনই কথা হয়নি আবিরের যদিও তারা প্রতিবেশী। দাদা আসলে তাদের ভাইবোনদের নিমন্ত্রণ হয় ওই বাড়িতে কিন্তু আবির কোনোদিন যায়নি, কেউ তাকে জোরও করেনি। দাদা বললেও সোনালীর আপত্তি আছে বুঝতে পারে। আবির জানে সব জায়গায় যেতে নেই, অনেক জায়গায় সে বেমানান। আবির কোন কাজ করতে পিছপা নয়, তার পিটুলিতলার সাকরেদদের মতো। সবাই শ্রমজীবী, আবির লুকিয়ে কিছু কাজ করে তাদের সঙ্গে; জানলে বাবা, দাদা, বোনের সম্মানহানি হবে, অথচ দাদাকে বন্ধক রেখে হাত পাততে বাবার বাধে না। এ বড় গোলমেলে হিসেব। দাদা তার প্রিয় একজন মানুষ হলেও কী করে ওই বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে যায় তাও বোঝে না আবির। দাদার সঙ্গেই সোনালীর ভাবসাব বেশি। লেখাপড়ার কথায় তার থেকেই বা লাভ কী। অন্য ব্যাপারে কথা বলতে গেলে বোন অসন্তুষ্ট হয় তাই আবিরের পৃথিবী আলাদা হয়ে যায় সময়ের সঙ্গে। বাড়িতেও ভাল লাগে না। মায়ের মুখে হাসি দেখে না, সারাদিন মুখবুজে সংসারের জোয়াল ঠেলে চলেছে। বাবাকে শেষ কবে হাসতে দেখেছে তা মনেই পড়ে না। শুধু দাদার কথা বলার সময় বাবার মুখের রেখাগুলি নরম হয়। দাদা পরিবারের গর্ব আর বাবার স্বপ্নের ঘোড়সওয়ার, যে সাফল্যের সোনার কাঠি নিয়ে আসবে একদিন। বাড়িতে আবিরের একমাত্র বন্ধু তার ঠাকুমা, যার কাছে সে ছোটবেলা থেকেই শোয়, দুজনের মধ্যে রাত্রে কথাবার্তা হয়, একজনের অবশ্য খাঁটি নোয়াখালী টানে।

'তর ঠাউরদা কতো জানুইন্যা মানুষ আছিল, তর দাদা আর বইন কত্তো কত্তো ভালা আর তুই অইছত এক্কার মুরুক্ষ।'

আবির হাসে।

'বেটকায়েস না, তোর ব্যাটকানি দেখলি গা জ্বালি যায়ের। কী করি খাইবি?'

'কেন শরীরে তাগত আছে, দরকার হলে মোট বইব, ঠেলা চালাব।'

'কিল্লাই, তোর কিছু নাই। বাপের ব্যবসা ছাবি।'

'ওঃ তোমার ছেলের ব্যবসা, ওতো মড়া আগলে পড়ে থাকা।'

'তর দাদা; ডাক্তার অইলে ম্যালা টিয়া কামাইবো, হেইত্তে তেন তোরে ব্যবসা করি দিব।'

এই স্বপ্ন বাড়ির সবাই দেখে, দাদা এই পরিবারে আলাদিনের সেই প্রদীপটার মতো। তার অবশ্য এরকম কোনো স্বপ্ন নেই। বাবা সংসারে ঠেকনো দিলেও আসল লড়াইটা লড়ছে তার দাদা। তবে স্বপ্ন একটা থাকা দরকার। স্বপ্নই বাঁচিয়ে রাখে। ঠাকুমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তোর লাই মরিও শান্তি হাইতাম না।'

'ঠিক আছে মরতে হবে না, ঘুমোও এবার।'

২

মোহিনী পড়ে এগার ক্লাস সায়েন্স, কৃষ্ণনগর সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে। শনি রবিবার ফিজিক্স পড়তে যায় ভীমপুরে এক নতুন স্যারের কাছে। বেশিরভাগ দিন সাইকেলেই যায়। শীতের দিনে ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে আসে। ভীমপুর আসাননগরের মধ্যে দূরত্ব মেরেকেটে দু'কিলোমিটার। মাঝখানে খোলা চাষের মাঠ, কদমখালী শ্মশানের কাছে বিরাট খেলার মাঠ। রাস্তার দুধারে বড় বড় তেঁতুল, আম, কয়েৎবেল গাছ। ইদানীং জটা বাগদির চ্যালাচামুন্ডারা সন্ধ্যার আগেই ঠেক জমাচ্ছে। আবিরের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অ্যান্টেনায় কিছু ধরা পড়ে কি? মোহিনী সুন্দরী মেধাবী, সাহসী এবং বাপ মায়ের আদরে

কিছুটা বেপরোয়া | এক শনিবার দুপুরে সে বাড়ি থেকে বেরোনোর পর আবির দৌড়ে গিয়ে তার পথ আটকায় | 'সাইকেলে যাও কেন, বাসে যেতে পারো না?

'কেন তোমার অসুবিধে কোথায়?' তার কণ্ঠস্বর রুক্ষ | আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে বিরূপ দৃষ্টিতে, যেন আবির তার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছে | আবিরের এসব গা-সহা | তার এসব ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথা নেই |

'কদমখালীর কাছে জায়গাটা ভাল নয় | দিনদিন অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে |'

'কে বলল তোমায়? আমিও এলাকার মেয়ে, সবাই আমার বাবাকে চেনে | আমি ঘরে বসে থাকার মতো মেয়ে নই | তোমার কি খেয়েদেয়ে কাজ নেই, পরের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাও?'

আবির কোনো প্রতিবাদ করে না | এ মেয়েটা তার বোনের চাইতেও ছোট | ভবিষ্যতে হয়তো তাদের পরিবারের একজন হবে | মোহিনীর রুক্ষ মেজাজকে গুরুত্ব না দিয়ে তার পড়ার দিনগুলোতে সে কদমখালীর বড় তেঁতুল গাছগুলোর আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে |

ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যায় হঠাৎ ঝুপ করে আলো পড়ে আসে | বেশ কিছু দূরে রাস্তার বাঁদিকে চার-পাঁচ জনের একটি জটলা | কলকেতে গাঁজা চলছে, মৃদু গন্ধ ভেসে আসে | আর একটু অন্ধকার হলেই হয়তো সুযোগ নেবে | এখনো অবশ্য রাস্তায় লোক চলাচল করছে | হঠাৎ রাস্তায় সাইকেল পড়ার শব্দ আর মেয়েকণ্ঠের ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসে | আবির একটা মোটা কচার ডাল ভেঙে সন্তর্পণে এগোয় | মোহিনীর চিৎকার কানে আসে, 'আমার সাইকেল কেন ফেলে দিলি? আমার বাবাকে চিনিস? টিটকারি বা দু'একটি ইতর শব্দও কানে আসে | এদের উদ্দেশ্য সাইকেল না অন্যকিছু সে ভাবার সময় নেই তার, সে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো ঝোপঝাড় ভেঙে এগিয়ে যায় এবং এক নিমেষে অকুস্থলে পৌঁছে বেপরোয়াভাবে লাঠি চালিয়ে এদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় | হঠাৎ এরকম অবস্থার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না | পরে এরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আবিরকে ঘিরে ফেলে | এক অসম লড়াই শুরু হয় | বৃত্তটা ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকে | আর তখনই ভিমপুরের দিক থেকে সাইকেলে তিন চারজনের একটি দল এসে রোহিনীকে দেখেই চিৎকার করে ওঠে এবং দুষ্কৃতকারীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালায় | যাবার আগে তারা অবশ্য শাসিয়ে যায় আবিরকে |

দু'একটা ঘুষি খেয়েছে মুখে, নিচের ঠোঁট কেটে গেছে কপাল ফুলে গেছে আধখানা চাঁদের মতো | মোহিনী এতক্ষণে ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে | আবির যখন ওর সাইকেলটা তুলে ওর হাতে ধরিয়ে দেয় তখন দেখে ওর হাত কাঁপছে | আবির বলে, তুমি বাড়ি যাও আমি পিছনে আছি | আবিরের ফোলা ফাটা মুখ দেখে মোহিনীর চোখে জল আসে | অনেকটা হেঁটে তারপর সাইকেলে ওঠে সে |

ব্যাপারটা একদম জানাজানি হয়নি কেননা দুজনেই বাড়িতে কিছু জানায়নি | পরের সপ্তাহে আবির দেখে দুপুরবেলা বাস ধরার জন্য মোহিনী দাঁড়িয়ে আছে | সে নিশ্চিন্ত হয়, একটা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল | ঘটনা কিন্তু ভিতরে ভিতরে গড়িয়েছে অনেক দূর | আয়নাল শেখ হ'ল ব্যবসায়ী ফকির হোসেনের বাঁধা মুটে | তবে অন্য কথাও বলে লোকে | আয়নাল শেখের নাকি অন্ধকারের কাজ কারবার আছে | যদিও আয়নাল শেখের চেহারা দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার ভিলেনদের হার মানায় তবুও আবিরের কখনো মনে হয়নি আয়নাল চাচা খারাপ মানুষ হতে পারে | সে একদিন আবিরকে ডেকে বলে, 'ভাইপো, জটা বাগদির ছেলিদের সঙ্গে কি হয়েল?'

'কোথায়?'

'কেন, কদমখালীতে? শুনলাম একাই লড়েছিস পাঁচজনের সঙ্গে | সাবাস ব্যাটা এই তো মরদের মতো কাজ | মা বুনের ইজ্জত আগে, তাতে জেবন যায় যাক | তবে জটা রেগিছে খুব | বলিচে জগা সাহার ছেলির বাড় বেড়িচে, ড্যানা দুখ্যান কুচ করি কেটি নিলিই গল্প শেষ |'

'কেন জগা সাহার ছেলে কি চুড়ি পরে বসে আছে নাকি? ডানা ছাঁটবে, দেখি সেই বা কেমন বাপের ব্যাটা |' আবির গজরায় |

'আরে না ভাইপো, তা না তবে সাবধানে থাকিস লোক তো ভাল না এরা, মানুষ মারতে এদের হাত কাঁপে না | তবে দরকার হলে বলিস তোর চাচা আছে তোর সাথে, আর পিটুলিতলার পুরো দল |'

৩

এই রাস্তা বরাবর চোদ্দ-পনের কিলোমিটার দূরে

বাংলাদেশ বর্ডার | বানপুর বর্ডার দিয়ে অবাধে গরুপাচার চলে | থানা, পুলিশ, দাদা-নেতা-হাতা, বি এস এফ – এদের দিয়ে থুয়ে ব্যবসা চলে রমরমিয়ে | যারা এসব করে তাদের ক্ষমতা অনেক, হাত বহু লম্বা | জটা বাগদির ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোভও বাড়ে | ডাকাতগাড়ির মাঠের কাছে তার দল তোলা তোলে গরুপাচারের গাড়ি থেকে | আবার কখনো লোভে পড়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ছিনতাই করে | বিধায়কবাবু নিজেও একসময় এদের মতোই ছিলেন | তার মদতে এদের বাড় বাড়লেও বাবারও বাবা আছে | একদিন এলাকার ছেলেরা এদেরকে ধরে উদুম পেটায় | রাস্তায় দাঁড়িয়ে যায় গরুপাচারের গাড়িগুলো | পুলিশ সাধারণ মানুষের চাপে গাড়ি ধরতে বাধ্য হয় | মানুষকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে বিধায়কের নির্দেশে জটা বাগদি গা ঢাকা দেয় দলবল সমেত | তাকে আর এলাকায় দেখা যায় না |

অনেকদিন পর এলাকা শান্ত কিন্তু গরু পাচারের বিরাম নেই | একে একে শীত বসন্ত শেষ হয় | রথের দিন কাঁটাযাত্রা হয় মোকামে | গদিতে গদিতে কাঁটা বাটখারা পুজো আর খাওয়া দাওয়া চলে | আবির তাদের কাঁটা বাটখারা ধুয়ে পুজোর যোগাড়যন্ত্র করে | এখন তাদের নামেই ব্যবসা, পুঁজি নেই তো ব্যবসা কী? নিজেদের গোডাউন নিশীথ কুন্ডুকে ভাড়া দেওয়া হ'ল | নিশীথ কুন্ডু রাঘব বোয়াল, এলাকায় তার মতো কেউ নেই | এদিকে সঞ্জয় সোনালীর পড়ার খরচ চালাবার জন্য আরো একবিঘা জমি বিক্রির কথা চলছে | এরকম চলতে থাকলে বোনটার পড়াও বন্ধ হয়ে যাবে এমনকি খাওয়া জুটবে কিনা কে জানে | দাদাকে টাকা দিতে গিয়ে দেখে দিন দিন তার চেহারা খারাপ হচ্ছে, পড়ার চাপে আর রাত জাগায় চোখের নিচে কালি পড়েছে | দেওয়া টাকায় খুব কষ্ট করেই দাদাকে চালাতে হয় | হস্টেল থেকে দুবেলা খাবার দেয়, হয়তো পয়সার অভাবে জলখাবারই খায় না | বোনটা দু'তিনটে সুতির শাড়ি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরে | সেদিন মায়ের কাছে গজগজ করছিল যে প্রাইভেট স্যারের কাছে দুমাসের বেতন বাকি, তাই পড়তে যেতে চাইছিল না |

আবির শুধু আগ বাড়িয়ে বলেছে, 'কেন পড়তে যাবি না?'

'কেন, তোর জেনে কী হবে? সংসারের কোন কাজে লাগিস যে নিকেশ নিচ্ছিস?' বোনটি মারমুখী, সুন্দরী মেয়েটিকে কুৎসিত লাগে | অনেকদিন খেয়াল করেনি আবির | অভাব, হতাশা আর পরিশ্রমে সোনালীর চেহারা হয়েছে মলিন | সে বোনের কথায় রাগ করে না, কিন্তু তার মধ্যে এক অসহায়তা তৈরি হয় | কিন্তু তাদের শান্ত মা সেদিন রেগে যান |

'কিল্লাই, ছোট হইয়া বড় ভাইরে যা নয় তা কইছিস?'

'বেশ করেছি | তোমার গুণধর ছেলের জন্য মুখ দেখাতে পারি না | পিটুলিতলায় মুটে মজুরদের সঙ্গে আড্ডা | এখানে ওখানে গুন্ডামি মাস্তানি করে বেড়াচ্ছে | তোমরা না জানলেও আমার কানে সব আসে |'

মা আবার শুরু করলে আবির বেরিয়ে এসেছিল, 'ধুর, এদের কথায় কান দিয়ে কী হবে?'

কাঁটা বাটখারা ধুতে ধুতে এসব কথা ভাবছিল আবির | এখন সামান্য কিছু বাচপাট উঠছে | একমাস পরেই বাজার সরগরম | আশেপাশের প্রায় একশটি গ্রাম নিয়ে এই ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে | আশেপাশে নদী আর বিল থাকায় পাট হয় খুবই উন্নত মানের | জে সি আই ছাড়া অন্য মিল-মালিকেরা পাট কিনতে আসে | কিন্তু এতে তাদের কী! তার এখনই কিছু করার দরকার | অন্য গদিঘরে কাজ নিতে পারে কিন্তু মুটেমজুরের কাজ নিলে পারিবারিক সম্মান নষ্ট হবে | এক ছেলে ডাক্তারি পড়ছে আবার বড়লোক বৃন্দাবন সাহার সঙ্গে ভবিষ্যৎ কুটুম্বিতার সম্পর্ক | এসব কারণে গদিঘরে কাজ নেওয়া যাবে না | তাই বারবার জে সি আই-এর ম্যানেজারের কাছে তদ্বির করে, কিন্তু তার কিছু করার নেই, লোক নিলে সুপারিশ করতে পারে মাত্র |

সুযোগ একটা আসে অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে | বছর দশেক হ'ল বাংলাদেশ থেকে এসেছে নিশীথ কুন্ডু | বিশাল অর্থের মালিক, বোয়ালমাছের মতো গিলে নিচ্ছে সব | তিনি একদিন আবিরকে ডেকে বললেন, 'আবিরা, রাইতগা বাড়িপরে যাস কামের কতা আছে |'

আবির ভেবে পায় না এই লোকের কী কাজের কথা থাকতে পারে তার সঙ্গে | অদম্য কৌতূহলের কারণে সন্ধ্যা হতেই আবির হাজির হয় নিশীথ কুন্ডুর গদিঘরে | লোকজন চলে গেলে সব তালাটালা দিয়ে আবিরকে উপরে ডাকে | এ বাড়িতে আবির কখনো আসেনি, তার কেমন অস্বস্তি লাগে | উপরের একটি ফাঁকা ঘরে দুজনে বসে | আবিরের চোখে চোখ

রেখে বলে, 'বেটা সাবাসী বিশবাসী হোলা খুজতাছি, তোকে মুই হছন্দ করছি।'
আবির চুপচাপ, ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে।
নিশীথ কুন্ডু একটু চুপ থেকে বলে, 'রোখা ভাংতির কাম করবানি?'
রোখা কী, তা এই অঞ্চলের সবাই জানে। পাটের মিলগুলো থেকে যখন পাট কিনতে আসে তখন বেয়ারার চেকের মতো একটি কাগজ দেয়। তাতে অর্থের পরিমাণ আর ক্রেতার স্বাক্ষর থাকে। সঙ্গে একটা দশ বা পাঁচ টাকার নোট গাঁথা থাকে যার নম্বরটাই প্রমাণ। কলকাতার গদিঘরে জমা দিলেই ক্যাশটাকা দিয়ে দেবে। রোখা ভাঙানো বড়ই ঝঞ্ঝাটের কাজ। ভরা মরসুমে সর্বদা নগদ অর্থের দরকার কেননা চাষীদের কাছ থেকে নগদে মাল কিনতে হয়। প্রতিদিন কলকাতা গেলে ব্যবসা ঠেকানো সম্ভব নয়। আবার নগদ টাকা নিয়ে যাতায়াতের ঝামেলা আছে। তাই মালিকের চতুর, বুদ্ধিমান এবং বিশ্বাসী কর্মচারীরা এই কাজ করে থাকে কেননা তাদের প্রাণের দাম কম। নিশীথ কুন্ডুর ছেলেটি ব্যক্তিত্বহীন, বাপের ছায়ায় মানুষ। নিশীথ কুন্ডু বছর দশেক এসেছে, ১৯৭৪ সাল নাগাদ। টাকার কুমির এবং দুঁদে ব্যবসাদার। অসম্ভব চতুর, অমায়িক, কখনই রাগতে দেখেনি আবির। এমন মানুষটি আবিরের মধ্যে কী দেখেছে কে জানে। আবির মনে মনে হিসেব কষে। বাড়ির যা অবস্থা তাতে দাদার পড়া পর্যন্ত জমি অবশিষ্ট থাকবে বলে মনে হয় না। বোনের পড়া হয়তো মাঝরাস্তায় বন্ধ হয়ে যাবে। দাদা আরো বেশি পড়তে চাইলে বৃন্দাবন সাহার কাছে হাত পাততে হবে। পারিবারিক সম্মান বলে কিছুই থাকবে না। বাড়ির সবার মুখগুলো তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার মধ্যে এক হিসেবি আবির জেগে ওঠে। 'আমার রেট কত?'
'শ টেহায় অষ্ট আনা।'
'জ্যাঠামশাই শ'টাকায় একটাকা করুন।'
অবশেষে দর কষাকষি করে শ'টাকায় বারো আনা স্থির হয়।
ব্যাপারটা থাকবে অত্যন্ত গোপন। রোখা এবং টাকার লেনদেন হবে অতি গোপনে। আরো অনেক সাবধানবাণী সে চুপ করে শোনে। অবশেষে কুণ্ডুবাবুর নীল একটি গেজে আর কুড়ি হাজার টাকার একটি রোখা আবিরের হাতে দিয়ে মাড়ওয়ারী গদিঘরের ঠিকানা এবং যাবার পথ বাতলে দেয়। সবচেয়ে বড় এক'শ টাকার নোট তাই কুড়ি হাজার টাকা আনতে কোনো অসুবিধে হবে না, কিন্তু বেশি হলে তাকে সাবধান হতে হবে। সারারাত ঘুম হয় না তার। ভোরবেলা ঠাকুমা আর মাকে বলে বেরিয়ে যায় সে। কলকাতা তার চেনা হলেও তার দৌড় দাদার হস্টেল পর্যন্ত। তাই একটু বাধো বাধো ঠেকে, অথচ মোট ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ। রোখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে টাকা পেয়ে যায়।

বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখে বাবা বাড়ির সামনে বকুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে। প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারায় ডান পায়ের চপ্পলটা জগবন্ধু সাহার ডানহাতে উঠে আসে। আশে-পাশের মানুষজন সাহাবাবুকে সামলায়। ঠাকুমা এসে ছেলেকে গালাগাল দিয়ে নাতিকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যায়। বোনের মুখ আষাঢ়ের মেঘ, মায়েরও।
বেশ রাত হলে আবির চুপিচুপি ঢোকে নিশীথ কুন্ডুর বাড়িতে। বিকেলের ঘটনা নিশ্চয় এই লোকের কানে এসে পৌঁছেছে। তার হাতে দুটো এক'শ টাকার নোট দিয়ে বলে, 'বাইত যা অন, হরে খবর দিয়াম।'
'জ্যাঠামশাই, বাকি পঞ্চাশ টাকা ভাঙিয়ে দিয়ে যাব।'
মানুষটির মুখে অমায়িক হাসি, 'তর রেটই থাউক।'
গভীর রাতে ঠাকুমার পাশে শুয়ে আছে আবির। বিকেলের ঘটনায় তার পিঠে ব্যথা থাকলেও মনে দুঃখ নেই। কীভাবে টাকাটা সংসারে দেওয়া যায় সেটাই তার ভাবনা। হঠাৎ ঠাকুমা উঠে বসেন, 'হেই শতান হারাদিন কোনাই আছিলি?'
আবির চুপ।
'তুই যেন কস তোর বন্ধু ওগকাই, এই বুড়ি ইজ্জা।'
আবির ধীরে ধীরে সব কথা বলে ঠাকুমাকে। তার পিঠে বুলানো হাতটা থেমে গিয়ে কাঁপতে থাকে। আবির বকে ওঠে, 'এর মধ্যে কান্নাকাটির কী হ'ল? ঘুমোও বুড়ি, আর ঘুমোতে দাও।

৪

সাবধানের মার নেই তাই সে পরদিন ভিমপুর বাজার থেকে টাকা ভাঙায় তারপর বোন কলেজে বেরিয়ে গেলে মা'র হাতে টাকাটা দিয়ে বলে, 'মা এটা আমার সৎপথে আয়ের টাকা, সময়ে সব বলব তোমাকে, এখন জিজ্ঞেস করো না। সোনালীর স্যারের দু'মাসের বেতন দিও আর খুব সাবধানে

খরচ করো যাতে কেউ টের না পায় | মায়ের চোখের কোণ ভিজে ওঠে | জল টুপোবার আগেই আবির বলে, 'মটরডালের চাপড়ি দিয়ে লাউডাঁটা রান্না করোনি কতদিন | দেখি বাজারে লাউশাক পাই কিনা |'

এরপর মাঝে মধ্যেই আবিরকে কলকাতা ছুটতে হয় | একই রাস্তায় কখনো পরপর দুদিন যায় না পারতপক্ষে | কখনো কৃষ্ণনগর দিয়ে বা মাজদিয়া দিয়ে রেলপথে | কখনো বাসে ফেরে, আবার কখনো বা শান্তিপুর লোকাল থেকে নেমে বাস ধরে | মাঝে মধ্যে কুণ্ডুবাবু তাকে দু'তিনটে রোখা দেয়, অন্য লোকের হতে পারে কিন্তু আবির কখনো অহেতুক কৌতূহল দেখায়নি | ঠাকুমার ভাঙা তোরঙ্গের কাঁথা কাপড়ের নীচে সে টাকা জমায়, মাকে কিছু টাকা দিয়ে |

এদিকে টাকার অভাবে ব্যবসা শেষ | এখন জমি বিক্রি বন্ধ করতে হবে | একদিন সে সাহস করে দাদার হস্টেলে রওনা দেয় | দাদাকে টাকা দিয়ে বলে, 'তোকে আর বাড়ি যেতে হবে না, আমিই এসে টাকা দিয়ে যাব | দাদা ওকে ক্যান্টিনে নিয়ে যায় | বাড়ির খবর জিজ্ঞেস করে তারপর একটু চুপ থেকে বলে, 'মোহিনী আমায় চিঠি দিয়েছে, আমি সব শুনেছি |' আবির চুপ থাকে | ফেরার সময় দাদা ওর চুলটা এলোমেলো করে দিয়ে বলে, 'বাড়ির সবাই তোকে দূরছাই করেই গেল আর তুই আমার ভাই বলে গর্ব হচ্ছে |'

দাদা এরকম কথা কোনোদিন বলেনি | অকারণে চোখ কেন ঝাপসা হয় | পিছন ফিরে দেখে দাদা হস্টেলের গেটে দাঁড়িয়ে আছে তার চলার পথের দিকে চেয়ে |

বাড়ি ফিরে বাবাকে বলে, 'দাদার হস্টেলে গেছিলাম, দাদা একটা স্কলারশিপ পেয়েছে | আর কোনও টাকা পাঠাতে বারণ করল | তবে পড়ার খুব চাপ, ঘন ঘন বাড়ি আসতে পারবে না |

সাহাবাবুর বুক থেকে পাথর নেমে যায় | অবির ভেবেছিল বাবা কলকাতা যাবার কারণ জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু চাপমুক্ত হওয়ায় জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছে |

খেতে বসে মা জিজ্ঞেস করে, 'দাদারে ট্যাহা দিয়া আইলি?'

আবির মাথা নাড়ে | মা ধীরে ধীরে সব জেনেছে |

'কত্তদিন আর ঢাইক্যা রাখবি?'

'আর কিছুদিন মা | দাদার পড়া শেষ হোক আর সোনালীর বিয়ের জন্যও কিছু টাকা রাখতে হবে |'

'সোনালীর বিয়া?' মা আকাশ থেকে পড়েন |

'আরে, দিতে তো হবে একদিন | সোনালী চাকরি করলেও তো বিয়ে দিতে হবে |'

এমন সময় সোনালী ঘরে ঢুকতেই আবির থেমে যায় | বোনের শাড়িটা মলিন | সে বলে, 'একটা শাড়ি কিনতে পরিস না?'

সোনালী থেমে যায়, তার ঘাড় শক্ত | 'কেন তুই দিবি নাকি? মুরোদ আছে?'

আবির চুপ করে যায় |

সোনালী তখনো থামেনি | 'কী করে সামনে ভাতের থালা আসে জানিস সেটা? সারাদিন তো পিটুলিতলায় মুটে মজুর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা |'

মা কিছু বলতে যাচ্ছিল, আবির থামিয়ে দেয় | মা বেফাঁস কিছু বলে ফেললেই মুশকিল |

আবির অনেকদিন পর পিটুলিতলার ঠেকে যায় | এই সহজ সরল অন্দর-বাহারহীন মানুষগুলোর কাছে সে নিজেকে মেলে ধরতে পারে | সে চপ মুড়ির অর্ডার দেয় | সুকলাল শেখ বলে, 'নটারী পালি নাকি ভাই?' আবির হাসে | একদিন এদের ভালমন্দ খাওয়াতে মন চায় কিন্তু সে নাচার |

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবিরের সাহস বাড়ে, এমনকি লাখ টাকাও আনে কোনো কোনো দিন | তার একদিনের আয় একজন সরকারী চাকুরের একমাসের আয়ের সমান | এখনো দু'মাস কেনাবেচা চলবে তারপর সুযোগ বুঝে বাজার দেখে মাল স্টক করবে না হয় গোডাউন খালি করে বেচে দেবে | পুরো সিজেন কাজ করলে ছোটখাট ব্যবসা করার একটা পুঁজি হয়ে যাবে | যদিও নিশীথ কুন্ডু বোধহয় তাকে খুব পছন্দ করে তবুও এই কাজ বেশিদিন করা যাবে না | তার চালচলনের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে | দু'একজন বোধহয় কিছু আন্দাজ করতে পেরেছে | রাম সাহার ভাই বলাইয়ের সঙ্গে একদিন কলকাতার বড়বাজারে দেখা হয়েছিল | দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি বলে কাটিয়ে দিলেও লোকটা তার কথা বিশ্বাস করেনি |

৫

পৌষের শেষ, জব্বর শীত জানান দিচ্ছে | আজ পেমেন্ট নিতে দেরি হয়ে গেল | কোমরের নীল গেজেতে আশি হাজার টাকা | হাফহাতা ঢোলা সোয়েটারের জন্য ফোলা বোঝা যায় না | তার উপর পুরনো একটা শাল জড়ানো |

তিনটের সময় শেয়ালদা থেকে নৈহাটি লোকালে উঠে ব্যারাকপুরে নেমে পড়ে। পিছনে রানাঘাট লোকাল আসছে। এই ট্রেনে উঠেই বিপত্তি, চাকদা ঢোকার আগেই ট্রেন থেমে গেল। ওভারহেডে কারেন্ট নেই। ট্রেনের মধ্যে আধো অন্ধকার। প্রায় পঞ্চাশ মিনিট পর ট্রেন চলতে শুরু করে ঢিমে তালে, আর রানাঘাট পৌঁছাতে আরো চল্লিশ মিনিট সময় নেয়। আবির ভেবেছিল পরের গেদে লোকালে উঠে মাজদিয়া থেকে বাস ধরবে কিন্তু সেটাও ঢোকে আধঘন্টা দেরিতে। এখনো যা সময় আছে তাতে মাজদিয়া থেকে লাস্ট বাসটা পেয়ে যেতে পারে কিন্তু ট্রেন লেট করলে বিপদ। অগত্যা ভাগীরথী এক্সপ্রেস ধরে কৃষ্ণনগরে নামে সাড়ে আটটায়। শীতের রাত এরই মধ্যে স্টেশন শূনশান। সে ন'টা কুড়ির লাস্ট বাসটা ধরার জন্য ঢিমেতালের এক রিকশা করে যখন বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছায় তখনও বাস ছাড়তে মিনিট দশেক বাকি। এতক্ষণে খিদে পেয়েছে কিন্তু নামতে ইচ্ছে করে না।

বাসে গোটাদশেক লোক, সবাই ছানা দিয়ে বাড়ি ফিরছে। গল্পগাছা করছে সামনের দিকে বসে। আবির পিছন দিকে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে, কিন্তু চাদরের ফাঁক দিয়ে সব দেখে। বাস ছাড়ার আগে আরো কিছু লোক ওঠে কিন্তু প্রায় সবাই গোবরাপোতা আর কুলগাছিতে নেমে যায়। বাসের ভাঙা দরজা দিয়ে হু হু করে বাতাস আসছে। হঠাৎ কুলগাছি পার করার পর কালভার্টের কাছে বাস থামে। তিনজন লোক উঠে আসে সামনের গেট দিয়ে। চাদর আর মাফলারে মুখ ঢাকা। আবির কিছুক্ষণ তার চাদরের মধ্যে থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাদের শরীরী ভাষা বোঝার চেষ্টা করে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে তাকে বোধহয় কিছু ইঙ্গিত দেয়। সে বাসের পিছনের দরজার কাছে এসে বাসের পিছনের লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে যায়। চারদিক কুয়াশায় ঢাকা, শুক্লপক্ষের মরা চাঁদের আলোয় মনে হয় এই বাস ছাড়া সারা পৃথিবী অনড়, স্থবির, নিষ্প্রাণ। সে বাসের সামনের দিকে এগিয়ে আসে তারপর একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এক দেড় মিনিটের মধ্যে বাসের পিছনের দিকে একটা মাথা দেখতে পায়। লোকটি উঠে একটি কাঠবেড়ালির মতো এগিয়ে আসে। হিস হিস করে সাপের মতো গজরায়, 'মাংমারানীর ছেলে, খুব তেল হয়েছে তোর, আজ তোর তেল ভাঙছি, আর তারপর সেই খানকি মাগী মোহিনীকে দেখছি কতো গরম হয়েছে তার।'

মোহিনীর নাম কানে আসতেই আবির ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো এগিয়ে গিয়ে মাথা দিয়ে লোকটির বুকে এমন ধাক্কা দেয় যে তাল সামলাতে না পেরে লোকটা সোজা নিচে গিয়ে পড়ে। ধুপ করে শব্দ হয় কিন্তু একে বাসের দরজা জানালা বন্ধ আবার লড়ঝড়ে বাসের ঝনঝনানিতে বোধহয় ভিতরের কেউ শুনতে পায় না। ততক্ষণে দ্বিতীয়জন উঠে এসেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সে থমকে গেছে। আবির এই সুযোগটা হাতছাড়া করে না। লোকটা সোজা হবার আগেই সে ঘুষি চালায়, কিন্তু বাসের দোলানিতে লোকটার মুখে না লেগে কাঁধের একপাশে লাগে। আকাশের মরা জ্যোৎস্না আর বাসের হেডলাইটের পিছনের দিকে আসা আবছা আলোয় লোকটাকে চেনা মনে হয়। টাল সামলাতে না পেরে আবিরও পড়ে যায়। দুজনের ধস্তাধস্তি হতে থাকে। আবির একটু পিছনে সরে এসে উঠে দাঁড়ায়। গলার কাছটা ছড়ে গেছে বোধহয়, জ্বালা করে। লোকটি এগিয়ে এসে গজরায়, 'খানকির ছেলে তোর মাকে...' তার কথা শেষ হবার আগেই "আঁক" করে একটা শব্দ হয়। আবিরের ডান পায়ের লাথি এসে তার তলপেটে লাগে, আর সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বাসের ছাদ থেকে সোজা নয়ানজুলিতে ছিটকে পড়ে। আবির আর একটু অপেক্ষা করে। বাসে কমপক্ষে আরো একজন আছে। ছানাওয়ালাদের মধ্যেও ওদের লোক থাকতে পারে। ঝাউতলায় বাসটা একটু ধীর হয়, তারপর চলতে শুরু করে। পিছনের দিক দিয়ে লোক ওঠার সম্ভাবনা এক'শ শতাংশ তাই আবির বাঁদরের মতো দোল খেয়ে সামনের দিক দিয়ে ঢোকে। ভিতরের ছানাওয়ালারা পাথরের মতো চুপচাপ। তৃতীয় লোকটি এখন পিছনের দিকে। ছিপছিপে কালো একহারা চেহারা, হাতদুটো আশ্চর্য রকম লম্বা, প্রায় হাঁটুছোঁয়া। মুখটা হাসিহাসি, চোখদুটো স্থির, বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। আবিরের কেমন অস্বস্তি হয় এই প্রথম। জটা বাগদিকে বহুদিন আগে দেখলেও চেহারাটা মনে আছে তার।

'এই যে আবির বাপধন, নিশীথ কুন্ডুর থেনেদ্দার। গেজেটা খুলে দাও বাপ। ডালে ডালে চললেও ধরা দিয়েছ। খুব বেগ দিয়েছ বাপ আমাদের।'

আবির এক লহমায় একটা ছানার খালি ড্রাম তুলে নেয়। দুই

সিটের মাঝখানে খালি একটা প্যাসেজ, সে বাঁদিকে হেলে শরীরটা আড়াল করে তারপর ডানদিকে ড্রামটা নিয়ে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ে | লোকটি পিছনের দিকে হেলে গিয়ে সামলে নেয় মার্শাল আর্টিস্টের মতো | 'তবে রে, খানকির বাচ্চা, গোখরোর ড্যাপ, এত তেজ তোর?' এই বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা সরু লিকলিকে ছুরি তার ডানহাতে উঠে আসে | আবির বাঁদিকে হেলে গিয়ে শরীর আড়াল করে | লোকটি ডানহাতে সুবিধা করতে পারবে না বলে ছুরিটা বাঁ হাতে নেয় | আবির শুনেছে এর দুই হাতই সমান চলে | সে ড্রাম দিয়ে তার ডানদিকটা আড়াল করে | লোকটার ডান পায়ের লাথিতে ড্রামটা ছিটকে যায় | আবির ওর মুখ লক্ষ্য করে ডানহাত চালায় লোকটা চকিতে মাথা নামিয়ে নেয় আর তার বাঁহাতটা আবিরের পেট বরাবর নেমে আসে, পরপর দুবার |

আবিরের পেটের দিকটা শিরশির করে | সোয়েটার ভেদ করে গরম রক্ত ছিটকে আসে | লোকটা আবিরের কোমর থেকে টাকার গেজেটা খোলার চেষ্টা করে | আবিরকে নীচে পড়ে যেতে আর রক্তের স্রোত দেখে ছানাওয়ালারা এবার হৈ হৈ করে চিৎকার করে ওঠে | বেগতিক দেখে জটা বাগদি শিকার ছেড়ে চলন্ত বাস থেকে লাফ দিয়ে থগবগে খালের পাশ দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় |

এতক্ষণে আবিরের শীত করতে থাকে | বিকট হর্ন দিতে দিতে রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে বাস থামে আবিরের বাড়ির সামনে বকুলতলায় | আবির ডানহাত দিয়ে সোয়েটারের উপর চেপে ধরে আছে | নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে কিনা কে জানে | নিমেষের মধ্যে লোক জড়ো হয়ে যায় | তার চোখ ঝাপসা হবার আগেই নিশীথ কুন্ডুর বিরাট চেহারাটা দেখে ফ্যাসফেসে গলায় বলে, 'জ্যাঠামশাই আমার কোমরের গেজেতে আশি হাজার টাকা আছে কিছু খোয়া যায়নি |' এরপর তার আর কিছু মনে নেই |

নিশীথ কুন্ডু ঠান্ডা মাথার মানুষ | সে জগবন্ধু সাহাকে ঝাঁকিয়ে বলে, 'আমাগো হোলার কিচ্ছু হইবো না, যত্ত টেহা লাগে খরচ করবাম |' তারপর ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'গাড়ি লইয়া আয় |'

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো গাড়ি ছোটে কৃষ্ণনগরের দিকে |

৬

এরপর তিনদিন কেটে গেছে | সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন হলেও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে জ্ঞান ফেরেনি আবিরের | ডাক্তারবাবুরা সাহস না পাওয়ায় কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীকে পাঠানো হয়েছে |

পরদিন সকালেই রাস্তা অবরোধ | এম এল-এর বাড়ির সামনে প্রতিবাদ গালাগালি, বেপাত্তা জটা বাগদি আর তার সাকরেদদের বাড়ি ভাঙচুর – এইসব ঘটনা ঘটে | পুলিশ সুপার আসামিকে ধরার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিলে তারপর জনগণ শান্ত হয় | দুদিনের মধ্যে এলাকার কিছু চুনোপুঁটি ধরা পড়লেও রাঘব বোয়াল বেপাত্তা |

তৃতীয় দিনে আবিরের জ্ঞান আসে | একগাদা নল আটকানো তার শরীরে | পায়ের কাছে টুলে কে বসে! দাদার মতো মনে হয়, হ্যাঁ দাদাই তো! সে কিছু বলতে গিয়ে আবার তলিয়ে যায় ঘুমের দেশে |

এদিকে আসল সত্যটা সবাই জেনে গেছে | নিশীথবাবু কলকাতায় পড়ে আছেন | জগবন্ধু সাহার কিছু করার নেই | প্রথমদিনের পর তাকে যেতে বারণ করা হয়েছে | সঞ্জয় আর তার বন্ধুরা আছে আর ভগবান ভরসা | জগবন্ধুবাবু চোরের মতো রয়েছেন | বাড়ির দুজন মহিলার চোখে চোখ রাখতে পারছেন না | সোনালীর চোখ ফোলা, লুকিয়ে কান্নাকাটি করছে বোধহয় |

চতুর্থ দিন সকালে ঠাকুমা সোনালীকে ডেকে বলেন, 'পুরান তোরঙ্গখ্যান খুইল্যা দ্যাখ দিদি, ছ্যারা হ্যতায় কি করতাম |'

সোনালী তোরঙ্গের কাঁথা কাপড় সরিয়ে দেখে তিনটে খাম আর বেশ কিছু খুচরো টাকা | খামের উপর আবিরের জঘন্য হাতের লেখায় লেখা "দাদার পড়া", "বোনের পড়া", "বোনের বিয়ে"; ভিতরে সব এক'শ টাকার নোট | সব মিলিয়ে হাজার বিশেক হবে | সে নিমেষে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ডুকরে কেঁদে ওঠে | তার কান্নার আওয়াজ পেয়ে সবাই ঘরে ছুটে আসে | সব দেখে জগবন্ধু সাহা শিশুর মতো কেঁদে ওঠে | অন্য মহিলা দুজন অবশ্য খুব শান্ত | জগবন্ধুবাবু নিজেকে সামলে নিলেও মেয়েটি কাঁদতেই থাকে | একটু পরে সোনালী বাবার কাছে গিয়ে বলে, 'কলকাতা যাব |' বাবা ইতস্তত করে বলে, 'কাল সকালে যাবানি |'

কিছুক্ষণ পর সোনালী রেডি হয়ে বাবাকে বলে, আমি দাদার হস্টেল চিনি, তোমার অসুবিধা থাকলে আমি ঠাকুমাকে নিয়ে যাচ্ছি | আর এর মিনিট পনেরো পর দেখা যায় মা আর মেয়ের সঙ্গে তিনিও বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়ে |

আবিরের অবস্থা স্থিতিশীল হলেও বাড়ির মানুষ দেখে উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে, তাই দূর থেকে তাকে দেখেই ফিরে আসতে হয় | ফেরার সময় মেয়েটি সারারাস্তা কাঁদতে কাঁদতে আসে |

ধীরে ধীরে সুস্থ হয় আবির | তাকে একটা স্পেশাল কেবিনে রাখা হয়েছে | তার কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে | উঠে হেলান দিয়ে বসে থাকতেও ক্লান্ত লাগে | জানলা দিয়ে একটা ন্যাড়া কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখা যায় | এরমধ্যে মেডিকেল কলেজ আর হাসপাতালের অনেকে আবিরের গল্প জেনে গেছে | সঞ্জয়ের ক্লাসের বন্ধুরা ছাড়াও অন্য অনেকে তার খোঁজখবর করে এমনকি অনেক স্যারেরা পর্যন্ত | ডাক্তারবাবু তাকে দেখিয়ে অন্যদের বলে, 'দেখ এই হ'ল রিয়েল হিরো |'

দাদা বেশিরভাগ সময় চুপচাপ বসে থাকে, কখনো মুখ আড়াল করে চোখ মোছে | আবির মুখ ঘুরিয়ে নেয় |

নিশীথবাবু যাবার দিন বলে গেলেন, 'আর বইয়া থাকন না ব্যাটা, ভালা হইয়া যাও কত্তো কাম হইরা আছে |'

এরমধ্যে একদিন আসে আয়নাল শেখ আর সুখলাল | সব কথা সাতকাহন করে বলার পর যাবার সময় বলে গেল, 'ঝাড়া মেরে ওঠ তো বাপ | নিশীথ কুন্ডু কি বলিচে জানিস? তোরে নাকি চার আনার পার্টনার করবি |'

সোনালী যেদিন আসে আবির তখন বেশ সুস্থ | সঙ্গে কে ও? মোহিনীকে ঢুকতে দেখে দাদা বেরিয়ে গেল | আবির ভাবে দাদা আচ্ছা লাজুক তো! মোহিনী একটা বাচ্চা মেয়ে বই তো নয়, তাদের সবার চাইতে ছোট | সোনালী তার ডানদিকে একদম কোল ঘেঁষে বসেছে, মুখে কোনো কথা নেই | একটু পরে আবিরের ডানবাহুর উপর শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়ে | আবির ডানহাত দিয়ে তার মাথাটা বুকের কাছে টেনে নেয় | চোখের জলে সাদা পোশাকের অনেকটা ভিজে গেছে | 'আরে, কথা বল তো, বুড়িটা কেমন আছে বল | সরে বস, তুই মনে হয় আমার ব্যথা জায়গাটায় আবার লাগিয়ে দিবি |'

সোনালী একচুলও সরে না, একটু পরে ভাঙা গলায় বলে, 'কবে বাড়ি যাবি? তোর সঙ্গে কত কথা জমে আছে |'

আবিরের খুব সুস্থ লাগে | এখানে আর ভাল লাগছে না |

এদিকে মোহিনীর সঙ্গে তেমন কথা হয়নি কোনোদিন, কিন্তু এখন মেয়েটি নিঃসঙ্কোচে তার বাঁবাহু ধরে বসে আছে | তার চোখ ভিজে কিন্তু গলার স্বর পরিষ্কার | সে দাদার চাইতেও মেধাবী, আবির সংকুচিত হয় | মেয়েটি বলে, 'ঠাকুমার কাছে একটি গল্প শুনেছিলাম, একটি ছোট ছেলে বনের ধার দিয়ে পাঠশালা যেতে খুব ভয় পেত | তার মা তাকে বলেছিল ভয় পেলে বনের ধারে মধুদাদাকে ডাকিস | তার হাতে বাঁশি, মাথায় ময়ূরের পাখা | ছেলেটি পরদিন মধুদাদাকে ডাকে আর তার দেখা পায় | তুমি যেদিন থেকে তেঁতুলগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে সেদিন থেকে প্রতিদিন তোমায় দেখেছি | সেদিনই এই গল্পটা আমার মনে পড়েছিল | তোমার জন্যই তো আমার এত সাহস ছিল | চলো, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে নাও; নাহলে আমাদের দেখভাল করবে কে?'

আবির ভাবে এই তার পরিবার | তার কেমন ঘুম ঘুম পায় | তার পৃথিবীটা কখনই কালো ছিল না, তবে এত আলোও ছিল না | জানলা দিয়ে ন্যাড়া কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকিয়ে দেখে কোনো কোনো ডালে সবুজের আভা | বসন্ত আসার সময় হয়ে গেল নাকি!...

প্রশ্নের ঋণ

অসিত কুমার সেন

(অসুস্থ আত্মীয়ার সাক্ষাতে)

যার শুরু আছে তার শেষ আছে একদিন,
মাঝামাঝি কিছু সাময়িক বলে ধর্তব্য,
সকালেই যেন সাড়া দিল মনে সে কথার,
যাকে লোকে বলে অমোঘ ভবিতব্য।
সেদিকে কেউই দৃষ্টি ফেরাতে চায় না,
যার আশা করে থাকে না কেউই বসে,
শনি দেবতার কৃপাদৃষ্টিটি সেরকম
অনাহূত, তবু এসে পড়ে ঠিক শেষে।
কথা বলা তোর ফুরোয়নি দেখি আজকেও –
বাড়িভরা এত ব্যস্ত লোকের মাঝে
শুনবার যত বলছি তার তিনগুণ,
দিন চলে যায় হরেক রকম কাজে।
"এখন বার্লি খাব না", "চলো মা স্নানের ঘরে"
পরিচারিকার কথা তো এড়ানো যায় না!
নিয়মমাফিক সব উত্তর দিতে দিতে
প্রশ্নগুলি ফুরিয়েও যেন ফুরোয় না।
তবু তোর মতো কর্মিষ্ঠা মেয়ের পক্ষে
সব বাধা ফেলে উঠে পড়বার চেষ্টাটা
তোর ওই হিটলারী নার্সের দৃষ্টিতে
প্রায়ই হয় দেখি ব্যর্থতার পরাকাষ্ঠা।
উঠে পড়বার ইচ্ছেটা তোর চোখেমুখে,
সম্ভব কি সেটা জীর্ণ এ দেহের পক্ষে?
কথামৃতখানা কখনও যে সামনে ধরবি,
সেটাও তো আর আসে না চোখের লক্ষ্যে।
প্রশ্নগুলির কোন উত্তরটা তোর অজানা,
তবু কি আবার চাইবি আমার কাছে?
এসব কথা তো স্মৃতিচারণের নামান্তর,
উত্তরগুলি সব তোর জানা আছে।
জানি মনে মনে গড়ে নিতে চাস চিপটিপুরের(১) দিনগুলি।
আমার গলার স্বরে আর কথার ভঙ্গীতে
ছেলেবেলাকার অকাজ করার আনন্দে,
খেলার মাতনে, সোরগোলে আর সঙ্গীতে।
এ ক'দিনে তোর কাছে থেকে যে কী বুঝলাম,
সত্যিই কী মনে হয় সেটা বলব?
এতদিনকার রোগশয্যায় শুয়ে এখনও,
এই সংসারে একা রয়ে গেলি প্রাণকেন্দ্র।
প্রথম দিনের কুশল প্রশ্নের জবাবে
বলেছিলি কিছু মনে নেই তার ঠিকানা,
শুধু দেখলাম আনন্দভাসা দুই চোখে
প্রশ্নের বান নেমে আসবার নিশানা।
কথা বলবার অবিরাম স্রোতে ভাঁটা পড়ে এল কখনও।
দুপুরের রোদ টেনে আনে হাতে শীতের অন্ধকার,
তখনও চলেছে কাজের লোকের তাড়না,
তোর কাছে ওরা উত্তরের পাওনাদার।
দূর দেশে ছিলি মনের কোঠায় আনাগোনায়,
আজ রয়ে গেল মুখখানা তোর কল্পনায়।
সংগীতের সুরে উঠেছিল ভরে কয়েকটি দিন তবুও,
গান শেষে আজ রয়ে গেল তার মূর্ছনা।
শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হ'ল না।
ঋণের দায় যে দ্বিধাভরা মনে বাজে
জগতে কি কেউ পারে দিতে তার সদুত্তর?
সান্ত্বনা তবু পাইনি প্রাণের মাঝে।

(১) বহরমপুর

ভাষা

সুজয় দত্ত

শুধু কলমের আঁকিবুকি নয়, নয়তো নিছক গলার শব্দ
ক্ষুরধার এক তরবারি সে তো, শানাতে জানলে শত্রু জব্দ
কখনো আবার কুসুমপেলব, প্রাণে রেখে যায় মধুর স্পর্শ
ক্ষণে ক্ষণে জাদুকাঠির ছোঁয়ায় জাগায় বেদনা জাগায় হর্ষ
নিভৃত মনের অনুভূতি যত তারই তুলিতে হয়ে ওঠে ছবি
সে আছে বলেই কেউ প্রতিবাদী কেউ সুবক্তা কেউ মহাকবি
তারই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে করছে মানুষ পৃথিবী শাসন
সভ্যতা আর প্রগতির পথে দৃঢ় হ'ল তার শ্রেষ্ঠ আসন
কিন্তু যখন মানবিকতার ঠুনকো মুখোশ ছিঁড়ে যায় তার
নির্মমতার নেশা জেগে ওঠে – ভাষা হয়ে ওঠে তারও হাতিয়ার
যখন মানুষ হিংস্র শ্বাপদ – মানুষেরই সাথে করেছে যুদ্ধ
মাতৃভাষার অধিকার কেড়ে করেছে তাদের কণ্ঠরুদ্ধ
ভাষার জন্য মরেছে মানুষ, ভাষার জন্য দিয়েছে রক্ত
ভাষাই আবার ছড়িয়েছে বিষ, শোষকেরও হাত করেছে শক্ত
ভাষা ডিঙিয়েছে দেশের সীমানা, ধর্মের বাধা, জাতের বড়াই
ভাষাই আবার গড়েছে প্রাচীর, জাতিতে জাতিতে এনেছে লড়াই
বৈষম্যের বুলি যে ভাষায়, তাতেই তো লেখা সাম্যের গান
মানপত্রটি পড়া হ'ল যাতে, সেই ভাষাতেই শত অপমান
বিচিত্র এক বহুরূপী – কাকে কখন কাঁদায় কখন হাসায়
ধন্য হে ভাষা – কুহকিনী তুমি, তোমার মহিমা বোঝা বড় দায়।

চতুষ্টয়

উদ্দালক ভরদ্বাজ

রূপকথা

একটি নিশ্চুপ নগরী
একটি নির্ঘুম রাত।
দূরের মাইকে গান বাজে
রাজা কি আয়েগী বারাত।

শোক

বিধুর শব্দটির কোন মানে নেই
দূর মানে তবু চলে যাওয়া
বৃষ্টির আগেই নিকনো উঠোন
তারপর কেঁপে ওঠে দাওয়া।

অশোক

একদিন ফুটে উঠত
সহজ পরশে
এখন নিবিড় প্রজ্ঞায় জাগে,
ভাবে কিছু বলারই ছিল না
তবে কেন রক্তিম পরাগে –
একদিন অনন্য কাঁপন
দুলে দিত উৎসুক বুক...
সে কি তবে আসলে অসুখ?

শান্তি

নেই সে কোথাও
শুধু তার সন্ধান আছে।
যেমন আর সবও
বিরহ, মিলন নদীর খুব কাছে...

সে

উদ্দালক ভরদ্বাজ

সে ছিল নৈঃশব্দ্যের মতো
সে আছে আগুনের ফুলকি হয়ে
নরম পদ্মের ঋণে
সে থাকুক মসৃণ অস্থিরতা হয়ে

ইচ্ছেগুলো

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়

ইচ্ছেগুলো আজও আছে
পাঁজর দাঁড়ের পাশে
নিথর নীরব চুপকথাতে,
এক আশ্চর্য বিশ্বাসে
অঙ্গীকারের শপথ ভাঙি
কোন সে আশ্বাসে!
অলস নামে একলা দুপুর
ধূসর নামে দ্বিধা
স্বপ্নচোখে কাজল লাগায়
একটা হঠাৎ দেখা
সরল সেসব আস্কারারা,
আজও আকূল ভাসায়
একটু মায়া মেঘের কোণে
তুমুল রাত্রি জাগায়
অল্প খানিক ইচ্ছেগুঁড়ো
তাইতো চোখের পাতায়
জ্বালিয়ে রাখে প্রাণের দিয়া
এক অরুণ উজ্জ্বলতায়

উত্তরণ

কমলপ্রিয়া রায়

আলোয় আলোকিত করে
এসো আমার ঘরে
সকল দুঃখ হতাশা আজ
যাক না দূরে সরে।
আলোয় ভুবন দাও না ভরে
জড়তা থাক ধুলার পরে
উজল আলো আনব ঘরে
রাজন তুমি ডাকবে মোরে।
তোমার ডাকে সাড়া দেব
তোমার বাঁশি তুলে নেব
বাজাব তায় তোমার সুরে
ভাসবে সে সুর দূর সুদূরে।
এ যে আমার পরম পাওয়া
হয় না যেন মিছে
হে মহারাজ আলোর পথে
যাব তোমার পিছে।
আমার আমি রইব নাগো
আলোয় আমি হারিয়ে যাব
আলোকস্নাত হয়ে তবেই
তোমার দয়া পাব।
এবার তবে জাগার পালা
আলোয় আজি জাগো
ঘুমের ছায়া সরিয়ে দিয়ে
নবীন হয়ে জাগো।

আর কবিতা নয়

বৈশাখী চক্কোত্তি

কবিতা লিখলে পেট ভরে না কবিতা লিখলে সমস্যা কাটে না কবিতা লিখলে হয়তো নাম কেনা যায় কবিতা লিখলে অর্থ লাভ হয় না | রাস্তার উলঙ্গ শিশু ছেঁড়া কাঁথায় চিৎকার করে জানান দেয় অস্তিত্ব শুকনো স্তনে আর ঝরে না অমৃত বোধ বুদ্ধি সব আজ শুধুই মৃত| বাসী খাবার আঁস্তাকুড়ে পাগলে কুকুরে মারামারি সেই দৃশ্যও আজ ভীষণ বিরল শূন্যতা গ্রাস করে চারিদিকে ভারি| পোয়াতি মায়ের চিকিৎসা নেই, নেই হাসপাতালে যাবার গাড়ি রাস্তায় বলি হয় সদ্যোজাত কী নিদারুণ এই মহামারী| সদ্য সুস্থকে ঘরের লোক নেয় না হাসপাতাল থেকে ফিরে রাস্তায় দিন যায় রাত আসে ফিরে শান্তির নিদ্রা কে যেন কেড়ে নেয়| পরিযায়ী শ্রমিকগুলো রেল লাইনেই চিরনিদ্রায় ঘরের লোক দিন গোনে দীর্ঘ শোকে অপেক্ষায়| কবিতা লিখলে পেট ভরে না চারিদিকে আর্তনাদ ও হাহাকার রাত শেষে নর্দমার জলে রক্তের ছিটে "এ কোন সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার"|

…ও✷ৡ…

অহল্যা

অনুপ কুমার রায়

উড়তে থাকা এলোচুলের কালচে সীমা,
গুছিয়ে ফেলাও তোমার নিজের বিষয়|
ভালবাসা দিয়ে কতবার দিলে দক্ষিণা,
বললে, বাঁচতে গেলে ভালবাসতে হয়|

তাই তো তোমার ফসল, জমিতে খনিতে,
শুকনো মাটি আর ছাই জুড়ে অপচয়,
বৃষ্টিভেজা কত কান্নার হিসেব দিতে দিতে,
বললে, বাঁচাতে গেলেও ভালবাসতে হয়|

পুরুষ দুচোখ দেখে যদিও দৃষ্টি ভাড়া খাটে,
সম্ভোগ জাবরে নিয়ত বাড়ায় তৃপ্তি সঞ্চয়|
অহল্যারা কেন যে আবেগেই আটকে থাকে,
বলে, সারা জীবন কাটাব প্রেমের অপেক্ষায়|

…ও✷ৡ…

মনসঙ্গীত ২

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

প্রেমবন্ধনে বাঁধা হ'ল যবে
প্রেমে পড়া দুটি মন,
জীবনের পথে শুরু হ'ল চলা
বোঝাবুঝি অনুক্ষণ।

বুঝতে বোঝাতে মাথা ঠোকাঠুকি
আবেগের বসে সারা,
বোঝা হয় যত, না-বোঝার সূচী
বেড়ে যায় দিশেহারা।
তবুও প্রেমের বন্ধন আরও
তীব্র হবার পণ।

নয়নের মণি, নয়নের মাঝে – নয়নের বারি ভেজা,
কভু বা খুশির, কভু বেদনার – সহজে নিলেই সোজা।

আজকে যখন ফিরে দেখি পিছে
সাতাশ হয়েছে পার,
ঘর আলো করে এল রবি-শশী
ধন্য স্নেহের ভার।
জগতের তরে রইবে মোদের
অর্জিত যত ধন।

মনসঙ্গীত ৩

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

জীবন আমার পূর্ণ আজি
মনের পাশেই বন্ধু,
দুঃখ-সুখের মাঝেই থাকি
তরছি ভবসিন্ধু।

সুখের হাসি সবাই দেখে
স্বার্থ যেথা নিয়ম,
চোখের জলের সাক্ষী যারা
বন্ধু তারাই পরম।
এমনি ক'জন মিললে সখা
তুচ্ছ অশ্রুবিন্দু।

চিত্তভরা আনন্দ মোর – কে নিবি আজ আয়রে,
মিলল ক'জন বন্ধু আমার – মনের ভিতর বাইরে।

সেই পাথেয় রইল আমার
বাকি জীবন মার্গে,
আকাঙ্ক্ষা মোর নেই কিছু আর
নেই প্রলোভন স্বর্গে।
আঁধার মাঝে রইল আমার
হয় রবি, নয় ইন্দু।

অন্তঃসারশূন্য

সুব্রত ভট্টাচার্য

যদি জানতাম কোনো এক বসন্তে এসে, হারিয়ে যাবে আর এক বসন্তে তবে কি মরীচিকার কাছে জল চাইতে যেতাম? আমি তো তোমাকে নিয়ে কিছু অলীক স্বপ্ন দিয়ে দুখের তন্তু বুনে গেলাম – তাই কি! ফুল কি আজ ভুল করে সুবাস দেব না বলে দিল! শাশ্বত স্বপ্নগুলো বিগত বছরের কতগুলো ভালবাসা কথা কয়ে হৃদয় নিংড়ে হারিয়ে গেল শরতের মেঘের মতো| আমি তো ভালবাসা শিখতে চেয়েছিলাম, করুণার দান তো চাইনি! কতগুলো শব্দ, ভালবাসা মিশিয়ে আটপৌরে জীবনে কাব্যের সাথে মিলিয়ে ছিলাম! বিগত পড়ন্ত বিকেলে, কিংবা জ্যোৎস্না প্লাবিত রাতে আবেগময় রোমান্টিক কল্পনাগুলো বড্ড মনে পড়ে তাই কি আজ, কাল বা প্রতিদিন মনের গভীরে থাকা শব্দগুলো কোনো একটা অভিমানে পোড়ায় অহর্নিশি| আমি তো তোমায় অভিসারে ডাকিনি! প্রেম-পাগল-বিলাসী মনে মহুয়ার মধু পান করিনি! মাতাল হওয়ার মতো জড়িয়ে তোমার ওষ্ঠে চুমু দিইনি! পদ্মরাগে উছলে অতলে তোমার রসসুধায় আমার নির্যাস ফেলিনি! পার্থিব জগতে যা কিছু তোমার শরীরে আছে সেগুলোর অধিকার নেব বলে মন্দ তো হইনি! তোমাকে স্পর্শ না তোমার প্রেমের আলিঙ্গনে ভাব বিভোরে থেকেছি – আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমিক হব বলে নিজেকে শুধুই তৈরি করেছি – আমি জগৎ শ্রেষ্ঠ প্রেম উপহার দেব বলে আমার শ্রেষ্ঠ কবিতাটি লিখেছি – আমার আজ জন্মকান্নার পবিত্র অভিলাষ মৃত্যুর আবর্তের ধূমলে| আমি চাইনি এই মহা পৃথিবীকে, চেয়েছিলাম মোল্লারের বাঁশি শুনিয়ে সমুদ্র সফেনে তোমায় নিয়ে মিশে যেতে| চেয়েছিলাম পল-গুনটির ধাঁচে এক্কা, দোক্কা করে শত বছর ধরে তোমায় নিয়ে বাঁচতে| আজ মনের সব কান্নাগুলো ফল্গুতে জমা রেখে রাতভাঙা চাঁদে আলোর ঘরে আলো নিভিয়ে অতল গভীরে – গোবি মরুভূমির তপ্ত বালির নিচে মিশে গেল একটা স্বপ্ন|

…☙✷❧…

কালো

শ্রাবণী রায় আকিলা

অরুণাদি কালো মেয়ে| শীতে ফুল ফোটাত,
বৈশাখী ঝড় এলে ছাদে মেলা শাড়ি গোটাত|
ছাদে আমি ঘুড়ি ওড়াতাম, সে কাটা পড়া ঠেকাত,
বর্ষার বিকেলে আকাশের রামধনু দেখাত|
আমরা ঝুলন করি, অরুণাদি সাজায় শ্যাম-রাইকে,
কখনও পাড়ায় ঘুরি, পেছনে বসি, সে চালক বাইকের|
অরুণাদি খুব কালো, আঁচলেতে ঢাকে গা
আর ছাদে ওঠে বারবার,
ছাদ তো ফাঁকাই থাকে,
তবু যেন কাকে খোঁজে চুপিচুপি চোখ তার|
শুনি অরুণাদি কালোধোলো, বিয়ে নাকি হবে না!
না হোক| ফুল ফুটুক এপাড়ায়, বেপাড়ার টবে না|
তবু একদিন বিয়ে ঠিক, দরদামে শেষমেশ ষাট হাজার ধার্য|
রামধনু, ঘুড়ি, ফুল সরিয়ে সেই ছাদে সুসম্পন্ন শুভকার্য|
অরুণাদি চলে গেল, বলে গেল,
"পারবি তো বানাতে একা একা মাঞ্জা?"
অরুণাদি জানল না, ঘুড়ি নয়,
আজ আকাশ মুখর হয় কালোদেরই পাঞ্জায়|

…☙✷❧…

প্রেমিকা

শ্রাবণী রায় আকিলা

তোমাকে ভালবেসে আমি ছুটেছি ভরা সংসার ফেলে
বৃষ্টি আর বদনাম মাথায় নীল যমুনার পারে!
তুমি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছ...
আমি বেরিয়ে এসেছি এক বস্ত্রে! প্রহরী এড়িয়ে
তোমার সঙ্গে রাতের অন্ধকারে গিয়েছি মিলিয়ে...
পিছনে রেখে এসেছি নিশ্চিত আরামের জীবন অবহেলে!
তোমাকে ভালবেসে আমি পরোয়া করিনি রক্তচক্ষু,
হুমকি প্রাণনাশের,
ত্যাগ করেছি ব্রাহ্মণত্ব, ধর্ম, অস্বীকার করেছি সমাজ,
ভুলেছি সিংহাসন, রাজ্যপাট...
নামিয়ে রেখেছি রাজকুমারীর মুকুট,
প্রাসাদ ছেড়ে নেমেছি পথে,
জীবনসঙ্গী হয়েছি তোমার দীর্ঘ বনবাসের!

তোমাকে ভালবেসে আমি আমৃত্যু
স্বেচ্ছায় থেকেছি অনূঢ়া, অবিবাহিতা,
তোমার বিরহে নদীতে, বীরত্বে তোমার সঙ্গে
দিয়েছি অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ,
হয়েছি তোমার অবৈধ দ্বিতীয়া স্ত্রী,
থেকেছি আজীবন গোপন প্রেমিকা,
যদিও কুণ্ঠিত ও অপরিচিতা!

তোমাকে ভালবেসে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি
আমার সবটুকু সম্বল,
তুমি বীর যোদ্ধা কিংবা ভিক্ষুকবেশে এসেছ,
খুলে দিয়েছি গলার হার, দুহাতের বালা, সোনার কাঁকন,
তুমি শত্রুশিবির থেকেও এসেছ, হয়েছ বন্দী,
আমি লুকিয়ে গিয়েছি তোমার কাছে,
দিয়েছি তোমায় শেষ তৃষ্ণার জল!
আমি প্রেমিকার রূপে রাজ-রাজেশ্বরী, ভালবেসে ভিখারিনী...
যুগে যুগে যে প্রেম আমাকে সিক্ত করেছে,
পূর্ণ করেছে, অমর করেছে
আমি সেই প্রেমের জন্য গর্বিত, সব প্রেমিকের কাছে ঋণী!

প্রতিদিন

শ্রাবণী রায় আকিলা

প্রতিদিন মৃত্যুর খবর আসে
প্রতিদিন হিমঘর হয়ে থাকে মন!
প্রতিদিন তবু কিছু দৃশ্যে পড়ে যায় চোখ...
মন চায় দিন আজ সকলের সুন্দর হোক!
প্রতিদিন দিন যেন পাটভাঙা শাড়ি!
এলোমেলো হাওয়া এলে... পুরোটা না হলেও
খানিকটা কোনোমতে সামলাতে পারি!
প্রতিদিন জেতে মন, প্রতিদিন হারে,
নিয়ন্ত্রণ হারানো ভালবাসায় আবার
এসে পড়ে দোতলা বাসের মতো জীবনের ঘাড়ে!
প্রতিদিন ব্যথা পাওয়া, বিক্ষত, ছিঁড়ে যাওয়া মন
নিজেকেই একা একা রিফু করা জানে!
যেমন করে ভালবেসে কোনো নারী...
পাঞ্জাবীর বোতাম সেলাই করে প্রেমিকের বুক থেকে
সাবধানে দাঁত দিয়ে সুতো কেটে আনে!

বন্ধু আমার

কেয়া সেনগুপ্ত

কত বছর পর
আবার যোগাযোগ,
মনে পড়ছে তো!
ফেবু ফিরিয়ে দিল
সেই কুমির ডাঙার দিন!
সেই প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা স্ফূর্তির আবেশ,
যা স্মৃতির মণিকোটরে
আজও ভীষণ দুরন্ত...
তোর মনে পড়ে
লুকোচুরি খেলার দিনগুলি!
এমনভাবে লুকোতাম
যে চুপিসারে শেষে
একেবারে এসে ধাপ্পা!
কী মজাটাই না হতো!
আমরা ছিলাম নূতন যৌবনের দূত
হট্টমেলার দেশের চুলবুলি...
হারিয়ে গিয়েছি এখন সবাই
আজ এই কর্মব্যস্ত দুনিয়ায় -
জীবনের উড়ান ভরতে ভরতে
এগিয়ে এসেছি অনেক দূর
তবুও জানিস ভীষণ ভাল লাগে,
মাঝে মাঝে মনটাকে নিয়ে পালাতে
পিছনে ফেলে আসা রামধনু রঙে আঁকা
সেই পুরনো ঠিকানায় -
একসাথে আবার মিলতে পারি যদি
মোদের শৈশবের আঙিনায় -
হাসি-কান্নার জোয়ারে
আবার ভাসাব উজান
সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে
স্বপ্ন-রঙিন-মনে আবার জাগবে আশা,
মাতব মোরা নব দিগন্ত রচনায়...
অফুরান ভালবাসা বন্ধু!

ভিখারী

গৌতম তালুকদার

ছিলেম বেশ
পথিকের স্রোতের পরে
ধূসর বেশ, শুষ্ক কেশ
ছন্দবিহীন প্রহর নিয়ে
তারে কেন ডাক দিলে গো
আমি যে এক, অভিন্ন ভিখারী|

দহন

গৌতম তালুকদার

প্রদীপ গিয়াছে নিভি
অনন্ত বিহীন এক হাহাকার
কেবলই ঘিরেছে মোরে
দ্বিধাভরে দিন গুনি
চরণ ফেলিতে
নিশীথের এ কারাগারে
হৃদয় নিহারিয়া বলে
উপাসিরে জলদান সেবা
পূজিতে আসিবে কেবা
আমার সকল অশ্রুজল
তাহারি চরণ তলে|

ঘুরন্ত নববর্ষ

রঙ্গনাথ

বর্ষ শেষে এসেছিল গত নব বর্ষ
এগুলো তা এক বছর ক্রমাগত;
এর পর তাও ইতিহাস হয়ে গেল;
নব বর্ষ এল ঘুরন্ত চাকার মতো।

সময়ের ক্লান্তি নেই, চলে অবিরাম;
বারবার আনে তা নতুন দিবারাত্রি।
পালা করে আনে আলো ও আঁধার –
অজান্তে মোরা তাদের সহযাত্রী।

পিছনে যা চলে গেল যাক না তা!
সামনে যা পেলাম, হোক মনোহর –
বিশ্বকে হেরি যেন মুক্ত, মুগ্ধ মনে;
আবার কেটে যাক আর এক বছর।

সবুজ মন

রঙ্গনাথ

এ এক সহজ, সতেজ সবুজ মন –
গেঁথে রাখে অতীতের স্মৃতি, ঘটন-অঘটন;
প্রাঞ্জল রাখে বন্ধু-স্বজন, ফেলে আসা পথঘাট
দীঘি-নদী-নালা, স্কুল-কলেজ, খেলার মাঠ...
এ অতীতে নিয়ে যেতে পারে খুব অনায়াসে –
ভাবনার সাথে সাথে সব ভেসে ভেসে আসে।

সবুজ মনে নেই কোনরূপ কালিমার ছাপ –
হেথা নেই ভয়-ভীতি, জ্বালা-যন্ত্রণার চাপ;
এ জমা রাখে না দুঃখ বেদনা, হিংসা-ক্রোধ;
এ ক্ষমাশীল, নিতে নারাজ আঘাতের প্রতিশোধ।
চতুর্দিকে সুন্দর-অসুন্দর যা বেড়ায় ঘুরে ঘুরে
এ সুন্দরকে চায়, নোংরামি থেকে থাকে দূরে।

অতীত জীবন

রঙ্গনাথ

জীবন মোর কেমন ছিল আগে?
সে অতীতকে ভাবতে ভাল লাগে –
সে তো ছিল হাসিখুশীর দিনগুলো!
সদা মন ছিল তরতাজা, প্রফুল্ল;
কী ছিল দারুণ আনন্দময় দিন!
সবই ছিল মনোরম, রঙ্গে রঙ্গিন।

কেমন মোর চিন্তা ছিল আগে?
তা স্মরণ করতে ভাল লাগে
মোর ভাবনা ছিল সহজ-সরল
উদ্যম, ব্যস্ততা ছিল ভীষণ প্রবল;
সততা ছিল মোর নিত্য সাথী;
চেয়েছিনু মাথা উঁচু করে হাঁটি।

চাওয়া-পাওয়া কেমন ছিল আগে?
সে সব কথা বলতে ভাল লাগে –
যখন চাওয়া মাত্র সবকিছু পাই
পাওয়া নিয়ে ভাবনা-চিন্তা নাই!
কত আনন্দে দিনটি যেত কেটে
নির্ভাবনায় নিদ্রা যেতাম রাতে।

সময় মোর কেমন ছিল আগে?
তা আঁকা আছে শত স্মৃতির দাগে –
খেলার সময়টা যেত তাড়াতাড়ি
চাইনি মাঠ থেকে যাই বাড়ি;
স্কুলে যখন করতাম লেখাপড়া
বুঝতাম, সব ঘোরপ্যাঁচেতে ভরা।

ছোটবেলায় মোর কদর ছিল কত?
যতবার ভাবি, মনে পড়ে তত –
ছোট-বড়রা চাইত মোর ভাল
ছিনু যেন সবার চোখের আলো।
আদর-যত্নে যখন হয়েছি ডুবুডুবু
চাইতাম না আমি বড় হব কভু।

হঠাৎ করে

শঙ্কর তালুকদার

হঠাৎ হঠাৎ কেন করো
হঠাৎ করেই সবকিছু।

হঠাৎ করে বৃষ্টি নামে
চাঁদনী রাতে,
রোদ ঝলমল আকাশ মাঝে
মেঘ ডাকে,
গাঙচিলটা উড়তে থাকে
কার শোকে!

হঠাৎ হঠাৎ কেন করো
হঠাৎ সবার কাজের মাঝে।

হঠাৎ করে স্কুলে যাওয়া
ব্যাগ কাঁধে,
হঠাৎ করে বকুনি খাওয়া
মার কাছে,
হঠাৎ করে বড় হওয়া
কোন লাজে।

হঠাৎ করেই সবকিছু
সবাই তবু পেছন লাগে।

বাসের লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে
হঠাৎ দেখা তোমার সাথে
অফিস কাজে ফাঁকি দিয়ে
হঠাৎ করে ট্রামে বাসে,
হঠাৎ করে বন্দী-দশা
করোনা ভাইরাসে।

হঠাৎ করেই সবকিছু
আমরা সবাই সেই ফাঁদে।

বন্ধু হ'ল হঠাৎ করে
চাকরি যেন তার পিছে,
বিয়ে হ'ল হঠাৎ করে
কাগজ-কলম হঠাৎ হাতে,
চলেও যাব হঠাৎ করে
ভাবছ কেন হঠাৎ তবে?

…৩✷৩…

বসন্তের চিঠি

সুজয় দত্ত

উধাও হ'ল ঢাউস জ্যাকেট, বন্ধ হ'ল স্নোম্যান গড়া
চোখ চেয়ে দেখ, কান পেতে শোন, বসন্ত ওই নাড়ছে কড়া
কাঠবেড়ালী নাচছে গাছে, পাখপাখালি দিচ্ছে শিস
তুই বেরসিক, স্মার্টফোনেতে মুখ ডুবিয়ে মেসেজ দিস?
মেসেজ তো আজ কৃষ্ণচূড়ায়, বন-পলাশের আগুন-লালে
মালতী আর বুগেনভেলিয়ায়, শাল-মহুয়ার ডালে ডালে
রংবাহারী আলপনাতে সবুজ পাতায় কাব্যি লেখা
থালার মতো পূর্ণিমা-চাঁদ দিগন্তে ওই যাচ্ছে দেখা
ফেস দেখে তার বুক ভরে যায় কালো দীঘির আরশিতে
পারবে এমন চোখ জুড়াতে জুকারবার্গ আর ডরসিতে?
মধুর খোঁজে কুঞ্জে অলি, ভ্রমর ছোটে পদ্মবন
তুই পাশে নেই, মরছে একাই ছটফটিয়ে আমার মন
এমন দিনে মনের মানুষ থাকলে দূরে কান্না পায়
উড়ছে হাওয়ায় আবির-গুলাল, মনে মনেই রং মাখায়
আমার দুহাত তোর কপালে – লজ্জা-রাঙা তোর দুগাল
চাইছি ক্ষমা, কী করি বল? প্রকৃতি আজ পাঁড়-মাতাল
মত্ত আকাশ ছন্দ-বাতাস ছন্দে দোলায় ঝুমকোফুল
মনে যতই ছন্দ জাগুক, লিখতে গিয়ে করছি ভুল
ভুলছি দিতে বিসর্গ, রেফ – ভুলছি দিতে হসন্ত –
মাফ কোরো হে বিদ্যেসাগর, বাইরে যে আজ বসন্ত

…৩✷৩…

অঙ্গীকার

নমিতা রায়চৌধুরী

তবু যেতে যেতে রেখে যেও,
ফেরার অঙ্গীকার নির্লিপ্ত সংবাদে|
সাঁঝের পুণ্য তিথি যেমন,
গোপন চুম্বনে রেখে যায় আশ্বাসটুকু,
এঁকে দিয়ে যায় নীলে সীমন্তিনী রেখা|

নাহ্, ঠিক ততখানি না হলেও চলবে,
বরং শেষ বিকেলে –
খোঁপায় গুঁজে দিও বুনোফুল,
হঠাৎ দেখা!
গোলাপ বা রজনীগন্ধা
নাহয় নাই বা থাকল কেউ সাক্ষী হয়ে!

নাই বা হ'ল কাব্যিক ছন্দ,
অথবা এস্রাজে কোনো নতুন তান,
প্রেম হোক এক অক্ষত দেওয়াল|
আমরা চাইলেই সেই দেওয়ালে
রেখে দেব দুঃখগুলো –
পরিপাটি,
আলপনা সাজে!
নাহয় ঘাসজমি হব –
তুমি ও আমি,
নদীর দু'ধারে দু'কূল ঘেঁষা!

দেখা হবে, কথাটুকুও,
চির বিচ্ছেদে!

সাঁকো

নমিতা রায়চৌধুরী

আমাদের বিচ্ছেদ ঠিক সেরকম ঘটেনি,
যেমনটি সচরাচর হয়ে থাকে,
অন্য আর দশটা প্রেমে|
নৈঃশব্দ্যের সাঁকো গড়েছে দূরত্বের নীরবতা,
অব্যক্ত অভিমান ভেসেছে বানভাসি প্লাবনে,
ফাগুন ছুঁয়েছে শ্রাবণের রাত|

পূবের আকাশ রেখে যায় ক্লান্ত বাঁশি,
সেঁজুতি বিষাদে ডুবে পূরবী রাগ,
খরতাপে পুড়ে শেষ হয় সবটুকুই,
শূন্য দিনের পুঁজি|
তবু ভাঙা মন,
অবেলার গানে তোলে সুর,
বীণার তারে বাঁধে হৃদয় অজানা দিশার!

আজও পথের বাঁকে পড়ে থাকে মন,
ইচ্ছেগুলো পাখি হয় অন্ধকার কূপে!
ডানা ঝাপটানো সময় কেঁদে ফিরে,
খুঁজে নীলরঙা সেই খাম!

তবে কি কিছুই শেষ হয় না?
শেষের পরেও রয়ে যায় অশেষ তৃষা?
তুমি নেই, তবুও কি আছ?
রয়ে যাবে কি শেষের দিনে?
আজও যেমন তুমি রয়েছ আমার
সবটুকু অভ্যেসে...

প্রভেদ

নমিতা রায়চৌধুরী

তুমি বরাবর কথা না রাখা,
মুখ ও মুখোশ!
বাজার দর চড়া দামের!
বেহিসেবি ঝড়!

আর আমি ?
আমি, আজও নীলিমায় বাঁধি ঘর,
ডিঙায় তুলি পাল|
কুয়াশা চাদরে একফালি সুখ,
নরম আলোর!

তুমি মত্ত কোলাহলে,
ঠিকানাহীন নতুন প্রেমের চিঠি!
আমি স্থির! আমি,
আজও বড্ড ভালবাসতে জানি|
ভীষণ রকম বাঁচি
আমি এক একলা জোনাক বাতি...!

নীল রঙের পাঞ্জাবিটা

কৃষ্ণা গুহ রায়

গেলবারের পুজোয় তোমাকে দেব বলে
নীল রঙের বাটিকের যে পাঞ্জাবিটা কিনেছিলাম,
সেটা এখনও আলমারির তাকে|
তুমি বলেছিলে, রেখে দাও,
ঠিক গিয়ে নিয়ে আসব|
অপেক্ষায় ছিলাম হয়তো আসবে|
তুমি আর পাঞ্জাবিটা নিতে আসোনি|
তোমার বলা কথাগুলো যে শুধুই একটা অপেক্ষা,
সেটা আমি বিলক্ষণ জানি|
আর জানি বলেই ওগুলো আমার এখন নিয়মিত অভ্যাস|
নিরন্তর অপেক্ষারও একটা অদৃশ্য ব্যথা হয়,
তারপর সয়ে যাওয়া ব্যথাগুলোর শরীর থেকে
টাটকা লাল রঙটা ক্রমশঃ বাসি হতে হতে
ব্যথা নিরোধক নীল রঙ হয়ে যায়,
ঠিক যেভাবে নতুন গন্ধ উবে যাওয়া
আলমারির তাকে এখনও রাখা,
গেলবারে তোমার জন্য কেনা নীল রঙের বাটিক পাঞ্জাবিটা
কাটাকুটি খেলছে সময়ের সঙ্গে|

ফিরে চল

শঙ্কর তালুকদার

একটু অন্য
হয়তো বন্য
ভাব ধারণা
নয়কো গণ্য।

একটু মিঠে
একটু নরম
হয়তো বা
গরমা-গরম।

কোন সে দিশা
কোন সে কাল
কেন জানি
সবই গোলমাল।

হারিয়ে ছিলাম
ওদের মাঝে
কেমন যেন
ধন্দ লাগে।

হচ্ছে পরব
হচ্ছে নাচ
বন্ধ তবু
মনের সাজ।

নেই পরোয়া
বেজায় খুশি
মিথ্যে কেন
পড়ার ঝুঁকি।

কোনটা সত্যি
কোনটা মিছে
ভাবছে যারা
তারাই পিছে।

নতুন মন্ত্র
নতুন পাঠ
কেন তবে
এই অবসাদ।

একটু অন্য
একটু ভিন্ন
বাঁধন ছাড়া
জীবন ধন্য।

হার মেনে মন
হারিয়ে যায়
ঘরে ফেরার
তাগিদ তায়।

নীরব জানালা

পৃথা চট্টোপাধ্যায়

নীরব জানলা ধরে অপেক্ষা করি রোদের জন্য
পৃথিবীর কোনো প্রান্তে আলো নেই, শুধুই ভাগাড়
চারদিকে জমা হয় লাশ আর কিছু পোড়া গন্ধ আসে

আমার শরীর ঘিরে এতদিন বাহারি লতারা ছিল রকমারি
সফিসটিকেটেড ছাদে বিলকুল কুয়াশা এখন
ব্যর্থতার হাত ধরে মূল স্রোতে থেকে ফেরে মানুষেরা

ব্যস্ত শহরটা এক ঝটকায় কেমন যেন বুড়িয়ে গেল বদলে গেল
চালচলন
পাশের ফ্ল্যাটের বেকার জোয়ান ছেলেটার চিৎকার
স্তব্ধ
ভেসে যাওয়া মেঘের ভিতরে লাল টিপ পরা মাকে দেখি
কোনো পায়রা আসে না ছাদে দানা খেতে
মাসের মাইনে ক্রমশ তলানিতে ঠেকছে
তলিয়ে যাচ্ছে জীবন
শনশনে হাওয়ায় ক্রমশ নিভে যাচ্ছে আমার ইহকাল পরকাল

চাওয়া পাওয়া

সফিক আহমেদ

চেয়েছি যখন মেঘলা আকাশ
হয়ে গেলে তুমি রোদ্দুর
চেয়েছি যখন সুখী গৃহকোণ
চলে গেলে তুমি বহুদূর
মন চেয়েছিল মৃদু সমীরণ
ফিরে এলে তুমি ঝঞ্ঝায়
চেয়েছি ভাসতে দুর্বার স্রোতে
টেনে নিলে তুমি কিনারায়
ভিজতে চেয়েছি ভরা শ্রাবণেতে
নিয়ে এলে খরা জীবনে
স্বপ্নসাগরে ডোবা হ'ল নাকো
এলে না তো সুখ স্বপনে
হাতে হাত ধরে হ'ল না তো হাঁটা
কুয়াশায় ঘেরা পাহাড়ে
খসে পড়া তারা দেখা হ'ল না তো
নিঝুম রাতে আঁধারে

বন্ধুরা সব

সফিক আহমেদ

বন্ধুরা হয় বেহিসাবি
রাখে না তো হিসাব নিকাশ
বন্ধুরা দেয় উজাড় করে
হিসাব করার নেই অবকাশ
বন্ধু থাকে পাঁচতারাতে
বন্ধু থাকে খেলার মাঠে
বন্ধু থাকে মনখারাপে
বন্ধু থাকে খুশির হাটে
পরিচিত অনেকে হয়
ভাগ্য করে বন্ধু পাওয়া
বন্ধু পেলে মনের কথায়
সময় ভুলে হারিয়ে যাওয়া
সময় স্রোতের উল্টো পথে
চলতে হলে বন্ধুকে চাই
লাগামছাড়া গল্পগাছায়
হারিয়ে যাওয়া সুর ফিরে পাই
তাই হাত ছেড়ো না জড়িয়ে ধরো
বাঁচিয়ে রাখো জীবন দিয়ে
মেঘলা দিনে একফালি রোদ
বন্ধুরাই তো আসবে নিয়ে

রক্তঋণ

সফিক আহমেদ

চারিদিকে শ্বেতশুভ্র তুষারপাতের মধ্যে রাত্রে রাস্তার আলোয় ঝলমল করে তৈরী হয়েছে একটা অপার্থিব পরিবেশ|
টরন্টো সানিব্রুক হেল্থ সায়েন্স সেন্টারে ট্রমা ইউনিট আজ অন্যান্য দিনের তুলনায় একেবারেই ব্যস্ত নয় | সিনিয়র নার্স মেরি আজ রাতের ডিউটিতে | ডিউটি রুমের জানলা দিয়ে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর ফিরে যাচ্ছে তার ফেলে আসা দিনপঞ্জিকার ছেঁড়া পাতায়|

অনিন্দ্য আর মারিয়াম নস্কর অভিবাসন নিয়ে নেমেছিল টরন্টো এয়ারপোর্টে, নতুন দেশে নতুন জীবন শুরু করতে | সে রাত্রে নতুন শহরে সবই অচেনা | শুধু চেনা লেগেছিল আকাশে একথালা পূর্ণিমার চাঁদ | অনিশ্চিত পরিবেশে পরম স্নেহে ত্রস্ত মুখে একটু হাসি ফুটিয়েছিল এই চাঁদের আলো | দেশের প্রতিষ্ঠিত জীবন ছেড়ে এসে, একটা পরিণত গাছকে সমূলে উৎপাটিত করে নতুন জায়গায় প্রতিস্থাপন করার অভিঘাত সহ্য করে ধীরে ধীরে দুজনেই শুরু করেছিল জীবনযুদ্ধ| দেশের টাকা মুদ্রা বিনিময়ে হ্রাস পাওয়ার ধাক্কা, দেশের শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতি পাওয়ার যুদ্ধ আর কোনো কাজ শুরু করার জন্য এই দেশে কাজের অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তার গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে অস্থায়ী কাজ দিয়ে শুরু হয়েছিল এই দেশের মুদ্রা উপার্জন | দুজনের উপার্জনে আস্তে আস্তে এসেছিল স্থায়িত্ব| বাসস্থান, গাড়ি সবই হয়েছিল আর অনিন্দ্যও পেশাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পেয়ে যাওয়ায় সংসারে নতুন মানুষের আগমন হয়েছিল | এসেছিল আরিয়ান|

অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ, আলো আর সিনিয়র সার্জনের ডাকে ছুটে গেল চিন্তার রেশ | নির্লিপ্ত দক্ষতায় অপারেশন থিয়েটারে সাহায্য করে, রক্ত স্যালাইন দিয়ে রোগীকে বেডে স্থানান্তরিত করে, হাতমুখ ধুয়ে, এক কাপ কফি নিয়ে বসল| আর নিজের জীবনটাকেই ছায়াছবির ফ্ল্যাশব্যাকের মতো দেখতে শুরু করল মেরি|...

নতুন কাজে অনিন্দ্যর দিন দিন উন্নতির সাথে পরিবর্তনও এল| অফিসে অনিন্দ্যর নতুন পরিচয় হয়ে ওঠে Andy | দিন কে দিন কাজ, কাজের পর অফিস কলিগদের সাথে পার্টি, নাইট ক্লাব নিয়ে ডুবে যাচ্ছিল | ছোটখাট কাজ আর আরিয়ানকে দেখভাল করতেই মারিয়ামের সময় কেটে যাচ্ছিল | নতুন দেশে জীবনযুদ্ধে সময়ের পারস্পরিক আস্থা হারিয়ে যাচ্ছিল, হচ্ছিল ছন্দপতন|

Andy ডলারের মোহে নতুন নতুন ব্যবসায় টাকা ঢালতে শুরু করল | বৈধ অবৈধ বিচার নির্বিশেষে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার মোহে জড়িয়ে পড়ল মোহিনী সারিনা আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের দলের সঙ্গে | এক মাসে ইনভেস্টমেন্ট দ্বিগুণ হচ্ছিল জেনেও জানতে চাইছিল না যে কোন অসৎ উপায়ে এই টাকা আসছিল | সঙ্গে সঙ্গে চলছিল সংসারে অবহেলা | আরিয়ানের জন্মদিন ভুলে যাওয়া, বিবাহ বার্ষিকী ভুলে যাওয়া, সবই গা-সওয়া হয়ে যাচ্ছিল মারিয়ামের | ডলারের চাকচিক্যে হারিয়ে যাচ্ছিল সেই চেনা অনিন্দ্য | সিনেমা টেলিভিশনের গল্পই যেন ঢুকে পড়ছিল মারিয়ামের জীবনে | ইনভেস্টমেন্টের জন্য ধার করা, সেই টাকা শোধ করার জন্য আরেক জায়গায় ধার, ponzy স্কিম-এ লোকজনকে প্রতারণা করা, একটু আধটু ড্রাগ, এই আবর্তে ডুবতে শুরু করেছিল অনিন্দ্য|
আরিয়ানকে একাই বড় করছিল মারিয়াম| ছ'বছর বয়সে প্রথম স্কুলে যাওয়ায়ও অনিন্দ্যর উপস্থিতি পায়নি আরিয়ান|

স্কুল বাসে ফেরার পথে অ্যাক্সিডেন্টে প্রচুর রক্তপাত হওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় আরিয়ানসহ স্কুলের অন্যান্য আহত বাচ্চাদের| স্কুল থেকে খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে মারিয়াম অনিন্দ্যকে ফোন করেও কোনও উত্তর পায়নি নেশায় মত্ত অনিন্দ্যর কাছ থেকে | হাসপাতাল জানায় আরিয়ানের AB নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ| এই বিরল গ্রুপের রক্ত দুষ্প্রাপ্য | এমার্জেন্সি হলে প্রয়োজনমতো এই রক্ত সংগ্রহ করতে হবে | দিশেহারা অবস্থায় সব ব্লাড ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করেও মারিয়াম পায়নি এই রক্ত| ভগবানের অসীম কৃপায় এই যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিল আরিয়ান | বাড়ি ফিরে এক মাস পর যখন আবার সে স্কুলে যেতে শুরু করল, মারিয়াম কাজ ছেড়ে নিজেই নিয়ে যেত তাকে স্কুলে| সংসার চালাতে হাত পাততে হতো অনিন্দ্যর কাছে | জোড়াতালি দিয়ে চলছিল সংসার | এক রাতের মেলোড্রামাটিক পরিবেশেই শেষ হয়ে গিয়েছিল

নতুন দেশে পাতা সংসার | অনিন্দ্য মধ্যরাত্রে সারিনাকে নিয়ে মত্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকে বলল, 'আজ থেকে সারিনা এখানেই থাকবে, তোমরা বেরিয়ে যাও ঘর থেকে |'

একদিন যেমন দেশ থেকে বেঘর হয়ে এসেছিল নতুন দেশে নতুন ঘর বসাতে, আজ আবার আরিয়ানকে নিয়ে নতুন জীবন সংঘর্ষ শুরু | মারিয়াম নয়, পরদিন সকালে পুলিশের সাহায্যে অনিন্দ্যকেই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের অভিযোগে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল বাড়ি থেকে | সেই শেষ দেখা অনিন্দ্যকে |

সোশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স, চাইল্ড বেনিফিট আর অস্থায়ী কাজ নিয়েই চালাতে হচ্ছিল মারিয়াম আর আরিয়ানের কষ্টের ছোট্ট সংসার | তারপর একবার কমিউনিটি হেল্থ কেয়ার সেন্টারে আরিয়ানের চেক আপ করতে নিয়ে গিয়ে মারিয়ামের আলাপ হয় সৌম্য দর্শন পিতৃপ্রতিম ডাক্তার জোসেফ নিকোলাসের সাথে | ডাক্তার জোসেফের উপদেশ আর সহায়তায় হাম্বার কমিউনিটি কলেজে সে নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্টের শর্ট কোর্স শুরু করে | এর পর নার্সিং হোমে পার্ট টাইম কাজ থেকেই তার একার জীবনে স্বাবলম্বী হওয়ার উড়ান শুরু | দীর্ঘ ১৭ বছর পর মারিয়াম আজ টরন্টো সানিব্রুক হেল্থ সায়েন্স সেন্টারে ট্রমা ইউনিটের সিনিয়র নার্স মারি | আরিয়ান এখন ডাক্তারি পড়ার ছাত্র | সেই ছোট আরিয়ানকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া মাকে এখন হাসপাতালে পৌঁছে দেয় আরিয়ান | আবার মায়ের ডিউটি শেষে মাকে নিতেও আসে | আসতে মানা করলেও আরিয়ান শোনে না | মারির অভিভাবক এখন আরিয়ান | আরিয়ানের পিতৃ আর মাতৃ পরিচয় দুইই মারি |

চিন্তার রেশ কেটে যায় শেষরাত্রে অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন আর ওয়ার্ড বয়দের ছোটাছুটিতে | EMS থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল হাইওয়ে ৪১০-এ বরফঢাকা রাস্তায় পিছলে একটা গাড়ি খাদে পড়ে যায় | গুরুতর আহত চালক, আর মৃত তার সঙ্গিনী | অপারেশন থিয়েটারে তৈরী ছিল মারি আর ডিউটি সার্জেন | স্ট্রেচার যখন ঢুকল মুখ, হাত আর দেহের উর্ধ্বাংশে দেখা গেল মাল্টিপল ফ্র্যাকচার | রক্তক্ষরণে মুমূর্ষু আহত চালককে নিয়ে আর দেরি না করে সার্জেন শুরু করলেন এমার্জেন্সি অপারেশন | স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় সার্জেনকে সহায়তা করে মারি | রোগীর রক্তের নমুনা নিয়ে মারি ছুটল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে পরীক্ষা করে রক্ত নিয়ে আসতে | ব্লাড ব্যাঙ্ক জানাল রেয়ার ব্লাড গ্রুপ AB নেগেটিভ ব্লাড সেখানে নেই | সার্জেনের মতে আর ঘন্টা চারেকের মধ্যে রক্ত দিতে না পারলে রোগীকে বাঁচানো যাবে না | সব ব্লাড ব্যাঙ্ককে অ্যালার্ট করে ডিউটি রুমে ফিরে গিয়ে যখন বসল মারিয়াম, তখন ভোরের আলো ফুটেছে | তার ডিউটিও শেষ | আরিয়ান এসেছে মাকে নিতে | বেরোনোর আগে আর একবার রোগীর অবস্থা দেখতে গেল মারি | সার্জারির পর মুখের চেহারা অনেকটা বোঝা যাচ্ছে | এক ঝলক দেখে নেমে এসে আরিয়ানের গাড়িতে উঠে বসে মারিয়াম | গাড়ি স্টার্ট করার আগে আরিয়ানের হাত চেপে ধরে বলে, 'যা রক্তঋণ শোধ করে আয় | রক্তদান করে আয় মৃত্যু পথযাত্রী রোগীটির জন্য |'

কবিতা গল্প স্বপ্ন ইত্যাদি

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

সুখময়ের সঙ্গে সুখেন্দুবাবুর আলাপের গল্পটা দিয়ে শুরু করি। সুখময় ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে সাহিত্যচর্চা করছে। আগে দশটা পাঁচটা করার সময় তেমন অবকাশ ছিল না। এখন পুরো স্বাধীন। ইদানীং সাহিত্যচর্চা আর ঘুরে বেড়ানোই তার কাজ। আরো বছর দশেক চাকরি বাকি ছিল, কিন্তু আর টানতে ইচ্ছে করল না। মর্নিং ওয়াক করতে করতে সুখময় আশেপাশের এলাকাগুলো চষে ফেলেছে। মাঝে মাঝে সকালে হাঁটতে হাঁটতে খালপাড়ে চলে যায় সে। তারপর সাঁকো ডিঙিয়ে ইঁটখোলার মাঠ। ইঁটের জন্য মাটি তোলার পর যে গর্ত তৈরী হয় তাতে জল জমে গোটা তিনেক বিশাল পুকুর সৃষ্টি হয়েছে। মাছ ঘাই মারে। গভীর পুকুর। পাশেই একটা চায়ের দোকান। সেখানেই সুখেন্দুবাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপ। 'মশাইকে নতুন দেখছি'। 'আরে না না, আমি এখানকার পুরনো বাসিন্দা'। তারপর সামান্য কথাবার্তা। এই যেমন হয় আরকি। দুজনেই এলাকার লোক অথচ দুজনেই প্রথমবার দেখছেন একে অন্যকে। তারপর অবশ্য আলাপটা ভালই এগোয়।

সুখেন্দুবাবুর ঝোলার কবিতার খাতা থেকে বিচ্ছুরিত আলোকজ্যোতি সুখময়কে স্পর্শ করে। তিনিও লিখছেন অনেকদিন যাবৎ। সুখময়ও কখনও মন থেকে, কখনও খাতা থেকে কবিতা পড়ে শোনায় তাঁকে। আশেপাশের মানুষজনও শোনে। ভোলা মাঝে মাঝে চা-বিস্কুটের দামে দু-এক টাকা ছাড় দেয়, বিশেষত সুখেন্দুবাবুর জন্য। স্বীকার করতে বাধা নেই, ওঁর কবিতার মধ্যে একটা অদ্ভুত ছন্দ আছে। উনি মাঝে মাঝে গানের মতো করে কবিতা পড়েন বা গেয়ে ওঠেন। তার ফলে ভোলার দোকানে ভোরের আড্ডাটা বেশ জমে ওঠে।

দুজনের আলাপ ক্রমশ গভীর হয়, এবং সুখেন্দুবাবু সুখময়কে কিছু কবি-সভার খবর দিতে থাকেন। সুখময়ও এই সভাগুলোতে যেতে শুরু করে। সময়টা ভালই কাটে। এত যে সাহিত্যপ্রেমী মানুষ আছেন সুখময়ের মোটেই তেমন ধারণা ছিল না। মুখগুলো চেনা হতে থাকে। নানা বয়সের পুরুষ-নারী সবাই নিজেদের খাতা-কাগজ-বই ব্যাগে ভরে এক আসর থেকে অন্য আসরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সারা বাংলা জুড়ে। কেউ কেউ আবার অন্যের কবিতাও পড়েন। এ এক আলাদা জগৎ।

তারাশঙ্করের সঙ্গে আলাপ এমনই এক আসরে। সুখেন্দুবাবু আর তারাশঙ্কর বেশ অনেকটা যুক্ত হয়ে গেলেন সুখময়ের সঙ্গে। তিনজনে মিলে এদিক-ওদিক যায়, কবিতা পড়ে, শোনে – গানবাজনাও হয়। শ্রুতির সঙ্গেও আলাপ হ'ল এই সময়ে। শ্রুতি প্রচন্ড মুখরা। বাবা-মায়ের প্যাম্পার্ড চাইল্ড হলে যা হয়। তার চল্লিশোর্ধ্ব বয়সে এখনও যথেষ্ট সুন্দরী ও বিদুষী। ওর বিয়ে হয়েছিল কম বয়সে। তিন মাস কাটতে না কাটতেই ওর বর পালিয়ে গিয়েছিল। শোনা যায় বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কাছে কৃষ্ণগোপাল নিজের স্ত্রীর সম্পর্কে গভীর আতঙ্ক প্রকাশ করেছিল। পরের ঘটনা আরও দুঃখের। ডিভোর্স হবার পর শ্রুতি আর বিয়ে করেনি। তার ভালবাসার জন বলতে গেলে রাস্তার একপাল কুকুর আর বেড়াল। শ্রুতিও আসে এই সাহিত্য সভাগুলোতে। শ্রুতির সঙ্গে সুখময়ের এক সখ্যতা তৈরী হয়। অসুবিধে কিছু নেই। সুখময় বিপত্নীক – তার জীবনের অনেকটা সময় কেটে গেছে রুগ্ণ স্ত্রীর সেবা করে, ছেলেপুলেও নেই। কাজেই দোষের কিছুই নেই। দুজনেই দুজনের সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসে। এই আলাপ ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে। ইতিমধ্যে শ্রুতির কোনও অতীতই সুখময়ের অজানা নয়। আর সুখময়ের জীবনের কোন দুঃখও শ্রুতির অগোচরে নেই। শ্রুতির একটাই দোষ – সে মাঝে মাঝে তার কনুইদুটো আকাশে তুলে মাথার পেছনে হাত রেখে কথা বলে। সুখময় তখন অন্যদিকে তাকায়।

সুখময়ের অনেক কষ্টের মধ্যে একটি কষ্ট হ'ল – তার সাহিত্যচর্চা প্রায় তিন দশক বিস্তৃত, অথচ এখনও কোনো প্রতিষ্ঠা পায়নি সে। কেউই তাকে চেনে না। কিন্তু সাহিত্যের সবকটা ধারাকেই সে সমৃদ্ধ করে চলেছে নিরলসভাবে। তবু আজও তাকে সম্পাদক আর প্রকাশকের মুখাপেক্ষী হয়ে ভাবতে হয় লেখা ছাপা হবে কিনা। বছরের শেষে উপন্যাস জমা দিয়ে আসে সম্পাদকের কাছে। তারপর অনেক পরে জানতে পারে তার লেখা ছাপা হচ্ছে না। তখন আবার অন্য কোনো পত্রিকায় জমা দেয়, যদি ধারাবাহিক হয়ে বেরোয় কখনও। বেশিরভাগ সময়েই অশ্বডিম্ব। সরকারী অফিসে

মাঝারি চাকরি করেছে বরাবর, তাই লেখালেখির রোজগারের ভরসায় তার না থাকলেও চলে | কিন্তু, ওই যে বলে না, 'কপাল'! কপালটাই সব | নয়তো গোপালবাবুকেই দেখো না – একটার পর একটা লিখেই যাচ্ছেন | প্রথমে ধারাবাহিক, তারপর বই | তারপর বই থেকে ফিল্ম | তারপর নানা ভাষায় অনুবাদ! তার ওপর আবার নির্বাচিত রচনাবলী, আবার সমগ্র | একটার পর একটা বেরিয়েই চলেছে | আর বই বেরোলে যা হয়, পুরস্কার-টুরস্কারও জুটে যাচ্ছে মন্দ না!

শ্রুতি এদিকে কৃষ্ণগোপালকে আজও ভুলতে পারেনি | মাঝে মাঝেই আক্ষেপ করে – তার সঙ্গে অতটা একবগগা হয়ে ঝগড়াঝাঁটি না করলেই বোধহয় ভাল হতো | কৃষ্ণগোপালও বিয়ে করেননি আর, শুধু এইটুকুই জানে শ্রুতি, এর বেশি আর কিছু জানে না তার সম্পর্কে | শ্রুতি একাই থাকে, বাইপাসের ধারে যেসব নতুন নতুন বসতি এলাকা গড়ে উঠেছে, তারই একটাতে | সেখানেই শ্রুতির ফ্ল্যাট | তার ফ্ল্যাটেও মাঝে মাঝে সাহিত্য আড্ডা বসে | সেখানে হরেক বয়সী নারী-পুরুষ হাজির হয় | একটি মেয়ে সেখানে খুব ভাল গান গায়, তার নাম বিনোদিনী | ছোটবেলায় তার টিবি ধরা পড়েছিল, যদিও ওষুধ খেয়ে সেরে উঠেছিল, কিন্তু মনে ভয় ঢুকে গেছে, তাই আর বিয়েথা করা হয়নি | এদিকে তাকে ধরেবেঁধে বিয়ে দেবারও কেউ নেই | বিনোদিনীর সময় কাটে এইসব গানবাজনা, সাহিত্য বাসর আর সামান্য ধর্মকর্মে |

সুখময়ের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে | কিছুদিন আগে সে একটা পত্রিকায় অনেক লেখা দেখতে পেল, বেশ উৎসাহব্যঞ্জক | লেখার থিম 'লাইফ বিগিন্স অ্যাট্ সিক্সটি'| এই মুহূর্তে দুজন মহিলাকে তার ভাল লাগছে – একজন অধ্যাপিকা শ্রুতি, আর অন্যজন বিনোদিনী, প্রাইমারি স্কুলের টিচার | দুজনের প্রফেশনই যেন প্রোফাইলের সঙ্গে জুড়ে গেছে | বিনোদিনী আবার গলায় কণ্ঠি পরে | তা পরুক গে, খারাপ লাগে না | সাদা শাড়ি পরে, সাদা চন্দনের টিপ | সে গায় ভক্তিসঙ্গীত আর রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্বের গানগুলো |

সুখময় নিজের মনেই হাসে | সুখেন্দুবাবু আর তারাশঙ্করের কৌতূহল – 'কী হ'ল?' সুখময় বলে, 'ও কিছু নয় |' সুখেন্দুবাবুর চোখের সামনে দুটো আঙুল নাড়াতে নাড়াতে বলে, 'ধরুন তো একটা |' সুখেন্দুবাবু একটা ধরেন সুখময় চিন্তায় পড়ে যায় | যে আঙুলটাই সুখেন্দু ধরুন না কেন, সুখময় সব সময়ই দোটানায় | যাইহোক, এইভাবেই কেটে যাচ্ছে সময় | শ্রুতির ফ্ল্যাটে মাঝে মাঝে আসর বসে | আরো নানা জায়গায় দেখা হয় সবার সঙ্গে | সুখময়ের দোটানা আর কাটতেই চায় না | এদিকে মনটা বড়ই ফাঁকা | নিজের বলে কাউকে পেলে বেশ হতো – যে কোন একজন মানুষ, নারীই কাম্য |

তারাশঙ্কর সংসারী মানুষ | বয়সে একটু ছোট | কৃষ্ণগোপালকে সে ভালমতোই চেনে | এক ধরনের নৈকট্যও আছে তার সঙ্গে, কিন্তু সেটা কাউকে জানায়নি সে | সত্যি বলতে কি, বিবাহ বিচ্ছেদের পর কিছুটা হতাশায়, কিছুটা মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টি এড়াবার জন্যই কৃষ্ণগোপাল কলকাতা ছেড়ে শিলিগুড়ি চলে যায় | শাঁসালো প্রাইভেট কম্পানির চাকরিটাও ছাড়ে | কাজ নেয় চা বাগানে | কিন্তু সে কাজও বেশিদিন করেনি | জমানো টাকা আর কিছু ধারদেনা করে একটা ছোট হোটেল কিনে ফেলে শিলিগুড়িতে | সাধারণত ব্যক্তি মালিকানার হোটেলগুলো এভাবেই হাতবদল হতে থাকে | আসল ব্যক্তি মারা যাবার পর আত্মীয়স্বজনরা ব্যবসা চালাতে পারে না, সম্পত্তি বেচে দেয় | কৃষ্ণগোপাল করিৎকর্মা মানুষ | ভেতরে ভেতরে একটা জেদ আর অপমানবোধ কাজ করছিল তার | সত্যি কথা বলতে কি, তার হোটেলটাকে এখন আর ছোট হোটেল বলা চলে না | ব্যাঙ্কোয়েট হল, লন, রুফটপ বার ইত্যাদি মিলিয়ে হোটেল কৃষ্ণা সুপ্রিম যথেষ্ট নামডাকওয়ালা হোটেলের শ্রেণীতে ঢুকে পড়েছে | কৃষ্ণগোপাল মানুষের নজর এড়াতে তার নিজের গেট-আপ আর নাম দুটোই সামান্য বদলে ফেলেছে | সে হয়ে গেছে কিষাণ প্রাসাদ | মাথাটা পুরো কামিয়ে কেবল সামান্য একটা টিকি রেখেছে | পরনে সব সময় ঘন রঙের সাফারি স্যুট | তারাশঙ্করের সঙ্গে কৃষ্ণগোপালের আলাপ ওই হোটেলেই | সেখানে রুফটপ বারে বসে একদিন তারা দুজনে দুজনকে তাদের জীবনের সব গল্প বলেছে | শ্রুতিকে দেখার আগেই তারাশঙ্কর তার নাড়িনক্ষত্র জেনে গেছে | দেখা হবার পর তাই দুয়ে দুয়ে চার করতে তার কোনও অসুবিধেই হয়নি |

তারাশঙ্কর খুবই মজার মানুষ | সুখময়ের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন থেকেই সে তার পেছনে লেগেছে | সুখময় আলাপ শুরু করার জন্য যেই ক্যাজুয়ালি বলেছে, 'আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি!' তারাশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে দেশি মদের

ঠেকগুলোর নাম আওড়াতে শুরু করে, 'নিশ্চয়ই ওখানে নয়তো সেখানে।' বলেই হো হো হাসি।

সুখময় তারাশঙ্করকে বিশ্বাস করে সব কথা বলে। বলে তার একাকীত্বের কথাও, তার দোটানার কথা, কার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবে সেই নিয়ে ধন্দের কথা – সবই।

তারাশঙ্কর বলে, 'অ এই কথা, তা স্বপ্ন দেখতে শুরু করুন। স্বপ্নে যাকে বেশি দেখবেন সেই আপনার মনের মানুষ। এখন স্বপ্নে আপনি কাকে দেখবেন – শ্রুতিকে না বিনোদিনীকে, সেটা দাদা সম্পূর্ণটাই কিন্তু আপনার ব্যাপার। আজ রাত্তির থেকেই কাজে লেগে যান, মানে স্বপ্ন দেখতে শুরু করুন। আমাকে কিন্তু রেগুলার রিপোর্ট দেবেন। তারপরে ব্যাপারটা পুরোপুরি আমার ওপর ছেড়ে দেবেন।'

সুখময় একবার বলতে চাইল, "ধুস, ওভাবে কেউ স্বপ্ন দেখতে পারে নাকি! স্বপ্ন কি অর্ডারি মাল; আর স্বপ্নে কোনও বিশেষ মানুষের মুখ দেখা যায় নাকি! যা দেখা যায় তা ভাসা ভাসা। কখনও দেখা যায় একজনকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম, স্বপ্নের শেষে তার মুখটা পাল্টে গেল; সে তখন আর একজন মানুষ।

যাক, এসব পরে বলা যাবে। সুখময় সে রাত্তিরে ঘুমোবার আগে বিনোদিনী আর শ্রুতি দুজনকেই খুব ভাল করে ভাবল। আশ্চর্য! সত্যিই স্বপ্ন দেখল সে। দেখল – তিনজন পুরুষ এক বনের পথে চলেছে – তারাশঙ্কর, সুখেন্দুবাবু আর সে। আধা নাঙ্গা শরীর; তিনজন তিনটে হালকা নৌকা মাথায় বয়ে নিয়ে চলেছে পাটকাঠির মতো সরু হালকা বাঁশের সঙ্গে কষে দড়ি বেঁধে বানানো। গাছের ফাঁকে ফাঁকে একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। সেখানে দোলায় চেপে দুজন মহিলা যাচ্ছেন। পরিষ্কার করে মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে একজন শ্রুতি আর অন্যজন বিনোদিনী। হঠাৎ কী একটা গোলযোগ হ'ল। কারা যেন দল বেঁধে হৈ-হট্টগোল করতে করতে এগিয়ে আসছে। সবই ঘটছে স্বপ্নে। তারাশংকর বলল, 'দাদা, নদীতে ঝাঁপ দিন, আমাদের ওপর আক্রমণ হতে পারে।'

ব্যস, তিনজনে ঝপাঝপ নৌকাসমেত নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোথা থেকে সবার হাতে দাঁড় এল! তিনজনেই প্রবল বেগে নৌকা বাইতে শুরু করল। কোথা থেকে যেন সাঁই সাঁই করে ছুটে আসছে অজস্র বল্লম; কোনটা জলে পড়ছে, কোনটা কাদার মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে।

স্বপ্নের এই পর্যন্ত দেখে সেদিনের মতো ঘুম ভেঙে গেল সুখময়ের। পরবর্তী মোলাকাতেই তারাশঙ্করকে সবটা বলল। বলা বাহুল্য, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুখেন্দুবাবু ওদের গুজগুজানি দেখে কৌতূহলী হলেন। তাঁকে কাটাবার জন্যই সম্ভবত তারাশংকর একটা জব্বর ঢপ দিল। সুখেন্দুবাবুকে বলল, 'এই বেড়াতে যাবার কথা হচ্ছে আরকি। চলুন, শিলিগুড়ি হয়ে জলদাপাড়া অভয়ারণ্য ঘুরে আসি। ওখানে হাতি, গন্ডার, চিতা – কী নেই!'

না, ব্যাপারটা ঢপ ছিল না। তারাশংকর সত্যি সত্যিই টিকিট কাটল। ভোরের দিকে গাড়ি পৌঁছাবে এন.জে.পি. – সেখান থেকে হোটেল সুপ্রিম। শ্রুতি আর বিনোদিনীও আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেল।

এক সন্ধ্যায় ওরা পাঁচজনে শেয়ালদা থেকে ট্রেনে চাপল। সারারাত ট্রেনে ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম। আবার স্বপ্ন দেখল সুখময়। ঠিক যেন ধারাবাহিক – সেই নদীতে প্রাণপণে নৌকা বাইছে তিনজন। হঠাৎ জলটা স্থির হয়ে গেল; নদী কোথায়, এ তো এক বিশাল দীঘি! দুই রাজকন্যা জলকেলি করছেন। একজন অন্যজনের দিকে জল ছুঁড়ে দিচ্ছেন, দুজনেই ভিজে যাচ্ছেন। তাঁরা একজন শ্রুতি আর একজন বিনোদিনী। এদিকে কোথা থেকে এক প্রকান্ড কুমির এসে হাজির! তিনজন পুরুষই চিৎকার করে উঠল, কিন্তু রমনীদের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। যাইহোক, অবশেষে সম্বিৎ ফিরল তাঁদের।

স্বপ্নের মধ্যে আবার জাম্পকাট। তীব্র গতিতে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ছুটে চলেছে। কামরার ভেতরে এ.সি. থ্রি টিয়ারে আপার বার্থে তারাশঙ্কর, মাঝখানে সুখময়, লোয়ার বার্থে সুখেন্দুবাবু। ওদিকে সাইড আপারে বিনোদিনী আর তার ঠিক নিচেই শ্রুতি। সুখময়ের ঘুম ভেঙে গেল। বাকি সবাই কম্বল মুড়ি দিয়ে, নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে।

আবার যখন স্বপ্ন শুরু হ'ল তখন বনের মধ্যে রাত হয়ে গেছে। আশ্চর্য, যেখানে স্বপ্নটা থেমে গিয়েছিল, আবার ঠিক সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে। সবাই জল থেকে উঠে ভিজে কাপড়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছে। সবার জামাকাপড় থেকে টপটপ করে জল ঝরছে। কাঠকুটো, খড় আর শুকনো গাছের ডাল জড়ো করে একটা বিশাল অগ্নিকুন্ড জ্বালানো হয়েছে; সেটা ঘিরে বসে, দাঁড়িয়ে আছে সবাই। কোথা থেকে হাজির হয়েছে শ্রুতির পোষা কুকুরগুলো; তারা ক্ষিধের চোটে চিৎকার করে

চলেছে | কেবল তারাশঙ্করের দেখা নেই | একপাশে একটা বিশাল সামোভারে ভাত রান্না হচ্ছে | তলায় আগুন জ্বলছে | সুখেন্দুবাবু একটা পশুর শরীর আগুনের মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেঁকে নিচ্ছেন – আর স্বগতোক্তি করছেন, 'সব জিনিস কি আর বনের মধ্যে পাওয়া যায়!' তারাশঙ্কর হঠাৎ কোথা থেকে মা কালীর ছবিসাঁটা একটা বড় কাঁচের বোতল নিয়ে হাজির হ'ল | 'বাপরে বাপ, এসব জিনিস কি আর সহজে জোটে! জোগাড় করতে গিয়ে হালুয়া টাইট হয়ে গেছে | নিন নিন, সবাই একটু করে খান – আর ঠান্ডা লাগবে না |'

মাটির ভাঁড়ে করে সেই চোলাই মদ, এক খাবলা ভাত আর আগুনে পোড়া মাংস – তোফা আয়োজন! কেবল বিনোদিনীকেই টলানো গেল না | খুব দুঃখী মুখে সে গান ধরল – যবে গোকুলচন্দ্র ব্রজে না ফিরিল, সখী গো... | বাকি সবাই আউট | কুকুরগুলো সমানে চেঁচিয়ে চলেছে | তারাশঙ্কর টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, ওর মাথায় কুবুদ্ধি চেপেছে | 'দাদা, কুকুররা মাল খেলে কেমন করে দেখবেন?' বলে সে সুখময়কে একপাশে ডেকে নিয়ে ভাত আর মাংসের সঙ্গে অবশিষ্ট চোলাইটা মেখে কুকুরগুলোকে খাইয়ে দিল |

সবাই তারপর অবাক হয়ে দেখতে লাগল কুকুরের কারনামা | কোনটারই শরীরের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই | চারপায়ে হাঁটতে গিয়ে পারছে না, পড়ে যাচ্ছে, গড়াগড়ি যাচ্ছে আর কুঁই কুঁই শব্দ করছে | হঠাৎ কোথা থেকে সুখেন্দুবাবু কাকে যেন ধরে নিয়ে আসছেন | অবশ্য কে কাকে ধরে আনছে সেটা বলা মুশকিল | চেহারার বর্ণনা আগেই শুনেছে সুখময় | ঠিক বুঝল, এই হচ্ছে গিয়ে কিষাণপ্রাসাদ | তার কাছে গিয়ে আকাশে কনুই তুলে শ্রুতি কীসব অভিযোগ করতে লাগল | 'আমাকে কীসব খাইয়ে দিয়েছে ওরা |'

আবার ঘুম ভেঙে গেল | সকাল হয়ে গেছে | ট্রেন এবার এন.জি.পি. ঢুকছে | কিষাণপ্রাসাদ নিজেই গাড়ি নিয়ে স্টেশনে এসেছে | রাতের স্বপ্ন কি সত্যি হয়! সুখময় দেখছে সবাই যেন একটু একটু টলছে, ঘুমের ঘোরেই মনে হয় | কিষাণপ্রসাদকে দেখে প্রথমে শ্রুতিও চিনতে পারেনি | যখন পারল তখন তারাশঙ্করকে তুমুল ঝাড় – 'এইসব পরিকল্পনা করে করা হয়েছে, তাই না? চলো ঐদিকে' বলে শ্রুতি কিষাণকে নিয়ে একটু তফাতে গিয়ে এক্কেবারে বাপবাপান্ত শুরু করল | বাকি সবাই হতভম্ব | সংক্ষেপে গোটা ঘটনাটা বলল তারাশঙ্কর | সকলে যুগপৎ বিস্মিত এবং কিছুটা আনন্দিত | যদি মিটমাট হয়ে যায়! হবে কি? বোঝা যাচ্ছে না তবে দেখা যাচ্ছে শ্রুতি কনুইদুটো আকাশে তুলে কিষাণকে কী যেন বোঝাচ্ছে | বিনোদিনী ইশারায় সুখময়কে ডাকল, 'চলুন আমরা পেছনের সিটে গিয়ে বসি |' ঘুম ভাঙলে মানুষকে সতেজ দেখায় | বিনোদিনীকেও তাই দেখাচ্ছিল |

তারাশঙ্কর আর সুখেন্দুবাবু মাঝখানের খোপে | ড্রাইভারের সিটে বসল কৃষ্ণ, পাশে শ্রুতি | ড্রাইভার মালপত্র বেঁধে দিল গাড়ির ছাদে | সে ধীরে-সুস্থে ফিরবে পরে | হোটেল কৃষ্ণা সুপ্রিমের দিকে গাড়ি ছুটল | হিলকার্ট রোড | আকাশ পরিষ্কার থাকলে রুফটপ বারের জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় |

কাঠবিড়ালির দুরন্তপনা

হুসনে জাহান

নাঃ, আর পারি না! এই দেখো না, আবারও টবের মাটি এক পাশ থেকে খুঁচিয়ে অন্যপাশে জড়ো করে এক বিরাট গর্ত তৈরী করেছে। কে বা কারা কি জানি! এই তো কালকেই মাটি নেড়েচেড়ে সমান করে রেখেছিলাম। কী যে করি, ভেবে কুল পাই না। অদৃশ্য রাতের অন্ধকারের নিঃশব্দ আগন্তুকের অত্যাচার আর সহ্য হয় না। এদের সাথে প্রতিযোগিতায় তো আমি হেরে গেলাম। কী যে ওরা খোঁজে এই টবের মাটির ভেতর, যার জন্য রোজ রাতে হানা দেয় তা আমার বুদ্ধির বাইরে। প্রথমে ভেবেছিলাম লেটুসের কচি পাতাগুলো খেতে আসে। কয়েকদিন ওরকম ঘটনা দেখে লেটুসের টব ঘরে এনে রেখে দিলাম। তারপর দেখি পালংশাকের ছোট ছোট চারাগুলো সব উপড়িয়ে ফেলেছে। তা দেখে হাসব না কাঁদব! নেড়েচেড়ে মাটি আবার গুছিয়ে দিলাম সেদিনের মতো। ঠিক আছে, একদিন করেছে, সেটা ঠিক করে রাখলে বুঝবে যে তার কান্ড আমি দেখে ফেলেছি। তাহলে পরদিন আর সে এদিকে আসবে না। ওমা, সে যে একেবারে পুরোপুরি নির্লজ্জ, বেহায়া, নাছোড়বান্দা তা কি আমার জানা ছিল? ওর অভ্যাস শোধরাবার নয়। দুদিন বাদ দিয়ে তৃতীয় দিনে আবার সেই কর্মকান্ড। পালংয়ের একটু তাজা পাতা খাবার যে শখ ছিল সে গুড়ে বালি দিয়ে মনখারাপ করেই রইলাম।

প্রতিবেশীর কাছে মনের দুঃখ শোনালে সে পরামর্শ দিল যে পারকিউলেটরে কফি তৈরির পর সেই উচ্ছিষ্ট গাছের চারপাশে ছিটিয়ে দিলে নাকি উপকার হয়। ঠিক আছে, তাই না হয় চেষ্টা করে দেখি। আমার ছেলের নানা ধরনের কফি খাবার বাতিক আছে। তাই এক বিকেলে কফির উচ্ছিষ্ট নিয়ে টবের মাটিতে ছড়িয়ে দিলাম। পরদিন সকালে উঠে প্রথমেই দরজা খুলে ছুটে গেলাম আমার নতুন প্রজেক্টের ফলাফল দেখতে। সত্যিই তো, কফিতে কাজ হয়েছে মনে হচ্ছে। একটাও টবের মাটিতে রাতের অতিথির ধ্বংসযজ্ঞের কোনো চিহ্ন নেই। যাক বাবাঃ, বাঁচা গেল। একটা উপায় তবে পাওয়া গেল! উচ্ছিষ্ট কফিগুলোরও একটা সদ্গতিও হবে। তাহলে এখন আমার মতো ভুক্তভোগী অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের এ সুসংবাদটা নিশ্চিন্তে বাতলিয়ে দেওয়া যাবে। তবে হ্যাঁ, পুরো চব্বিশ ঘন্টা সবুর করে দেখা দরকার। আমার রাতের শত্রু হয়তো সে রাতে আর কোনো বাসার বাগানে ব্যস্ত ছিল। এরপর আরো দুদিন আশা নিরাশায় অতি প্রত্যুষে নিয়মিত বাগানের অবস্থা যাচাই করবার পর কফির গুঁড়োর কার্যকারিতা সঠিক প্রমাণিত হ'ল। যাক বাবাঃ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল। এখন নিশ্চিন্ত মনে তাহলে পালং আর লেটুসের বাকি বিচিগুলো রুয়ে দিয়ে উপভোগ করা যাবে।

কাজেই পরদিন সকালে টবের গাছের খোঁজে আর না বেরিয়ে অন্য কাজে মন দিলাম। বিকেলে পানিদিতে গিয়ে আমার তো চক্ষু ছানাবড়া! রাতের চোর আবার সেই আগের মতোই টবের গাছে সিঁদ কেটেছে। কফিকেও সে বরদাস্ত করে ফেলেছে। কেন যে সে এভাবে আমার সব শখকে দুমড়ে মুচড়ে দিতে চাইছে! কী চায় সে? মাটির ভেতর কী আছে? এরকম করে সে কি অদৃশ্য লুসিফারের মতো এক ধ্বংসাত্মক আনন্দ উপভোগ করছে নাকি? তার যে আখরোট আর ফলমূল খাবার শখ, সে কথা আমার অনেক আগেই ভালভাবে বোঝা হয়ে গেছে। আখরোট গাছের ফলগুলো যে মোটেই আমাদের জন্য নয়, পুরোপুরি তারই প্রাপ্য সে কথা আমাকে মেনে নিতে বাধ্য করেছে। প্রথম প্রথম গাছে সবুজ সবুজ আখরোট ঝুলতে দেখে আমার কী দারুণ আনন্দ হতো! তারপর যখন মাটির ওপর কচি কচি আখরোটের আধাখাওয়া বা

একপাশে ঠোকরানো টুকরোগুলো রোজ ভূপতিত হয়ে থাকতে দেখলাম, তখন বাসার গাছের তাজা অর্গানিক আখরোট খাবার সকল সদিচ্ছা ও উৎসাহ আমার দক্ষিণ হাওয়ার সাথেই উড়ে চলে গেল। কিন্তু আমিও যে আরেক

নাছোড়বান্দা মানুষ | আমি হলাম এত বড় একটা আস্ত মস্ত মানুষ, স্রষ্টার তৈরী জীবের সেরা | আমি এত সহজে এই এক ছোট্ট জীবের কাছে হার মেনে নেব? নাঃ, মোটেই নয় | আমার খুদে প্রতিযোগীকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে কে কার চাইতে শক্তি ও বুদ্ধিতে উত্তম | চলে গেলাম লম্বা এক কুটো হাতে নিয়ে গাছের কাছে | তারপর সেটা দিয়ে ডাল নুইয়ে হাতের নাগালে এনে আমাদের গাছের কতকগুলো আখরোট পরম আক্রোশে পেড়ে নিয়ে এলাম | দুঃখের বিষয় যে আমার এ কাজে বাসার আর কারো কাছ থেকে কোনো আগ্রহ, উৎসাহ, সহানুভূতি বা সাহায্য পাওয়া গেল না | এরকম কয়েকবারের চেষ্টায় বেশ কিছু আখরোট পাড়া হলে হাতুড়ি ও হামানদিস্তা নিয়ে বসে গেলাম আখরোটের সদ্গতি করতে | অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করে আখরোট তো ভাঙা হ'ল, কিন্তু আমার দু'হাতের অবস্থা কাহিল! হাতের তেলোদুটো ১০টা আঙ্গুলসহ এমন কালিমাখা হয়ে থাকল যে পুরো এক মাস বাইরের কারো সামনে হাত লুকিয়ে রাখা ছাড়া উপায় ছিল না |

ছোটবেলায় নজরুলের জনপ্রিয় 'কাঠবিড়ালি' কবিতা হাত পা নেড়ে কত আবৃত্তি করেছি সবাইমিলে | কাব্যের ছোট্ট ছেলেটি মরিয়া হয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে এই চঞ্চল জীবটিকে সাধাসাধি করে তার সাথে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তাকে বকাঝকা করে আড়ি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল | ফল ঠোকরানো, মাঠেঘাটে গাছের তলায় আর ডালে ডালে এই তুলতুলে নরম লোমে ভরা লেজ উঁচিয়ে লাফিয়ে বেড়ানো প্রাণীটি দূর থেকেই দেখা সম্ভব, কিন্তু মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে | এই ডালে ডালে, বিদ্যুতের তারে, ঘরের চালে, মাঠে জ্বলজ্বলে গোল গোল চোখে ফুড়ুৎ করে লাফিয়ে তোলপাড় করা দুরন্ত ছোট্ট প্রাণীটি যে মানুষের এত বড় শত্রু, তা কি কখনো স্বপ্নেও ভাবা সম্ভব? কেন সে বোঝে না যে মানুষের সাথে সহযোগিতা করে ফলগুলো ভাগাভাগি করেও তো খাওয়া যেতে পারে! তবে এখন দেখা যাচ্ছে এর দৌরাত্ম্য শুধু আখরোট গাছের ওপরই সীমাবদ্ধ নয় | সে তো মানুষের সাথে রীতিমতো হিংসাভরে প্রতিযোগিতা করে চলেছে | তার অন্তরের গভীর কথা তলিয়ে বুঝতে চাইলে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে মানুষের সাথে তার পরম শত্রুতা | মানুষ কেন নিজেকে এত বড় মনে করে, আর বাহাদুরি দেখিয়ে নানান ধরনের বৃক্ষজাত ফলমূল পেড়ে একাই খেয়ে নেবে? ওই সর্বভুক মানুষকে নাজেহাল করে, তার অহংকার ভেঙে সে দেখিয়ে দিতে পারে যে তারও শক্তি কারো চাইতে কম নয় | এমন সুন্দর প্রাণীর যে এরকম স্বভাব তা বিশ্বাস করা কঠিন | আমার এ বিশ্বাস প্রমাণ করবার জন্য আমি আরো ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারি | যখন দেখি আমাদের বাসার প্লামগুলোর গায়ে সামান্য লালচে আভা দেখা দেওয়ামাত্র

সেগুলো একটি ছোট্ট মুখের খোঁচার দাগসহ মাটিতে পড়ে আছে তখন আর কী বলব! সে নিজে সেগুলো খাবে না, আর আমাদের খাবার সম্ভাবনাও পুরোপুরি বানচাল করে দেবে | সে নিজে খেলেও আমি বিশ্বের পশুপাখির প্রতি সহানুভূতিতে মনকে মানিয়ে নিতাম, আহা, সেও তো স্রষ্টার সৃষ্ট এক প্রাণী | তাকেও তো গাছপালার ফলমূল খেয়েই প্রাণ বাঁচাতে হবে! তাকে তো আর কেউ বাজার করে রেঁধেবেড়ে পেট ভরিয়ে দেবে না! কিন্তু নাঃ, সে কথা বলবার সুযোগ সে আর রাখল নাকি? ওরে, চঞ্চল, দুরন্ত কাঠবিড়ালি – তুই নিজে খেতে পারলি না, আমাদেরও খাবার সুযোগ দিলি না! কী করে তোদের বোঝাব যে, শোন, খাবার জিনিসগুলো ওভাবে নষ্ট করিস না রে | চল, আমরা সবাই মিলেমিশে গাছের ফলগুলোর সদ্ব্যবহার করি | হায়রে কাঠবিড়ালি, মানুষের মনুষ্যত্ব বোঝবার আর কোনো সম্ভাবনাই তোর আর নেইরে | এরপর কি আর তোর ওই নরম লোমশ ছোট্ট তুলতুলে শরীর আর লেজ উঠিয়ে লাফিয়ে বেড়ানো আদরের চোখে দেখা সম্ভব? ধুর, কে কাকে বোঝাবে? আমার পায়ের শব্দ শুনতেই সে বিদ্যুতের মতো এক লাফে এক গাছের ডাল থেকে আরেক গাছে লাফিয়ে একদম চোখের আড়ালে চলে যায় | কথায় বলে না, 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'!

তবে এটা আমার ভাল করে বোঝা হয়ে গেছে যে এ ধরনের পাতা খাওয়া সবুজ জগতের শত্রু শুধু কাঠবিড়ালিতেই সীমাবদ্ধ নয় | বড় আকারের প্রাণী উট থেকে শুরু করে জিরাফ, গরু, ঘোড়া, হরিণ, ছাগল, খরগোশ, গিনিপিগ এমনকি রাজঁহাস, পাখি, সবাই তৃণভোজী | শুনেছি, ময়ূরেরও নাকি

একই রকমের স্বভাব | আমার পশুপাখি প্রীতিতে ছাগল, খরগোশ, রাজহাঁস, পাতিহাঁস মোরগ সবই এক এক করে পুষে দেখেছি | এই সবগুলো প্রাণীরই বৈরী কর্মকান্ডের সম্পর্কে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে গিয়েছে | ফুল-ফলের বাগান আর পশুপাখিকে একগোত্রে কখনই সহবাস করানো সম্ভব নয় | সর্বভুক মানবীয় উন্নত বুদ্ধিমত্তায় আমাদের এ কথা বুঝে নিতে দেরি হয়নি যে কাকে, কীভাবে, কোথায় আর কার সাথে সহবাস করানো সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয় | এশিয়ার দেশগুলোতে সর্বদা মাছি, মশা, ছারপোকা, তেলাপোকা, পিঁপড়ে, বিছে, ইঁদুর, চড়ুই, কাক – রাজ্যের যত রকমের পোকা মাকড়ের সাথেই সমঝোতা করে চলতে হয়েছে | আর গাছপালা বিনাশ করবার পারদর্শিতার মোকাবিলায় ছোট পোকামাকড়ের কথা তো বলেই শেষ করা যাবে না | আজকাল অবশ্য সূক্ষ্ম নেটের দৌলতে ওদের অত্যাচার থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া গেছে | কিন্তু এই দুরন্ত দস্যি কাঠবিড়ালির উপদ্রবে সে গুড়ে যে পুরোপুরি বালিই পড়েছে দেখা যাচ্ছে!

আজীবন চারপাশে পশুপাখি নিয়ে থাকতে আমার ভাল লেগেছে | উন্মুক্ত খোলা বাগানে ফল-ফুল, সব্জী আর সবুজ ঘাসভরা মাঠে বসে পাখির কলকাকলি শুনলে আমি যেন অন্য এক আনন্দময় দুনিয়ায় চলে যাই | আর কোকিলের ডাকের তো তুলনাই নেই | তারপর আছে বৌ কথা কও, ইষ্টি কুটুম, চোখ গেল, ঘুঘুর 'ঘু ঘু' ডাক কবুতরের বকবকানি, আরো কতকী! আর সকালে ঘুম ভেঙে পাখির কিচিরমিচির যে কি মধুর তা বোঝানো যাবে না | আর মৌমাছি, ভোমর এদের গুনগুনানিই কি কম মধুর? বসন্তের প্রারম্ভে যখন কঙ্কালের মতো পাতাঝরা ডাল আবার নতুন জীবনের আহ্বানে সাদা, গোলাপি বা কচি সবুজে ছেয়ে যায় আর সেখানে ছোট্ট পাখিগুলো আর মধু পিয়াসী ভোমরা ও মৌমাছি তাদের নির্যাসে আকৃষ্ট হয়ে উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ায়, আমি তো সে সৌন্দর্যের টানে সারাদিন তাদের পাশেই কাটিয়ে দিতে চাই | এসব কীটপতঙ্গের আসা যাওয়ার ফলেই তো প্রকৃতির জীবনের গতি |

দেশে বিদেশে ছোট বড় সবার সাথে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে আমার কখনোই আপত্তি নেই | রকমারি পশুপাখিদের জীবনধারণ, চালচলন ও স্বভাব দেখতে ও বুঝতে আমার আনন্দ হয় | কী অদ্ভুত যে খাঁচার ভেতর হিংস্র প্রাণীগুলো কেমন বন্দী অবস্থায় অসহায় হয়ে থাকে, আর আমরা নির্ভয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে দেখি! তাদের বন্দী দশার জন্য অবশ্য কিছুটা মায়াও হয় | আর এত বয়স হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শহরে কোনো সার্কাসের দল আসছে শুনলেই চঞ্চল হয়ে সবাইকে সাথে নিয়ে ছুটে যাই পশুপাখি ও মানুষের লাফালাফি দেখতে | ভাগ্য ভাল যে এসব ব্যাপারে আমার স্বামীর শখও আমার সাথে মিলে যাওয়াতে এ নিয়ে কোনোদিন কোনো সমস্যাই হয়নি |

আমার মা চিরকালই বাসায় গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, হাঁস, মুরগি, পুষতেন | তাই ওসব পশুপাখির চারিত্রিক

বৈশিষ্ট বুঝে তাদের সাথে মিলেমিশেই বাস করতে শিখেছি | কিন্তু বাপু, সত্যি কথাটুকুও বলা প্রয়োজন যে পাখি, হাঁস-মুরগি, খরগোশ, গরু-ছাগলকে কোলে নিয়ে আহ্লাদ কিন্তু আমি কখনোই করতে পারিনি | আমার ছাগল প্রীতির বিড়ম্বনার কথা আগে একবার লিখেছি | আমি ভাল করেই বুঝেছি যে গরু, ছাগল, রাজহাঁস, খরগোশ সবাই ফুলফল ও গাছপালার শত্রু | এসব পশুপাখিদের এনে প্রতিবারই আমাকে দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে | প্রথমবার একজোড়া কুকুর, 'কালু' আর 'ভুলু'-কে

ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে হ'ল | পরেরবার এক নারকেল চোরের পেছনে তাড়া করতে গিয়ে চোরের হাতের ছুরির আঘাতে বিরাট ল্যাব্রাডোরটা মৃত্যু বরণ করল | এর পরেরটা আমার নিষেধ ও শাসন সত্ত্বেও কুয়ালালামপুর থেকে বিমানে বয়ে নিয়ে আসা আমার ছ'টা অর্কিডের চারা পরপর কয়েক রাতে উপড়ে ফেলে দেবার পর তাকে এক রাতে শিকল দিয়ে বেঁধে শাস্তি দিতে গেলে মনের দুঃখে সে গলায় শিকলটা পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে ফেলল | একটা হুলোবেড়াল রোজ রাতে বারান্দার নাইলনের জালিতে ফুটো করে অভিসারে বেরোত | একবার তিনদিন বাইরে গুন্ডামি করবার পর এক প্রচন্ড বৃষ্টির রাতে জখম হয়ে বাড়ির বারান্দায় এসে মৃত্যু বরণ করল | মোরগ প্রতিপালন করবার শখে দুসপ্তাহের নিয়মিত ট্রেনিং নিয়ে ছোট্ট কয়েকটি বাচ্চা এনে বড় করবার পর রাতের আঁধারে বারান্দার খাঁচা থেকে চোর তাদের নিয়ে চম্পট দিল | চাকরি, সংসার সামলিয়ে আমার মায়ের প্রয়াণের পর তার ময়না পাখিটার দেখাশোনা করতে সময় না থাকায় অন্যের

হেফাজতে রাখতে বাধ্য হলাম | মনের দুঃখে আর অযত্নে সে মৃত্যুর কবলে চলে গেল | এরপর আমার নিজেরই বাসের ঠিকানা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাল্টে এক কামরার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল | তাই শুধু চারিদিকের ফুল আর ফলের মনোরম পরিবেশেই আনন্দ খুঁজে বেড়াই এই দুর্দান্ত কাঠবিড়ালির দুরন্তপনা সহ্য করেও |...

শিল্পী: রিতিকা নন্দী (বয়স ১৫)

বাবার স্মৃতিতে

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

দু'হাজার কুড়ি সালের ৪ঠা ডিসেম্বর, শুক্রবার বেলা পৌনে তিনটে নাগাদ আমার বাবা ইহলোক ছেড়ে পাড়ি দিলেন অমৃতধামে! বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। বাবা হয়ে গেলেন 'স্বর্গীয় নিখিল রঞ্জন ঘোষ'!

যে অবস্থায় সুদূর আমেরিকা থেকে করোনা-অতিমারীর হুঁশিয়ারি সামলে, যথাসময়ে হুগলী জেলার কানপুরে, আমার বোনের শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছাতে পেরেছিলাম – তা বাবার আশীর্বাদ না থাকলে সম্ভব হতো না!

পৌঁছেছিলাম ৩০শে নভেম্বর, সোমবার। সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত রাত্তিরে ঘুমোনোর সময় ছাড়া প্রায় সবটা সময় বাবার সান্নিধ্যে কাটিয়েছি। সন্ধ্যেবেলা বাবার কাছে বসে একটু গীতা পাঠ ও গান গাইতাম দুই ভাই-বোন মিলে। বাবার তখন কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না; ২৪ ঘন্টা অক্সিজেন ও স্যালাইন চলছিল। ডাকলে সাড়া পাওয়া না গেলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাবা বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছেছি; একটা প্রসন্নতা ছেয়ে ছিল তাঁর মুখে। শুক্রবার থেকে বাবার ডাক্তার, সৌম্য (আমার ভগ্নিপতি, তুষারের ছোট ভাইঝির স্বামী) রাইস-টিউব দিয়ে খাওয়ানোর কথা বলায় সকালে একটু তরল ব্রেকফাস্ট দেওয়া হ'ল, আর দুপুরে মাছের ঝোলভাত একসঙ্গে তরল পেস্ট করে খাওয়ানো হ'ল। সেই খাওয়াই বাবার শেষ খাওয়া!

বোনের শ্বশুরবাড়িতে এলে দু-তিন দিন পর থেকেই বাবা আমাদের দেশের বাড়ি হুগলী জেলার শান্তিপুরে ফিরে যেতে চাইতেন। ৪ঠা অক্টোবর আরামবাগে বাবার একটা অপারেশনের পর থেকে বাবা-মা বোনের শ্বশুরবাড়িতে। বাবার ইচ্ছের কথা ভেবে আমরা রবিবার অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর বাবাকে কানপুর থেকে শান্তিপুরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে ফেলি। কিন্তু বাবা আমাদের সে সুযোগ দিলেন না। সেই শুক্রবারেই আমার আর টুম্পার (বোনের ডাক নাম) সামনে দুজনের হাতেই জল পান করে বাবা বৈকুন্ঠধামে পাড়ি দিলেন!

বাবা অসম্ভব মানুষজন ভালবাসতেন, আর খুব রাশভারী মানুষ ছিলেন। ঘুমের সমস্যা ছিল, তাই ছোটবেলা থেকে বাবার দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যক্তিত্ব দেখে বড় হয়েছি আমরা। যখন ঘুম ঠিক হতো, তখন বাবা হয়ে যেতেন একদম সদাশিব, বালকসুলভ, কথাও বলতেন কম। পাড়ার খুদে নাতিদের সঙ্গে বাবাকে ফিস্ট করতেও দেখেছি। বাবার বয়স তখন হবে ৫০-৫৫ আর বাবার খুদে নাতিরা হবে ৯-১০ বছরের। কিন্তু যখন ঘুম ঠিক করে হতো না, তখন বাবা হয়ে যেতেন একেবারে অন্য মানুষ। অসম্ভব খিটখিটে, সবসময় রাগের বহিঃপ্রকাশ, শান্ত হয়ে থাকতেন না একমুহূর্ত; কথা বলার কোনো বিরাম থাকত না, আর সবসময় একটা ব্যস্ততা। সহনশীলতা কমলেও অন্যের প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য তখন আরও বেড়ে যেত। সেই অবস্থায় বাবার কথা অমান্য করার কোনো উপায় থাকত না কারো। আমার মাকে এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের বাবাকে নিয়ে সারাজীবন কাটাতে হয়েছে।

বাবার যখন ১৬ বছর বয়স, তখন আমার দাদু মারা যান। আমার দুই ঠাকুমা (বাবার মা ও মাসিমা) তখন অথৈ জলে পড়েন! পিসিমার সঙ্গে আমার বাবা ও কাকুর বয়সের পার্থক্য ছিল অনেকটাই। আমার পিসেমশাই, ডক্টর নকুল চন্দ্র পাত্র ছিলেন খুব নামকরা ডাক্তার। থাকতেন আমাদের পাশের কয়েকটি গ্রাম পেরিয়ে, মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুরে। শুনেছি বাবা ছোটবেলা থেকে এতটাই জেদী ছিলেন যে ঠাকুমাদের কথা প্রায় শুনতেনই না। শুধু তিনজনের কথা বাবা শুনতেন – বাবার ছোটমামা, দিদি ও দাদাবাবুর কথা। অনেক সময় আবার পিসিমার কথাও না শুনলে আমার পিসেমশাইকে হস্তক্ষেপ করতে হতো। আমরাও দেখেছি বাবা ছোটমামা ও দিদি-দাদাবাবু বলতে অজ্ঞান ছিলেন। আমার কাকু (ডঃ প্রভাত

রঞ্জন ঘোষ, বিখ্যাত Mathematician) বাবার থেকে প্রায় ৮ বছরের ছোট | বাবা কাকুকে কতটা স্নেহ করতেন তা ছোটবেলা থেকেই দেখেছি আমরা | কিন্তু তার সব থেকে বড় প্রমাণ পেয়েছি বাবার একেবারে শেষবেলায় | তখন বাবা সবাইকে চিনতে পারলেও, নাম মনে রাখতে পারতেন না | আমার ভগ্নিপতি, তুষার বাবার চলে যাবার দিন ১০/১৫ আগেও মস্তিষ্ক ঠিকমত কাজ করছে কিনা পরখ করতে বাবাকে সবার নাম জিজ্ঞেস করত | আমাদের কারও নাম প্রায়ই বাবা বলতে পারতেন না | আমার বোন টুম্পাকে বলতেন 'আমার ভিক্ষে মেয়ে', বলে আবার মিটিমিটি হাসতেন, বুঝতেন ঠিক নাম বলতে পারছেন না | অথচ সংসারের সব দায়দায়িত্ব সামলে

বাবা ও মায়ের সঙ্গে বোন টুম্পা এবং তার দুই কন্যা

টুম্পা ও তুষার কী অসম্ভব সেবা যত্ন করেছে বাবার! কিন্তু বাবার ভাইয়ের নাম জিজ্ঞেস করলে মুহূর্তে বলে দিতেন "ডঃ প্রভাত রঞ্জন ঘোষ, Mathematics-এর প্রফেসর | তাকে অনেকদিন দেখিনি |" করোনা ভাইরাসের প্রকোপে কলকাতায় গৃহবন্দী অবস্থায় থেকে আমার কাকুও দীর্ঘদিন দেশের বাড়ি গিয়ে বাবার সাথে দেখা করতে পারেননি |

বোনের শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবার পার্থিব শরীর আমরা ৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যে নাগাদ দেশের বাড়ি শান্তিপুরে নিয়ে আসি | এসে দেখি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছে আমাদের পাড়ার প্রতিবেশীরা | তারা যে সবাই ঘোষ-ফ্যামিলির, তা নয় | সম্পর্কে তারা বাবাকে কেউ 'দাদা' বলে ডাকত, কেউ 'কাকা' আর বেশির ভাগই ডাকত 'দাদু' বলে | তাদের সবার আন্তরিক সহযোগিতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি! তখনও মাঝে মধ্যে বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি করোনা অতিমারীর হুঁশিয়ারি সামলে বাবার শেষ সময়ে আসতে পেরেছি! হিউস্টন থেকে ফ্লাইটে ওঠার ৩ ঘন্টা আগেও জানতাম না আমাকে ফ্লাইটে ওঠার অনুমতি দেবে কিনা | রওনা হবার দিনের ৭২ ঘন্টা আগে করোনার RT-PCR টেস্ট নেগেটিভ না হলে অনুমতি মিলবে না | ২৮শে নভেম্বর আমার বড় ছেলে ঋজু ও আমি যখন এয়ারপোর্টে যাবার জন্য বেলা ১১টা নাগাদ বাড়ি থেকে রওনা হলাম তখনও ৭২ ঘন্টা আগে দেওয়া FB County-র টেস্ট রেজাল্ট বা ২৪ ঘন্টা আগে দেওয়া Emergency ল্যাবের RT-PCR টেস্ট রেজাল্ট কোনটাই হাতে পাইনি | কিন্তু অত্যন্ত পজিটিভ মানসিকতা নিয়ে নির্ধারিত সময়েই বাড়ি থেকে রওনা হলাম | এয়ারপোর্ট পৌঁছানোর প্রায় ১৫ মিনিট আগে দুটো টেস্ট রেজাল্টই ইমেলে পেয়ে গেলাম এবং দুটোই RT-PCR টেস্ট নেগেটিভ জানাল! তারপর বাবার কাছে পৌঁছানো থেকে শুরু করে বাবার শরীরের সৎকারের অন্তিমযাত্রা পর্যন্ত সব কাজ কেমন করে যেন হয়ে যাচ্ছিল! করোনা মহামারীর প্রকোপ তখন তুঙ্গে | সব দেশেই vaccination শুরু হতে তখনও দু-এক মাস বাকি, সারা পৃথিবী জুড়ে WHO (World Health Organization) এবং দেশের সরকার জন-সমাগমের জায়গায় একে অন্যের থেকে বাধ্যতামূলক ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখার বিধিনিষেধ জারি রেখেছে! তার মধ্যে এত মানুষের সমাগম – সব সময় মনে নানান অজানা অনিশ্চয়তার ভয় থাকছিল | এইসবের মধ্যেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হ'ল | এরপর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন |

আমি তখন বাড়ির বাইরে কোথাও বেরোচ্ছি না | নিমন্ত্রিতের সংখ্যার হিসেব করতে গিয়ে দেখা গেল তা প্রায় ৫০০-র মতো | বড় কাজের মধ্যে বাবার সমাধি-মন্দির সম্পন্ন করা, শ্রাদ্ধের ধর্মীয় কাজের পুরোহিত, আচার্য, ভট্টাচায্যি ঠিক করা, তিনদিন ধরে খাবারের আয়োজন করা ও তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা – সব মিলিয়ে আমি ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছি না কী করে সব সম্পন্ন হবে! হাতে সময় মাত্র ১০ দিন | কিন্তু বাবার আশীর্বাদ ও তাঁর মানুষজনের প্রতি ভালবাসার জন্য সকলের অফুরন্ত সহায়তায় সব কাজ নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলল | আমি আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না – বাবার সম্পর্কে সব নাতিরা আমায় এসে বলল, "কাকু, তোমায় কোথাও বেরোতে হবে না | তুমি শুধু আমাদের বলবে কী কী করতে হবে, আমরা সব ব্যবস্থা করব |" বাবার সম্পর্কে কোন ভাই, যাদের আমি কাকু বলে ডাকি, আমায় এসে বলছে,

"অচিন্ত্য, তোকে এই কাজটা করতে হবে | চিন্তা করিস না, আমি সব ব্যবস্থা করেছি |" বাবার সম্পর্কে কোনো ভাইপো, যাদের আমি দাদা বলে ডাকি, আমায় এসে বলল, "তোর যখন যা দরকার হবে আমায় জানাবি, তুই কিছু ভাববি না, আমরা সব ব্যবস্থা করব |" আর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ধর্মীয় কাজের আয়োজনের পরামর্শ এল স্যারের কাছ থেকে, বাবার রিটায়ার্ড সহশিক্ষক শ্রী তপন চক্রবর্তী, আমার মাস্টারমশাই, আমি এখনও তাঁকে 'স্যার' বলেই ডাকি | থাকেন আমাদের পাশের গ্রাম ফুলুইতে | স্যার আমায় সমস্ত বলে দিলেন – আমাদের বাড়ির পুরোহিত ছাড়া কতজন ভট্টাচায্যি, তাদের কী কাজ হবে, আচার্যর কী কাজ হবে – সবকিছু | সে অবস্থায় বাবাকে হারানোর বেদনার অশ্রুর সঙ্গে আড়ালে এইসব আন্তরিকতা অনুভবের অশ্রুও বইল! স্যারের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই প্রায় প্রত্যেকবার তিনি কেঁদে ফেলেছেন | ফোনে একদিন কান্নাজড়ানো স্বরে বললেন, "তোর বাবার কাছে যে স্নেহ-ভালবাসা ও প্রশ্রয় পেয়েছি আমার নিজের বাবার কাছে পাওয়ার থেকে তা কোন অংশে কম নয় রে! তুই জানিস মাংরুল হস্টেলে তোর বাবার খাবারের থালাটি আমি স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছি |" আমি সব শুনে বাকরুদ্ধ, ফোনে বুঝতে দিচ্ছি না আমার চোখেও আনন্দাশ্রু! শুধু ভাবছি বাবা তো ৮৫ বছর বয়সে শেষের দিকে বেশ কষ্ট পেয়েই চলে গেলেন – তারপরেও এত শোক! তার একমাত্র কারণ বাবার অকৃত্রিম স্নেহ ও আন্তরিক ভালবাসা | এ প্রসঙ্গে আরও তিনজনের কথা বলতেই হয়, যাঁরা বাবার চলে যাওয়ায় সবচাইতে বেশি কষ্ট পেয়েছেন! তাঁরা তিনজনেই সম্পর্কে বাবার ভাইপো ও ছাত্রস্থানীয় | বড়দা ও মেজদা (দুই ভাই, শ্রী সুভাষ পাঁজা ও প্রভাস পাঁজা) পাড়াতুতো আর অজিতদা (শ্রী অজিত পাঁজা) অন্য পাড়ার ও বাবার গুরুভাই | আমি যখন কানপুরে টুম্পার বাড়িতে, কলকাতা থেকে বড়দা প্রায় রোজই ফোন করে বাবার খবর নিয়েছেন | বড়দার নিজেরই বয়েস ৮০র ওপরে, শুনলাম মাথা সবসময় ঠিকঠাক কাজ করে না – তবুও খবর নিতেন | মেজদা শান্তিপুরেই আমাদের প্রতিবেশী, বাবার দীর্ঘদিনের তাস খেলার পার্টনার ও একটু চাপা স্বভাবের | আমার সামনে নিজের কষ্টবোধ কখনই সেরকম প্রকাশ করেননি | শুধু একদিন আমায় বললেন, "একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল রে! পাড়াতে ভয় করার আর কেউ রইল না!" অজিতদা সেসময় কলকাতায় নিজের ছেলের কাছে ছিলেন | ফোন করে খবর দিতে প্রায় ১০ মিনিট সমানে কাঁদলেন! আমি নির্বাক হয়ে ফোনের এদিকে | কাঁদতে কাঁদতে একটাই কথা বলে গেলেন বারবার, "ওরে এ তুই আমাকে কী খবর দিলি রে! সন্ধ্যেবেলা কার সঙ্গে গল্প করব রে! ওরে আমার একী হল রে!" অজিতদার বয়স প্রায় ৮০ বছর | ফিরে আসি স্যারের কথায় | বাবা স্যারের থেকে প্রায় কুড়ি বছরের বড় ছিলেন এবং স্যারের বাবার বন্ধু স্থানীয় ছিলেন | মাংরুল হাইস্কুলে দুজনে ১৯৯৮ সালে বাবার রিটায়ারমেন্টের সময় পর্যন্ত দীর্ঘ ২২ বছর একসঙ্গে শিক্ষকতা করেছেন | আরও শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে দুজনে একই হস্টেলে থাকতেন | আমিও সেই হস্টেল থেকে মাধ্যমিক পাস করি | স্যারের কাছে প্রাইভেট টিউশনিতে পড়তাম | স্যার ছিলেন সংস্কৃতে অনার্স ও বি. এড.-এ ফার্স্ট ক্লাস | সংস্কৃতের কথা ছেড়েই দিলাম, স্যার যেমন অঙ্ক করাতেন, তেমনি পড়াতেন বাংলা ও ইংরেজি | বাবা ছিলেন ইংরেজির শিক্ষক, বাবাকেও দেখেছি স্যারের ইংরেজি পড়ানোর প্রশংসা করতে | পড়াশোনার সঙ্গে আমি খেলাধুলাও করতাম বলে স্যার আমায় যেমন ভালবাসতেন, তেমনি বদমায়েসি করার জন্য মারও খেয়েছি অনেক | আমার ভাই অপু ছিল ওই স্কুলের স্টার ছাত্র! মাধ্যমিকে ভাইয়ের স্টার পাওয়া রেজাল্ট এখনও মাংরুল স্কুলের রেকর্ড! ভাইকে অকালে হারানোর বেদনা আমার বাবা-মা'র মতো আর যদি কেউ পেয়ে থাকেন, তিনি হলেন স্যার | আমি নিয়মিত স্যারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখি, প্রায়ই স্যার অপুর প্রসঙ্গ তোলেন | আমি কিছু বলতে পারি না, শুধু অনুভব করি সে আঘাত কত গভীর! স্যার তখন আমাকে প্রায় রোজই ফোন করে খবর নিতেন বাবার পারলৌকিক কাজের প্রস্তুতি কেমন চলছে জানতে | যে কোনো প্রয়োজনে যখনই স্যারকে ফোন করেছি সঠিক উপদেশ পেয়েছি | তখন আমি বাড়িতে বসে শুধু প্ল্যানিং করতাম আর প্রয়োজনীয় ফোন করতাম | প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলা সবাই আমাদের বাড়ি চলে আসত কাজের ব্যবস্থা সব কেমন চলছে তার খবর দিতে ও নিতে | মা সবার জন্য চা ও বিস্কুট বা অন্য কিছু জলখাবার দিতেন | মায়ের কোনোদিন কোনও বিরক্তি দেখিনি | সবার সঙ্গে কথা বলে ও কাজের ব্যবস্থা দেখে বুঝলাম, আমাদের গ্রাম এখন কতটা উন্নত! ১৯৮৩ সালের পর যে গ্রামে প্রথম বিদ্যুৎ আসে ও মাত্র দু-

একটা পাকাবাড়ি ছিল, সে গ্রামে এখন প্রায় প্রত্যেকের পাকাবাড়ি | চাষবাস ছাড়াও নানান পেশাবৃত্তি করছে অনেকেই, তাদের কাজের মান ও বিশ্বাসযোগ্যতা দেখে নিয়তই মুগ্ধ হচ্ছি | বাবার স্মৃতি-মন্দিরের ইঁট-বালি-লোহার রড-সিমেন্ট, খাওয়ানোর প্যান্ডেল, রঙের মিস্ত্রি, মিষ্টি – সবকিছুর ব্যবস্থা আমাদের গ্রামেই হয়ে গেল | নিমন্ত্রিতদের ফোনে নিমন্ত্রণ করার জন্য ই-কার্ড বানাতে চেন্নাই থেকে সাহায্য করল আমার বন্ধু-শ্যালক প্রদীপ | তার বানান শুধরে দেওয়াতে সাহায্য করল হিউস্টন থেকে রূপছন্দা | বাবার পার্থিব শরীরের সৎকারের সময় থেকে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কাজ পর্যন্ত রোজ রাত্রে মা আর আমি নিরামিষ বা হবিষ্যি খেতাম | আমার এক জ্যাঠতুতো বৌদি (শেফালীবৌদি) মাকে বলে গেল, "কাকিমা আপনাকে সন্ধ্যেবেলা কিছু রান্না করতে হবে না, আমি সব করে পাঠিয়ে দেব |" দশদিন রোজ সন্ধ্যেবেলা ক্ষিতীশদা আমাদের গুছিয়ে খাবার দিয়ে গেছে |

ডিসেম্বর মাসে গ্রামে বেশ ঠান্ডা | বাবার কাজের ৪/৫ দিন আগে হঠাৎই ঠান্ডা লেগে সর্দিজ্বর হয়ে গেল আমার | যদিও আমাদের গ্রামে বা পাশাপাশি কোথাও কারও করোনার খবর পাইনি, তবুও মনের মধ্যে একটা ভয় থাকলই | ভাবছি কী হবে, বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন দীর্ঘ সময় খালি গায়ে, উত্তরীয় জড়িয়ে বসে ধর্মীয় কাজ করতে হবে! তার ওপর মেঘলা আবহাওয়া ও অল্প বৃষ্টি শুরু হ'ল | আসল কাজের দিন স্থির হ'ল ১৪ই ডিসেম্বর, সোমবার, আর তার আগের দিন অর্থাৎ রবিবার দিন ক্ষৌরকর্ম | জ্বর-জ্বর ভাবের জন্য আগের দুদিন স্নান করতে পারলাম না | আমার দাদু-ঠাকুমার নামে কাকু যে 'সুরেশ সাধনা' হোমিওপ্যাথি ওষুধের দাতব্য চিকিৎসালয় চালাচ্ছেন বিগত প্রায় ৩২ বছর ধরে – সেই ডাক্তারখানার কম্পাউন্ডার, নিতাই আমাকে ওষুধ দিল | আর তার সঙ্গে মা প্রায় রোজই তুলসীপাতা-আদা-লবঙ্গ-হলুদ-গোলমরিচ জলে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে মধু মিশিয়ে খেতে দিত | শনিবার শরীরটা অনেকটাই ভাল হয়ে গেল, একটু রোদও বেরোল, স্নান করতেও পারলাম | আর রবিবার ক্ষৌরকর্মের দিন পুরোপুরি সুস্থবোধ করলাম, সঙ্গে ঝলমলে রোদ্দুর! ঠান্ডাও কিছুটা কমে গেল | বাবার কাজের দিন ঠান্ডা আরও কমল, ঝলমলে রোদে বসে দীর্ঘ ৫ ঘন্টা ধর্মীয় কাজ করতে আমার কোনও অসুবিধেই হ'ল না! ৫০০ জন নিমন্ত্রিতদের আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে প্রায় ৫৩০ জন অতিথিদের আপ্যায়ন করল বাবার সব নাতি, ভাই ও ভাইপোরা | প্যান্ডেলে ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে খাবার টেবিল সাজানো হয়েছিল | প্যান্ডেলের বাইরে একটা আলাদা টেবিলে হ্যান্ড-স্যানিটাইজার ও মাস্ক রাখা হ'ল, কেউ মাস্ক না পরে এলে তাদের দেবার জন্য | সমাধি মন্দিরের কাজও নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সম্পন্ন হয়ে গেল |

বাবার কাজে ভাঁড়ারঘর সামলানোর দায়িত্ব নিল আমার পিসতুতো মেজদা | আমার পিসিমার কথা আগেই বলেছি | বাবার তিন ভাগ্নে আর এক ভাগ্নি | দিদি সবার বড় আর তারপর তিন দাদা | বাবার বড় ভাগ্নে, যাকে আমরা ছোটবেলা থেকে বড়দা বলে এসেছি, বাবা চলে যাবার ঠিক এক সপ্তাহ আগে সে চলে যায় | বয়স হয়েছিল ৭২ বছর | বড়দার দুরারোগ্য ক্যানসার ধরা পড়েছিল ২০২০-র শুরুর দিকে | মেজদাই সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে বড়দার পারলৌকিক কাজ, বাবার কাজের ঠিক এক সপ্তাহ আগে সম্পন্ন করেছে রামজীবনপুরে | আমি প্রয়োজনমতো মেজদাকে ফোন করে বড়দার কাজের খবর ও উপদেশ নিতাম | মেজদা যথাসময়ে এসে আমার যোগ্য দাদা হিসেবে আর মেজবৌদি, মা'র পাশে থেকে বাবার এতবড় কাজ সামলে দিয়েছে | এই সবকিছু মিলিয়ে বাবার পারলৌকিক সমস্ত কাজ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হ'ল | এই কাজে সবথেকে বেশি মানসিক শান্তি পেল আমার মা | বাবাকে হারানোর দুঃখ মনের ভেতর থাকলেও, আমার সামনে প্রকাশ করেনি | আমি যে সুদূর আমেরিকা থেকে যথাসময়ে পৌঁছে মা'র পাশে থেকে বোন ও ভগ্নিপতির সাথে বাবার কিছুটা সেবাযত্ন করতে পারলাম ও বাবার পারলৌকিক কাজ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হ'ল – তাতে মা'র পরম শান্তি |

এবার শুরু হ'ল ফেরার আগে মা'র কিছু জরুরী ও অসমাপ্ত কাজ, যেমন পেনশন চালু করার কাগজপত্র একত্রিত করা, ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় কাজ ও সর্বোপরি মা'র দেশের বাড়িতে একা থাকার ব্যবস্থা সুরক্ষিত করা | টুম্পা ও তুষার তাদের কাছে কানপুরে গিয়ে থাকার কথা বললেও মা'র খুব ইচ্ছে শান্তিপুরেই থাকে | এই কাজটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে খুব কঠিন হ'ল না | এই প্রসঙ্গে দুজনের কথা না বললেই নয় – রুপোদা ও মায়াবৌদি | রুপোদা দীর্ঘদিন আমাদের জমি-জায়গা, চাষবাস দেখাশোনার পুরো দায়িত্ব নিয়েছে | দুজনেই

বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করে | রুপোদা বাবাকে ভয়ও পেত, ভালও বাসত, আবার প্রয়োজনে বকাবকিও করত | রাত্রে কোনো কারণে বাবা যদি না-খাবার গোঁ ধরত, তাহলে মা ফোন করে হয় আমাদের পাড়ার সুশীলকাকাকে (বাবার খুড়তুতো ভাই) নয়তো রুপোদাকে ডেকে পাঠাত | দুজনেই বাবাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খাওয়াতে সমান পারদর্শী ছিল | মায়াবৌদি বিগত ৬-৭ বছর ধরে বাবার সারাদিনের সেবাযত্ন ও মা'র ঘরের কাজ করে আসছে | গত দু'বছর রাত্রে বাবাকে সামলানো একা মা'র পক্ষে অসুবিধে হচ্ছিল বলে বৌদি রাত্রেও মার কাছে শুতে আসত | ২০২০-র ৪ঠা অক্টোবর আরামবাগ নার্সিং হোমে বাবার একটা অপারেশন হয় | আমার ভগ্নিপতি তুষারই তার সমস্ত ব্যবস্থা করে | সেই সময় থেকেই বাবা-মা দুজনেই বোনের শ্বশুরবাড়ি কানপুরে চলে আসেন | টুম্পা ও তুষার দুজনেই সেবাযত্নে এতটাই পারদর্শী যে মা অনেকটাই নিশ্চিন্ত ছিল সেখানে | আমার দুই ভাগ্নীদের নিয়ে টুম্পা তখন বেশ ব্যস্ত | দুজনেই ভার্চুয়াল স্কুলিং করছে বাড়ি থেকে | বড়ভাগ্নীর সেকেন্ড ইয়ার নার্সিং-এর ক্লাস, আর ছোটভাগ্নীর ক্লাস ১২-এর ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতি | বাবা সেসময় ক্রমশ খেতেও ভুলে যাচ্ছিলেন | সকালে, দুপুরে, বিকেলে ও রাত্রে বাবাকে খাওয়াতে অনেকটা সময় লাগত টুম্পার, গান শুনিয়ে, ভুলিয়ে খাওয়াতে হতো | টুম্পার কাজে সাহায্য করতে নিজের সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব তার দুই ছেলে-বৌমাদের হাতে তুলে দিয়ে নির্দ্বিধায় মায়াবৌদিও কানপুরে চলে আসে | বাবা তখন মা'র কাছে কিছুতেই খেতে চাইতেন না | মা টুম্পার মতো অতটা গুছিয়ে ও ভুলিয়ে খাওয়াতে পারত না | একটু এদিক-সেদিক হলেই বাবা অসম্ভব রেগে যেতেন, মা ভয় পেয়ে যেত | বোন কোনো কাজে বাবাকে খাওয়ানোর সময় না পেলে মায়াবৌদি খাইয়ে দিয়েছে বাবাকে | অনেক সময় রেগে গিয়ে বাবা বৌদিকে যা খুশি বলেছে | বৌদি কোনদিন কোন কিছুই গায়ে মাখেনি | বরং বলতে শুনেছি, "বলুক না, আমি কি রাগ করব ভাই? কাকা তো আমারও বাবার মতো |" আমরা শুধু নীরব থেকেছি | কাজেই আমার কাজ সহজ ছিল | মায়াবৌদিই মা'র কাছে রাত্রে পাকাপাকিভাবে শুতে আসবে ঠিক হয়ে গেল, আর প্রয়োজনে রুপোদাও | আমাদের জমি-জায়গা, পুকুর-ডোবা, চাষবাসের সমস্ত দায়িত্ব পাকাপাকিভাবে রুপোদা ও তার দুই ছেলে মহাদেব ও লেদুকে দেওয়া হ'ল |

আমি বাইরে বেরোতে পারব না বলে গঙ্গায় বাবার অস্থি বিসর্জনের পুণ্য কাজও বাবা রুপোদাকে দিয়েই সম্পন্ন করালেন |

অপারেশনের পর বাবার ক্ষতের জায়গায় ড্রেসিং করতে আসত কানপুরেই একটি ওষুধের দোকানের মালিক, অল্প বয়সী কমল | তুষার ও টুম্পাকে 'দাদা-বৌদি' বলে খুব সম্মান করত সে | আমি গিয়ে দেখেছি নিয়ম করে রোজ তিনবার আসত কমল – সকালে, দুপুরে আর রাত্রে | প্রত্যেকবার অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে ক্ষত পরিষ্কার করে, ওষুধ লাগিয়ে, নিপুণভাবে নতুন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে | কমলের সেই সেবা-শুশ্রূষা চলছিল অক্টোবর মাস থেকে বাবার চলে যাবার আগে পর্যন্ত | কোনোদিন টাকাপয়সার কথা বলেনি ও | আমি মনে মনে ভাবতাম পরে হয়তো বলবে | মা অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলত, "তুমি বোধহয় আগের জন্মে আমার ছেলে ছিলে কমল; এরকম শুশ্রূষা কেউ করতে পারবে না বাবা |" আমি কানপুরে পৌঁছানোর আগে কমলের কথা অনেক শুনেছি | বাবার ঠিক চলে যাবার মুহূর্তে বাবার সেই ক্ষতের শুশ্রূষাই করছিল কমল | পাশে ছিল টুম্পা, মা ও মায়াবৌদি | বাবার তখনকার অবস্থা দেখে কমল আমাকে ডাকতে বলল | আমি সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া ছেড়ে উঠে এসে টুম্পার সাথে বাবার মুখে জল দিই | বাবার পায়ের কাছে বসেছিল কমল | বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কাজে আমি কমলকে নিমন্ত্রণ করি | নানা কাজের মধ্যে ও আসার সময় পায়নি | পরে শুনেছি টুম্পা ও তুষার ওকে তিনমাস প্রতিদিন বাবার শুশ্রূষা করার জন্য পারিশ্রমিক দিতে গেলে কমল তা নেয়নি | ও বলেছিল টাকাপয়সার জন্য ও বাবার সেবা করেনি | আমি বিস্ময়ে শুধু হতবাক হইনি, নিজেকে কমলের কাছে অনেক ছোট মনে হয়েছে |

বাবার স্মৃতিমন্দিরের কাজের সঙ্গে আমার দাদু-ঠাকুমাদের স্মৃতিমন্দিরের মেরামতিও করানো হ'ল |

বাবা ও দাদু-ঠাকুমার স্মৃতি মন্দির

বাবার কাজের পর মাকে রাজি করিয়ে আমাদের মাটির বাড়ির নীচের একটা ঘরের মেঝে সিমেন্ট করিয়ে নেবার ব্যবস্থা করি। দীর্ঘদিন পর সেই ঘর মেরামত করার জন্য ভেতর থেকে সব আসবাবপত্র বার করা হ'ল। আমি কলকাতায় ফিরে আসার আগে সব কাজ শেষ হ'ল না; ভাবছিলাম কে আবার সবকিছু গুছিয়ে তুলে দেবে! মা বলল, "সে তুই কিছু ভাবিস না, আমি তারাকে বলেছি, ও এসে সব গুছিয়ে দেবে বলেছে।" তারা হ'ল বাবার এক নাতবৌ, নাতি টুটুলের স্ত্রী। আমি ওর নাম দিয়েছিলাম 'তারা-মা'। জানলাম আমাদের গ্রামে কারো কোনো শুভকাজে তারাকে খবর দিলে সে গিয়ে তাদের কাজ করে দিয়ে আসে। আমিও বাবার কাজের সময় দেখলাম, নিজের বাড়ির সব কাজ সেরে আমাদের বাড়ি চলে আসত তারা-মা। তারপর মাকে প্রায় সব কাজে সাহায্য করে নিজের ঘরে ফিরত। আমি পরে মার কাছে খবর পেয়েছিলাম যে তারা-মা এসে মা'র ঘর ঠিকমতো গুছিয়ে দিয়ে গেছে।

১৫ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার বাবার পারলৌকিক কাজের নিয়মভঙ্গ পালন করা হ'ল। ৩০শে ডিসেম্বর আমার আমেরিকায় ফেরার দিন। কলকাতায় কিছু কাজও আছে। তাছাড়া তখন আমার শাশুড়ী-মা প্রায় দেড় বছর আগে আমার শ্বশুরমশাইকে হারিয়ে গত ন'মাস ধরে করোনাতে একেবারে গৃহবন্দী। মাঝে মধ্যেই ফোনে বলেন, "এবার বোধহয় মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে, TV ছাড়া কথা বলার কেউ নেই।" তাই ওঁর সঙ্গেও ক'দিন সময় কাটাব কলকাতায়। ঠিক হ'ল ২৩শে ডিসেম্বর বুধবার সকালে শান্তিপুর থেকে বোনের বাড়ি কানপুর হয়ে কলকাতায় ফিরব গাড়ি করে। মা আপত্তি করল না। আমি নির্বিঘ্নে হিউস্টনে রূপছন্দাদের কাছে না ফেরা অবধি মা'র মনেও শান্তি নেই। কিন্তু মা'র মন যে এবার একটু একটু খারাপ হচ্ছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। কোনভাবেই আমার দুর্বলতা মা'র সামনে প্রকাশ করছি না। প্রথম আবেগের বাঁধ ভাঙল ফেরার দিন সকালে গাড়িতে ওঠার আগে ওপরে বাবার ছবিতে প্রণাম করতে গিয়ে। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে এবার গেলাম আমার এক জ্যেঠিমাকে (প্রতিবেশী, বড়দাদার মা, এঁদের বাড়িতেই ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি) প্রণাম করতে। আবেগের বাঁধ ভাঙল সেখানেও। জ্যেঠিমা বয়সে বাবার থেকে কয়েক বছরের বড়। বাবার চলে যাবার কথা প্রথমে জ্যেঠিমাকে জানানো হয়নি। তবে আস্তে আস্তে জানতে পেরেছিলেন। আমি দেখা করতে গেলেই বলতেন, "তোর বাবা তো চলে গেল, আমি কী করে পেরোই বল না রে!" বয়সের ভারে শারীরিক কষ্ট থাকলেও জ্যেঠিমার আন্তরিকতা সেই আগের মতোই। গেলেই বসতে বলে মামণি (রূপছন্দার ডাক নাম), ঋজু আর বিশেষ করে ঋতের কথা খুব জিজ্ঞেস করতেন। ঋত প্রত্যেকবার গিয়ে জ্যেঠিমার সঙ্গে দেখা হলেই প্রণাম করত, সেটা জ্যেঠিমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। এবারেও বললেন, "আর বোধহয় তোর ছেলেদের দেখতে পাব না।" জ্যেঠিমার কষ্ট দেখে মনে মনে ঈশ্বরের কাছে তাঁর মুক্তি প্রার্থনা করেছি, তাই ফেরার আগে জ্যেঠিমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না, নিমেষে চোখে জল এসে গেল। খুব বুঝতে পারছিলাম এইবারই জ্যেঠিমাকে শেষ দেখা। তাই সত্যি হ'ল। মা'র কাছে জানলাম গত ২১শে মার্চ জ্যেঠিমাও রামকৃষ্ণলোকে চলে গেলেন। গাড়িতে ওঠার ঠিক আগে এবারের মতো মাকে ছেড়ে আসার মুহূর্ত। মাকে তো শক্তই দেখছি। তাই আমার ভেতরটা অস্থির হলেও বাইরে অচঞ্চল থেকে মাকে প্রণাম করে গাড়িতে উঠলাম। শান্তিপুরের চৌরাস্তা ছাড়িয়ে মা'র থেকে অনেকটাই দূরে চলে এসেছি; মনও কিছুটা শান্ত তখন। ভেবেছিলাম এবার কামারপুকুরে ঠাকুরের মন্দিরে আর যাব না। সেইমতো হুনোকে (আতস ঘোষ, সম্পর্কে বাবার ভাই হয়) বলে রেখেছিলাম সোজা টুম্পার বাড়ি যাব। কিন্তু যেই গাড়ি কামারপুকুরে পৌঁছাল মনের অজান্তেই আতসকে মন্দিরে যেতে বললাম। গিয়ে দেখি দুপুরে মন্দির বন্ধ হতে তখনও প্রায় ঘন্টাখানেক দেরী। নীরবে সুশৃঙ্খল লাইনে ৬ ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের পবিত্র জন্মস্থানে প্রণাম করে কানপুরে টুম্পার বাড়ি ফিরলাম। বাবা চলে যাবার মুহূর্তে টুম্পা আমাকে খাওয়া থেকে ডেকে এনেছিল, তখনও আমার খাওয়া শেষ হয়নি। সেই আক্ষেপ ঘোচাতে তিন রকমের মাছ রান্নাসহ আরো অষ্টপদসহকারে আমাকে বসিয়ে খাওয়াল। দুপুরের খাওয়া সেরে টুম্পার বাড়ি থেকে রওনা হলাম। তুষার ওর গ্রামের একজন ড্রাইভার ঠিক করে রেখেছিল। সে তুষারের গাড়িতে আমায় কলকাতায় পৌঁছে দিল। সেখানে শাশুড়ি-মা'র কাছে কাটালাম ঠিক সাতদিন। আমার পিসতুতো ছোটদা, পেশায় ডাক্তার, সল্ট লেকে থাকে, আমায় ফোনে বলল, "যাক তোর তাহলে Mission Accomplished!" উত্তরে ছোটদাকে

বললাম ৯৫% বলা যায় | ১০০% হবে ফেরার ৭২ ঘন্টা আগে করোনার টেস্ট করিয়ে, নেগেটিভ রেজাল্ট নিয়ে নিরাপদে হিউস্টনে ফিরলে তবেই |

৩১শে ডিসেম্বর হিউস্টনে পৌঁছে বাড়ি ফেরার পথে ঋজু যখন আমায় নিয়ে ড্রাইভ করছে, মালাদির (আমাদের বাংলা ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা) ফোন এল | ২৮শে নভেম্বর রওনা হবার দিনও ঋজু যখন ড্রাইভ করছিল মালাদি ফোন করেছিল | তখনও আমার করোনা টেস্টের একটা রেজাল্টও হাতে পাইনি | মালাদি 'সব ঠিক হয়ে যাবে' বলে সান্ত্বনা দিয়েছে সেদিন | এখন যখন নিরাপদে বাড়ি ফিরছি ফোনে মালাদির স্নেহের বৃত্ত সম্পূর্ণ হল যেন!

আর মৃণালদা ও রুমাদি – তাঁরা দুজনেই সব সময় আমার এই দেশ যাত্রায় মনের পাশে থেকেছেন | মনের থেকে জানি ও মানি আরও অনেকের সঙ্গে তাঁদের আশীর্বাদের হাত সব সময় আমাদের মাথার ওপর | আর বাবার এই স্মৃতিপথে যাত্রার সব কিছুই আমার আর রূপছন্দার কাছে তাঁর চির অকৃত্রিম ও অনন্ত শুভাশীর্বাদস্বরূপ |

বাবা-মা এবং শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে আমরা

•••❀•••

মনসঙ্গীত

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

নয়ন ছেড়ে গেলেও তুমি
রইলে নয়ন গভীরে,
হে পিতা তোমার স্নেহ-ভালবাসা
পরশিবে চির হৃদিরে |

যাহারা তোমার নিশিদিন সেবা
করিল পরম যতনে,
রেখো তাহাদের অনুক্ষণ তুমি
সুখ-শান্তির গহনে |
শুভাশিস তব পায় তারা যেন
সুধা সংসার মাঝারে |
হে পিতা তোমার স্নেহ-ভালবাসা
পরশিবে চির হৃদিরে |

রাগ অভিমান এসে গেছে ফিরে – তেমনি নীরব বন্ধন,
আজ পাই তোমা যেদিকে তাকাই – অশ্রুবিহীন ক্রন্দন |

রয়ে যাবে তুমি এমনি নিকটে
মনমন্দির আসনে,
জানি সব বাধা সরে যাবে দূরে
তোমার নীরব শাসনে |
রবে তুমি মম আপন এমনি
যতদিন প্রাণ শরীরে |
হে পিতা তোমার স্নেহ-ভালবাসা
পরশিবে চির হৃদিরে |

•••❀•••

বন্ধুত্বের রূপান্তর

ভজেন্দ্র বর্মন

ছোটবেলায় যে কত বন্ধু ছিল তার হিসাব রাখার প্রয়োজন থাকে না | ছিল খেলার সাথী, ছিল আত্মীয়সূত্রে নানা ধরনের ভাই, বোন, ছোটমামা, ছোটমাসি, ছোটপিসী ও ছোটকাকা | ছিল স্কুলে একই শ্রেণীর বন্ধু এবং স্কুলে যাওয়ার সময় যাদের সাথে যেতে হতো, সেসব বন্ধু | এদের মধ্যে খুব কাছাকাছি ছিল যারা বাড়ির পাশাপাশি থাকত | এটা সেটা কারণে তাদের বাড়িতে যাওয়া যেত | আর তাদের বাবা-মায়েরা যদি বন্ধুদের আসা-যাওয়াতে আপত্তি না করে, তাহলে তো কোন বাধা থাকে না |

আমাদের বাড়ির পাশে আবদুল জব্বারদের বাড়ি ছিল; জব্বার আমার সাথে পড়ত | আমের মৌসুমে তাদের বাড়িতে ঘন ঘন যেতাম কাঁচা মিষ্টি আমের লোভে; গেলেই মিষ্টি আম খেতে পেতাম | জব্বারও আমাদের বাড়ি এলে অন্য এক ধরনের আম খেতে পেত | মাঝারি ধরনের রঙ্গিন পাকা আমটি, যাতে অল্প আঁশ থাকত আর টিপে টিপে নরম করা যেত, তা আমরা মজা করে চুষে চুষে খেতাম | তখন বুঝেছি, আমাদের বাবা-মায়েরা আমাদের খুব আপন ভাবত | এখন ভাবি, তারা খুব শিক্ষিত না হলেও তাদের মন-মানসিকতা বড় উদার ছিল | তাদের নিজ নিজ ধর্ম অথবা সমাজের উঁচু-নীচু অবস্থান দিয়ে আমাদের বিচার করত না |

গ্রাম থেকে শহরে গেলাম কলেজে পড়তে | আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় আমাকে বাড়ি থেকে কলেজে যেতে হবে | এভাবে আমাদের গ্রামের দুজন কলেজে গিয়ে বি.এ পড়ছিল | ব্যাপারটা তাই অসম্ভব মনে হয়নি | আমাদের বাড়ি থেকে কলেজ ১৩ মাইল দূরে | ৯ মাইল ট্রেনে যেতে হবে | দু'মাইল হাঁটলে রেল ষ্টেশন; ট্রেনে ৯ মাইল গেলে শহর | সেখান থেকে ২ মাইল হাঁটলে কলেজ |

গ্রামের অনেক বন্ধুদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হবার তত সুযোগ রইল না | অনেকে এদিক ওদিক গিয়েছে | প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের বন্ধুদের সাথে ছাড়াছাড়ি হ'ল | এখন নতুন বন্ধু খুঁজতে হবে | তার সুযোগও এল | আমার জানাশোনা দু-চারজন ছাত্র ট্রেনে যেত | অপরদিক থেকে ট্রেনে প্রায় ১৫ জন অবাঙ্গালী (বিহারী) ছাত্র আসত | এদের মধ্যে ছ'জন আমার সাথে পড়ত | দুজন খুবই মিশুক ছিল | ওরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা বলত | আমাকে দেখলেই দোস্ত বলত | এই যাওয়া-আসার সময় আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয় | এই বন্ধুরা সাথে থাকার জন্য শহরে হাঁটার দীর্ঘ পথ সহজ মনে হতো ও প্রতিদিনের দীর্ঘ সময় সহজে চলে যেত | তখন বুঝেছি ধর্ম ও ভাষা বন্ধুত্বের জন্য বাধা হয় না |

যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাই, আবার সেই অবস্থা | পুরাতন বন্ধুরা সরে যায়, নতুন বন্ধু না পাওয়াতে একা একা মনে হয় | নতুন সহপাঠীরা কে কেমন তা জানতে হ'ল | যারা মিশতে চায়, তাদের সাথে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভবপর | সহপাঠীদের মধ্যে ধনী পিতামাতার সন্তানদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল | গ্রামে ও শহরে বড় হওয়ার মধ্যে যে তফাৎ আছে তাও দেখতে পেলাম |

বিশ্ববিদ্যালয়ের যে তিনতলা হলটিতে (ছাত্রাবাস) ছিলাম, তার প্রতি তলাতে দুটি অংশ ছিল | এক অংশে হিন্দু ছাত্র আর অন্য অংশে মুসলিম ছাত্রদের থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল | এজন্য আমরা বলতে গেলে পৃথক পৃথক ধর্ম নিয়ে একসাথে থাকতাম, বন্ধু হিসাবে একসাথে আড্ডা মারতে ও তাস খেলতে পারতাম | একসাথে ক্লাসে যেতে পারতাম | পরে জানতে পেরেছি যে এই হলের একই তলায় পৃথক পৃথক অংশে থেকে একসাথে চলাফেরার ব্যবস্থাটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এড়ানোর জন্য ছিল | এই বিচক্ষণতার কৃতিত্ব ঐ হলের প্রথম প্রাধ্যক্ষের প্রাপ্য ছিল | এ অধ্যাপকটি অসাম্প্রদায়িক ছিলেন | অত্যন্ত দুঃখজনক যে তিনি একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় শহীদ হয়েছেন |

বেশ কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটানোর সময় সমবয়সী এবং সমমনা অনেক বন্ধু পাওয়া গেল | তারা খুব ভাল বন্ধু হ'ল | তাদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাওয়া, তাদের বাড়িতে যাওয়া থেকে শুরু করে তাদের বিবাহেও যেতাম | পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্থানে কর্মরত অবস্থায় এ সম্পর্কের ভাঙ্গন আসেনি | একসাথে যারা পড়তাম, যৌথ ছবি তুলে আমাদের স্মৃতি বাঁচিয়ে রেখেছি |

কর্মরত অবস্থায় অনেকের সাথে দেখা হলেও খুব অল্পসংখ্যক বন্ধুতুল্য লোক পাওয়া যায় | এখানকার পরিবেশ অত্যন্ত জটিল | কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সমবেতভাবে কাজ

করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় | কারো সাথে যাতে দুর্ব্যবহার করা না হয় তার জন্য নীতিমালা থাকে | হয়রানি করার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকে | উঁচু-নীচু পদবীর জন্য সাবধানে কথাবার্তা বলতে হয় | এর সাথে থাকে পদোন্নতি ও ভাল মূল্যায়ন পাওয়ার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা | এখানে সামনাসামনি প্রশংসার সাথে পশ্চাতে অন্যের হিংসা, অপবাদ বা সমালোচনা চলা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার | হয়তো বা এসব কারণে কর্মস্থান ত্যাগের পর প্রাক্তন সহকর্মীদের সাথে পেশাগত ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন কারণে যোগাযোগ করা হয় না | তবে যারা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বজায় থাকাটা বিরল নয় |

শিশুকালে আমাদের যে বন্ধুর অভাব ছিল না তা প্রথমেই বলেছি | বন্ধুর অভাব হলে ছোট ছেলেমেয়েরা বুদ্ধি করে বন্ধু খুঁজে নেয় | এটা আমাদের বড় ছেলেকে করতে দেখেছি | যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর তাকে একটা প্লাস্টিকের তিন চাকার সাইকেল কিনে দিয়েছিলাম | সে তা একা না চালিয়ে অন্যকে চালাতে দিত, আর নিজে পিছন থেকে ঠেলত | আমরা মনে মনে রেগে যেতাম আর তাকে বোকা ভাবতাম | এখন বুঝতে পারি, নতুন জায়গায় বন্ধু পাওয়ার জন্য সে একাজ করেছিল | পরে তার বন্ধুর অভাব ছিল না দেখে আমরা বরং খুশী হয়েছি | এটা সত্য যে বন্ধুত্বের জন্য প্রথমে বিশ্বাসযোগ্য হতে হয় এবং কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয় |

ভাষা না জানলেও যে শিশুরা বন্ধু হতে পারে তার প্রমাণও প্রথম সন্তানের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলাম | সে সবেমাত্র বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে | একই সময় আমার এক সহকর্মী ইস্রায়েল থেকে সমান বয়সের দুটি জমজ সন্তান নিয়ে এসেছেন | একদিন তাঁর প্রস্তাবে আমরা একটি বড় পার্কে বেড়াতে গেলাম | সেখানে যাওয়ার পর আমাদের সন্তানদের কিছু বলার দরকার পড়েনি, ওরা তিনজন একটা বল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল | দু'ঘন্টা ধরে তারা খেলল, হাসল আর নিজের নিজের ভাষায় কথা বলল | ভাষা ভিন্ন, দেখতেও ভিন্ন, তাতে তাদের কোনই সমস্যা হয়নি |

সন্তানদের মাধ্যমে পিতা-মাতাদেরও বন্ধুত্ব হতে পারে | এক স্থানে আমরা চারটি বাঙ্গালী পরিবার থাকতাম | তাদের সন্তানরা হাইস্কুলে পড়ত | আমাদের এক ছেলে তাদের সমবয়সী ছিল | ওরা নিজেরা বন্ধু হয়ে যায় | ওদের উৎসাহে চারটি পরিবার ছুটিতে একসাথে এখানে সেখানে যাওয়া শুরু করি | মাসে মাসে একসাথে আড্ডা জমাই | এতে বয়স্করা এবং সন্তানরা সবাই ঘনিষ্ঠ হই | আমাদের সন্তানরা এখন বড় হয়েছে; আমাদের ও সন্তানদের মধ্যে সে বন্ধুত্ব এখনও বিদ্যমান |

দেশে ও বিদেশে আমরা অনেকেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকি | বৃহৎ সমাজে বহু ধরনের লোক থাকে | উদাহরণস্বরূপ, ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ব্যবসায়ী-চাকুরিজীবী, যারা চিন্তাধারা বা আচরণে তাদের ভিন্নরূপ প্রকাশ করে | এক্ষেত্রে সমাজের আকার বড় হেতু সমমনা লোকেরা নিজেদের উপদল গঠন করে এবং নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করে | অনেক সময় এ ধরনের বন্ধুত্বেও ভাঙ্গন আসে | এটা ঘটে সাধারণত মতের ভিন্নতা, আচরণে হীনমন্যতা, পারস্পরিক সম্মান রক্ষণ না করার কারণে |

অতীতে বন্ধুর সংখ্যা এত বেশী ছিল যে তাদের অভাব অনুভব করিনি | বয়স বেড়ে যাওয়ায় এখন বন্ধু বলতে পুরনো যারা আছে তারাই | গুণে দেখলে তাদের সংখ্যা এখনও অনেক | অনেক সময় এইসব বন্ধুদের ফোন করলে পাওয়া যায় না | নাম ও ফোন নম্বর রাখলে ফোন আসে না | অনেকে আবার নানা কারণে যোগাযোগ করতে পারে না | এসব কারণে পুরনো বন্ধুদের সাথে কথাবার্তাও অনেক কমে গেছে | নতুন বন্ধুত্বও আর করা হয় না | সুযোগ এলেও বন্ধুত্ব করার সাহস পাই না | অতীতে যেসব বন্ধুরা ছিল, তাদের অনেককে হারিয়েছি | বাকী বন্ধুরাও ক্রমে ক্রমে ভুলতে চাইছে বা হারিয়ে যাচ্ছে |...

কোদন্ড গ্রহে কুকুন্ড ভাইরাস

শেলী শাহাবুদ্দিন

কোদন্ড গ্রহে কুকুন্ড ভাইরাসের আক্রমণ ঘটে তিন হাজার বারো'শ কোদন্ড সালে | যে কোন কোদন্ড মানুষ কাছাকাছি হলেই এই ভাইরাস একজনের দেহ থেকে আর একজনের দেহে লাফিয়ে চলে আসে | শরীরের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বিকল করে মানুষটিকে মেরে ফেলে | কারো কারো মস্তিস্ক আক্রান্ত হয় | তাদের অবস্থা হয় ভয়াবহ! তারা পাগল হয়ে যায়, এবং ভাইরাসের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় | এসব মানুষ ভাইরাসের নির্দেশে কাজ করতে থাকে | তারা অন্য মানুষকে আক্রমণ করে, এবং গায়ের জোরে রক্তাক্ত থুথু ছিটিয়ে অন্য মানুষের দেহে ভাইরাস ঢুকিয়ে দেয় | এইভাবে কিছুদিন ভাইরাসের দাস হিসাবে কাজ করে করে একসময় তারাও মারা যায় | কিন্তু এই শ্রেণীর ভাইরাস নিয়ন্ত্রিত মানুষের কারণে কোদন্ড গ্রহে মহামারী নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় |

কোদন্ড গ্রহের সর্বোচ্চ নেতা শিখরপ্রধানের আদেশে দোকানপাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, ইত্যাদি সবই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল | সকল ধরনের সমাবেশ, খেলাধুলা, ভ্রমণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল | খোলা রাখা হয়েছিল শুধু জরুরি সেবা ব্যবস্থা – যেমন হাসপাতাল, পুলিশ, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, খাবার ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ | কিন্তু যেসব মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে, তারা এসব নির্দেশ অমান্য করে | এমনকি কোদন্ড গ্রহের কোন কোন অঞ্চলে তারা এসব নির্দেশের বিরুদ্ধে দলে দলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে | অনেক সুস্থ মানুষও বিভ্রান্ত হয়ে বা তাদের আক্রমণের ভয়ে বিদ্রোহে যোগ দেয় | ফলে কোদন্ড গ্রহে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে | উপরন্তু কোদন্ড গ্রহের উপাসনালয়গুলি স্বাস্থ্যবিধি মানতে অস্বীকার করে | প্রতিটি উপাসনালয়ে প্রতিদিন দু'বেলা শত শত লোক একত্রিত হয়ে ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাতে থাকে | শিখরপ্রধান উপাসনালয়ের নেতাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য প্রথমে অনুরোধ, তারপর অনুনয়-বিনয়, এবং সর্বশেষে তিরস্কার করেন | কিন্তু কোন লাভ হয় না | শিখর-প্রধান বলপ্রয়োগ করতে পারতেন | কিন্তু অনেক কিছু চিন্তা করে তিনি সে পথ থেকে বিরত রইলেন | উপাসনালয়গুলি কোদন্ড গ্রহের প্রধান সমস্যা | তাদের প্রচন্ড ক্ষমতা | বহু শতাব্দী ধরে সমাজ নিয়ন্ত্রণের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করার ফলে উপাসনালয়গুলির মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের লোভ জাগে | সবার অলক্ষ্যে দশকের পর দশক তারা গোপনে সামরিক শক্তি অর্জন করে | তাদের স্বপ্ন কোদন্ড গ্রহের সাম্যবাদী গণতন্ত্র ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে ধর্মীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা | তাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা শিখরপ্রধান যখন জানলেন, তখন একটু দেরি হয়ে গেছে |

গোয়েন্দা প্রতিবেদন এই যে, বিগত বছরগুলিতে উপাসনালয়গুলি হাজার হাজার জঙ্গি সংগঠন গড়ে তুলেছে | হাজার হাজার ধর্মীয় বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রহবিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করা হয় | সেখানে ইতিহাস বিকৃত করে পড়ানো হয় | বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্প সাহিত্য সেখানে নিষিদ্ধ | সেখানে ঈশ্বরপ্রেম, মানবপ্রেম, জীবে প্রেম, দয়া, ভক্তি, ন্যায়-নীতি, ও সকল মানবিক প্রবৃত্তিকে উপহাস করা হয় | শেখানো হয় নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা, অনিয়ন্ত্রিত সম্ভোগ, নির্যাতন কৌশল, দাসপ্রথা, দাস মনোবৃত্তি, পাপ-পুণ্য, এবং সর্বোপরি 'ভয়' | প্রতিটি মানুষ পরস্পরকে ভয় ও অবিশ্বাস করতে শেখে | পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, ইত্যাদি সকল সম্পর্ককে ভয় নিয়ন্ত্রিত ও ধর্মপ্রধানদের অধীনস্থ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় | ঈশ্বরপ্রেমও তাই নিষিদ্ধ | সৃষ্টিকর্তাকে শুধু ভয় করতে হয় |

সর্বশেষ গোয়েন্দা প্রতিবেদন শুনে শিখরপ্রধান আরো চিন্তিত হয়ে পড়লেন | ধর্মপ্রাণ শিক্ষার্থীদের গ্রহবিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করার জন্য ধর্মীয় বিদ্যালয়গুলিতে স্নায়ু নিয়ন্ত্রণকারী ঔষধ ও প্রবল নিয়ন্ত্রণ তরঙ্গ (যেসব ঔষধ ও তরঙ্গ গোপন ধর্মীয় গবেষণাগারে আবিষ্কৃত) দ্বারা মানসিকভাবে শক্তিশালী রোবটে পরিণত করা হচ্ছে | ভার্চুয়াল যন্ত্রকৌশলের মাধ্যমে তাদেরকে হত্যাকার্যের পুরস্কারস্বরূপ স্বর্গীয় সম্ভোগের আনন্দ শেখানো হয় | উপাসনালয়গুলিতে ধর্মপ্রাণ মানুষদের নানা ধরনের প্রলোভন দেখানো হয় | যেমন গ্রহবিদ্রোহ সফল হলে উপাসনালয়গুলির ধনাগার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তাদের যাবজ্জীবন অনিয়ন্ত্রিত সম্ভোগের অধিকার দেওয়া হবে | দৈহিক সম্ভোগের জন্য তাদের প্রত্যেকের জন্য বিশাল বাগানবাড়ি থাকবে | সেসব বাগানবাড়িতে সম্ভোগের

উপাদান, পরিমাণ ও গুণাগুণ কোদন্ড গ্রহের যে কোন সম্রাটের প্রাসাদের তুলনায় বহুগুণ শ্রেষ্ঠ হবে|

এইভাবে এই বিদ্যালয়গুলি থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ দয়া-মায়াহীন, বিবেকবর্জিত, ন্যায়-অন্যায় বোধবর্জিত, সম্ভোগপ্রবণ ভয়াবহ যন্ত্রদানব তৈরী হয়ে কোদন্ড গ্রহের দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে| তারা কোদন্ড গ্রহের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়| মহামারী সেই অবস্থাকে আরো জটিল করে তোলে|

এই সমস্ত তথ্য নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে শিখরপ্রধান তখন উপাসনালয় বন্ধ করা থেকে বিরত থাকলেন| কিন্তু তিনি হাল ছাড়লেন না| একদিকে তিনি অবশ্যম্ভাবী গ্রহবিদ্রোহের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন| অন্যদিকে তিনি ধর্মীয় নেতাদের সংশোধন ও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে লাগলেন| তাদের সাথে তিনি বহুদিন ধরে আপোষের চেষ্টা করতে লাগলেন | তাদের যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন | কেউ কেউ তাঁকে সহযোগিতা করতে চেষ্টা করল | কিন্তু পুরোহিতদের অন্যতম প্রধান 'বিহাও' তাঁকে সব ক্ষেত্রে বাধা দিতে লাগল | বিহাও ছিল ধর্মীয় একনায়কত্ববাদের প্রধান প্রবক্তা | তার প্রচার ছিল এই যে, কোদন্ড গ্রহে সৃষ্টিকর্তার আইন ছাড়া অন্য কোন আইন চলবে না| তাই সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি হিসাবে কোদন্ড শাসন

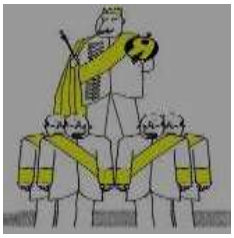

করবে পুরোহিতরা | বিহাও তাই প্রচার করতে শুরু করে যে মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে কোদন্ড শাসনের ব্যবস্থা থাকার ফলেই ঈশ্বর এই মহামারী পাঠিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে চাইছেন| মহামারী প্রতিরোধের জন্য যে সব জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম নেওয়া হয়েছিল, বিহাও পুরোহিতের নির্দেশে বেশিরভাগ পুরোহিত তা লঙ্ঘন করতে লাগল | যেমন তারা নিঃশ্বাস সুরক্ষার যন্ত্র ব্যবহার করত না| পরিষ্কার-পরিছন্ন থাকার কোন নিয়ম তারা মানত না | সকল ধরনের জমায়েত নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তারা ধর্মীয় সভার নামে সর্বত্র প্রতিদিন গণ-জমায়েত করতে থাকে| ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ পুরোহিতদের প্রতি ভক্তির কারণে তাদের কথামতোই চলতে লাগল | ফলে কোদন্ড গ্রহের মহামারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার উপক্রম হ'ল| ধর্মীয় নেতারা ও তাদের সমর্থক রাজনৈতিক সহযোগীরা উপাসনালয়গুলিতে অনিয়ন্ত্রিত জনসমাগম বাড়াবার জন্য ধর্মের নামে নিত্য নতুন উস্কানিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে থাকে | ফলে উপাসনালয়গুলি কুকুন্ড ভাইরাসের সূতিকাগারে পরিণত হ'ল | ভাইরাসের আক্রমণে হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালগুলিতে এমন ভীড় করতে লাগল যে সকল হাসপাতাল উপচে পড়তে লাগল | তখন মৃত্যুমুখী রুগীদের আত্মীয়-স্বজনরা রোগী ভর্তি করতে না পেরে চিকিৎসক, সেবিকা ও অন্যান্য হাসপাতাল কর্মীদের আক্রমণ করা আরম্ভ করল| গ্রহের আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল| এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হ'ল | কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কোদন্ড গ্রহের অধিকাংশ হাসপাতালের চিকিৎসক ও সেবিকারা মারা গেল – কিছু ভাইরাসের হাতে, অন্যরা মানুষের হাতে | অন্যান্য কর্মীরা প্রথম সুযোগেই পালাল | কিন্তু চিকিৎসক ও সেবিকারা তাদের শপথের কারণে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের প্রাণরক্ষা করবার চেষ্টা করে নিজেরা প্রাণত্যাগ করল| অতি নগণ্যসংখ্যক চিকিৎসক ও সেবিকা তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং পালিয়ে আত্মগোপন করে | কিন্তু ভাইরাস তাদের পিছু পিছু যায় | তারা অধিকাংশই ভাইরাসের হাতে প্রাণত্যাগ করে | তখন চিকিৎসায় বা বিনা চিকিৎসায় মরতে থাকা মানুষদের সৎকার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে | এ অবস্থায় প্রথমে গণকবর খুঁড়ে মৃতদের মাটি চাপা দেওয়া হতে থাকে| একসময় যত্র-তত্র মৃতদেহ ফেলে রেখে মানুষ পালাতে থাকে| শুরু হ'ল লুঠতরাজ – প্রথমে ছিল খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য | হঠাৎ অস্ত্রের দোকানগুলি লুঠ হওয়া শুরু হ'ল| অস্ত্রধারী মানুষ অন্য মানুষকে কুকুন্ড ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহ করে মেরে ফেলতে শুরু করল| যারা এভাবে অস্ত্রের জোরে বেঁচে রইল, একসময় তারাও অস্ত্র হাতেই ভাইরাসের হাতে মারা গেল| অনেকে গাড়ি বোঝাই খাদ্য নিয়ে লোকালয় ছেড়ে পালাল | শহর থেকে গ্রামে, সেখান থেকে বনে, পাহাড়ে, মরুভূমিতে – যেখানে মানুষ নেই, সেখানে| কেউ কেউ নৌকাভর্তি খাদ্য নিয়ে নদীতে ভেসে পড়ল| নদী থেকে সাগরে | কিন্তু অদৃশ্য কুকুন্ড ভাইরাস কাউকে ছাড়ল না | অস্ত্রের জোরে যারা এতদিন বেঁচে ছিল, তাদের কারো কারো শরীরে রয়ে যায় ঘুমন্ত ভাইরাস| একসময় মানুষের অলঙ্ঘনীয়

শারীরিক বা মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা আবার আক্রমণ করে। হত্যা করে। শহর ও গ্রাম জনহীন হয়ে পড়ে।

আশ্চর্য মানুষের জীবন! এত বড় বিপর্যয়ের পরেও ভাইরাসআক্রান্ত নগণ্যসংখ্যক বেঁচে যাওয়া মানুষ শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লাভ করে। তারা কোনোক্রমে বেঁচে থাকে। কিন্তু কোদন্ড গ্রহ জনহীন হয়ে যাওয়ায় তারা জীবন সংগ্রামে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা একা। অল্প কিছু মানুষ, হয়তো দুই বা তিনজনের একটি বেঁচে যাওয়া পরিবার। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। কোদন্ড গ্রহে যে আরো মানুষ বেঁচে আছে, তা তারা জানে না। উৎপাদন ব্যবস্থা না থাকায় প্রথমে খাদ্যসংকট এই বেঁচে থাকা মানুষদের প্রধান সংকট হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে এই সংকটে মারা যায়। যারা আদিম মানুষের মতো ফলমূল আহরণ করে বা শিকার করে খাদ্য জোগাড় করতে সমর্থ হয়, তারা বেঁচে থাকে।

তখন শুরু হয় নতুন বিপদ! ইতিমধ্যে জনহীন পৃথিবীতে সব ধরনের প্রাণীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। কুকুন্ড ভাইরাস তাদের অধিকাংশ প্রজাতিকে আক্রমণ করতে অক্ষম। একদিকে বাড়ে তৃণভোজী প্রাণী, অন্যদিকে বাড়ে মাংসাশী হিংস্র প্রাণী। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, সর্বত্র। যাদের কাছে অস্ত্র আছে, তারা অস্ত্র দিয়ে কিছুদিন আত্মরক্ষা করে। একসময় তাদের অস্ত্রের গুলি শেষ হয়ে যায়। লাঠি, বল্লম, ছোরা দিয়ে মানুষ যদি বা বহুকষ্টে কোন তৃণভোজী প্রাণী শিকার করে, তখন অজস্র মাংসাশী হিংস্র প্রাণী সেই খাদ্যের লোভে মানুষকেই আক্রমণ করে। কোদন্ড মানুষ যেন আদিম পৃথিবীতে বাস করা শুরু করে। পর্যাপ্ত তৃণভোজী প্রাণী থাকায় বাঘ, সিংহ জাতীয় প্রাণীকে বিরক্ত না করলে তারা মানুষকে আক্রমণ করে না। কিন্তু হায়েনা, শেয়াল, বুনো কুকুর জাতীয় প্রাণী অন্যের শিকার কেড়ে নিতে পছন্দ করে। সংখ্যায় তারা এখন অগণিত। দুর্বল মানুষ পেলে তারা তাদেরকেই শিকার হিসাবে আক্রমণ করে। কোদন্ড গ্রহে মানুষ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাণীতে পরিণত হয়।

দুই

কোদন্ড গ্রহের ঘুগণ শহরে সরকারী তামাং হাসপাতাল যখন পরিত্যক্ত হয় তখন মরণাপন্ন রুগীদের মধ্যে অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় মৃতপ্রায় 'দিয়াও'। কুকুন্ড তাকে মারতে পারেনি পরিবর্তে তার শরীরে কুকুন্ড ভাইরাসের প্রতিষেধক তৈরী হয়েছে। খুব কমসংখ্যক মানুষ এই প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে। সেকথা দিয়াও জানে না। বহুদিন রোগে ভুগে, অধিকাংশ সময় অজ্ঞান অবস্থায় থাকার পর হঠাৎ একদিন সকালে দিয়াও এই জনহীন হাসপাতালের এক নিস্তব্ধ কক্ষে নিজেকে আবিষ্কার করে। সারি সারি বিছানা। তার পাশে অজস্র যন্ত্রপাতি, কিন্তু কোথাও কোন মানুষ নেই; যন্ত্রগুলিতেও কোন প্রাণ নেই।

"কে আছেন, আমাকে একটু পানি দেবেন?" সে ক্ষীণকণ্ঠে সাহায্যের জন্য ডাকে। কিন্তু বারবার ডাকার পরও দিয়াও কোন উত্তর, বা কোন মানুষের দেখা পায় না। তখন তার সন্দেহ হয় যে সাহায্য করার কেউ নেই এখানে, সে একেবারে একা। তার একটু ভয় ভয় করে। কিন্তু তার প্রচন্ড পিপাসা। এদিক সেদিক তাকিয়ে সে তার বিছানার পাশেই এক বোতল পানি দেখতে পায়। পানি খাওয়ার পর তার শরীরে ক্ষুধার উদ্রেক হয়। কোথায় খাবার? রুগ্ন তরুণ দিয়াও নির্জন ঘরে চারিদিকে তাকিয়ে কোথাও কোন খাবার দেখতে পায় না।

কুকুন্ডজয়ী এই তরুণের দেহমনে একটি দুর্লভ ও মূল্যবান বৈশিষ্ট্য ছিল। তার ছিল অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও বেঁচে থাকার দুর্লভ প্রতিভা। একদল ডাকাত মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাকে তার মা-বাবার কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে যায়। ওই জীবনে তাকে অনেক নির্যাতন সইতে হয়, যার অন্যতম ছিল যৌন নির্যাতন। শারীরিক নির্যাতন সে অবলীলায় সইতে শিখে যায়। নিহি নামের এক বিচিত্র যুবতীর ওপর ছিল তার প্রাথমিক প্রশিক্ষণের ভার। প্রথম দু'তিন বছর সে দিয়াওকে সকাল বিকাল বেত্রাঘাত করে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু চতুর্থ বছর থেকে সে দিয়াওর ওপর নানা রকম পরীক্ষা চালাতে শুরু করে। কোন কোন দিন সে দিয়াওর দু'হাত বেঁধে তাকে এমনভাবে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখে যে দিয়াও কোনোরকমে পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে মাটির নাগাল পায়। তার হাতের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অসহ্য যন্ত্রণায় কাঁদতে কাঁদতে একসময় দিয়াও অচেতন হয়ে যায়। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে তার হাতে গ্যাংগ্রিন হয়ে যায়; বাঁহাতের একটি আঙ্গুল কেটে ফেলতে হয়। এই ঘটনার পর ডাকাত সর্দারের নির্দেশে তার ঝুলিয়ে রাখার শাস্তি বন্ধ হয়। নিহি তখন নতুন পরীক্ষায় হাত দেয়। শীতের দিনে খুব ভোরে সে দিয়াওকে জাগিয়ে তাকে নগ্ন করে দাঁড় করিয়ে রাখে। প্রচন্ড শীতে দিয়াও কাঁপতে থাকে। নিহি বসে বসে

আগ্রহ সহকারে দিয়াওর কম্পমান নগ্ন দেহ দেখে | একসময় দিয়াও অপমানে কেঁদে ফেলে | নিহি তখন দিয়াওকে জোর করে তার কোলে বসিয়ে আদর করতে থাকে | নিহির শরীরের উষ্ণতায় বা আরো কোন দুর্বোধ্য কারণে দিয়াও এক বিভ্রান্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হয় | সে নিহিকে জড়িয়ে ধরতে চায় | কিন্তু একই সাথে নিহির প্রতি ঘৃণায় সে কুঁকড়ে থাকে; মনে হয় সে এক সুন্দরী ডাইনির কোলে বসে আছে | সে ছুটে পালাতে চায়, তবু তার মনে ইচ্ছে হয় যেন নিহি তাকে এইভাবে দীর্ঘক্ষণ জড়িয়ে থাকে | তার মনের বিভ্রান্তি সে বুঝতে পারে না | ভয়ে সে নিহির কোলে বসেই কাঁদতে থাকে, যতক্ষণ না নিহি তার কান্নায় বিরক্ত হয়ে তাকে ঠেলে ফেলে উঠে দাঁড়ায় |

একসময় নিহির শাসনকাল শেষ হয় | কিন্তু অন্যান্য ডাকাতের যৌন নির্যাতনে সে গভীর মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে | প্রতি রাতে সে দুঃস্বপ্ন দেখে – এক বিশাল কালো কঠিন বস্তু তাকে লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে | ভয়ে তার বাকরুদ্ধ হয় | সে সেই অতিকায় অন্ধকারের নিচে নিষ্পেষিত হতে থাকে | তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে; প্রাণপণে শ্বাস নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে সে চিৎকার করে জেগে ওঠে | কিন্তু সব রকমের অত্যাচার করেও ডাকাতরা তার প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করতে পারে না | তার এই উনিশ বছরের জীবনে তাকে বহুবার বহু ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হতে হয় | বহুবার সে মরতে মরতে বেঁচে যায় | এইভাবে সে লড়াই করতে শেখে | ডাকাতরা তাকে নানারকমের অস্ত্রচালনাও শেখায় | সব ধরনের মারামারিতে সে পারদর্শী হয়ে ওঠে | কিন্তু এই জীবনে তার সব চাইতে বড় ছিল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন | বিপদের সম্ভাবনা সে অগ্রিম টের পায় | সম্ভবত তার স্বাভাবিক মেধার সাথে অত ছোটবেলা থেকে বিপজ্জনক জীবনের অভিজ্ঞতা তার মধ্যে এই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা সৃষ্টি করে | মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ার পরে ডাকাত দলের কেউ তাকে হাসপাতালে ফেলে রেখে চলে যায় | তারা তখন নিজেরাও মরছে |

ক্ষুধায় দিয়াও কাতর বোধ করে | খাবারের খোঁজে সে একটু কষ্ট করে উঠে দাঁড়ায় | সে তার দুপাশের বিছানাগুলির আশেপাশে খুঁজতে খুঁজতে এক প্যাকেট বিস্কুট পায় | গোগ্রাসে বিস্কুট খেয়ে তার ক্ষুধা আরো বেড়ে যায় | আরো কয়েকটা বিছানা খুঁজে সে কিছু পনির পায় | পনির আর পানি খেয়ে সে পাশের ঘরে ঢোকে | সেটা একটা নার্সিং স্টেশন | সেখানে সে যেন একটা সোনার খনি আবিষ্কার করে | কয়েক বাক্স 'চকলেট'! নিজের বিছানায় ফিরে গিয়ে পেট ভরে চকলেট খেয়ে চকলেটের বাক্সগুলি বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে ক্লান্ত দিয়াও ঘুমিয়ে পড়ে |

ঘুম ভাঙে দুপুরে | আবার পানি আর চকলেট খেয়ে সে চিন্তা করতে থাকে | দিয়াও ধরে নেয় যে এখন এই বিশাল হাসপাতালে সে একা | একা মানুষ এই গ্রহে এখন নিরাপদ নয়, সেকথা সে বুঝতে পারে | কিন্তু তার বিপদ কোনদিক থেকে আসবে তা তার জানা নেই | মহামারীসৃষ্ট এই অবস্থার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা তার নেই | তার মাথার ভেতরে রাশি রাশি চিন্তা ঘুরপাক খায় | সে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী একটা করণীয় তালিকা তৈরী করে |

১. খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ
২. নিরাপত্তার ব্যবস্থা
৩. ঔষধ ও প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম সংগ্রহ
৪. পরনের পোশাক ও শীতবস্ত্র সংগ্রহ
৫. তথ্য সংগ্রহ
৬. মানুষের সন্ধান

দেরি না করে দিয়াও অবিলম্বে কাজে নেমে পড়ে | রাত হওয়ার আগে তাকে আরো কিছু খাবার সংগ্রহ করতে হবে | এঘর ওঘর করে সে কিছু শুকনো খাবার এবং ফল আবিষ্কার করে | কিছু ফল নষ্ট হয়ে গেছে; ভাল ফলগুলি সে একটি ব্যাগে ভর্তি করে নেয় | একটা ঘরে সে ডাক্তার-নার্সদের ব্যবহার্য কিছু পোশাক পায়; সেগুলি হালকা, আরামদায়ক পোশাক | ঘরে পরা আর ঘুমোনোর জন্য সেগুলি যুৎসই | সে তার নিজের মাপমতো ছ'প্রস্থ পোশাক বেছে নেয় | তার খুব আনন্দ হয় যখন সে নিজের পায়ের মাপে এক জোড়া ভাল জুতো পেয়ে যায় | এরপর সব নিয়ে সে নিজের ঘরে ফিরে আসে | রুগ্ন শরীরে এই পরিশ্রমেই সে খুব ক্লান্ত বোধ করে | উপরন্তু ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে | সে সুইচ টিপে আলো জ্বালাতে চেষ্টা করে | বুঝতে পারে যে এই মৃত শহরে কোন বিদ্যুৎ নেই | বুঝতে পারে পুরোপুরি অন্ধকার নামার আগেই তাকে রাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে | সে বাথরুমে প্রবেশ করে | নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে, কারণ পানির সরবরাহ তখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে | বহুদিন তার গোসল করা

হয়নি | কিন্তু তার শরীর দুর্বল | ঘুগণ অঞ্চলে এখন সন্ধ্যার দিকে অল্প শীত, ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে | দিয়াও তাই কোনরকমে ঠান্ডা পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নেয় | নিজের বিছানায় বসে কিছু ফল ও শুকনো খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ে | চকলেট আর টিনের খাবারগুলি যত্ন করে রেখে দেয় পরে খাওয়ার জন্য | কম্বল মুড়ি দিয়ে ভাবতে ভাবতে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে |

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে দিয়াও আগের চাইতে ভাল বোধ করে | আগের মতো দুর্বল মনে হয় না নিজেকে | হাতমুখ ধুয়ে এবারে সে কিছু বিস্কুট আর একটা চকলেট খেয়ে নেয় | তার পরিকল্পনা অনুযায়ী চার নম্বর জিনিসের সাময়িক ব্যবস্থা হয়েছে; তার মানে প্রথম তিনটি জিনিস সংগ্রহ করা এখন খুবই প্রয়োজন | দিয়াও তার এই ছোট্ট জীবনে বহু বিপদ অতিক্রম করার ফলে বিপদে কীভাবে চিন্তা করতে হয়, সেটা ভাল করে শিখেছে | খাবারের সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করে সে ঠিক করে যে হাসপাতালের রান্নাঘর আবিষ্কার করতে পারলে এই সমস্যার সহজ ও দ্রুততম সমাধান হয়ে যাবে | হাসপাতালের বাইরেও খাবার পাওয়া যাবে | কিন্তু তার পর সেখানে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে সে জানে না | খাবার, না অজানা বিপদ, কে জানে!

এই বিশাল হাসপাতালে রান্নাঘর খুঁজে বের করা বোধহয় সহজ হবে না | কিন্তু এ ধরনের হাসপাতালের প্রতিটি ফ্লোরের দেওয়ালে ফ্লোরপ্ল্যানসহ একটি নির্দেশিকা থাকে | দ্বিতীয়তঃ হাসপাতালের নিচের তলায় বা বেসমেন্টেই রান্নাঘর থাকার সম্ভাবনা বেশি | ইতিমধ্যে দিয়াও অনুমান করেছে যে হাসপাতালটা নয় বা দশতলা উঁচু | তার নিজের অবস্থান মাঝামাঝি | বিদ্যুৎ না থাকায় লিফ্ট চলার কোন উপায় নেই | তাকে চার বা পাঁচতলা সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে হবে | এই দুর্বল শরীর নিয়ে নামতে পারলেও উঠে আসা কষ্টকর বা অসম্ভব হবে | সে তার দুই পকেটে কিছু বিস্কুট আর চকলেট নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করে | কিছুক্ষণ নেমে হাঁপায় | একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার নামে | এইভাবে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট পরিশ্রম করে দিয়াও নিচের তলায় পৌঁছায় | আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সে নির্দেশিকা খুঁজে বের করে | নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রায় কুড়ি মিনিট খোঁজাখুঁজি করে সে রান্নাঘর আবিষ্কার করে |

আবিষ্কারই বটে! হাসপাতালের রান্নাঘর আসলে একটা ডিপার্টমেন্ট | সেখানে হিমঘরে একজন মানুষের জন্য কমপক্ষে ছ'মাসের খাবার মজুদ আছে | অবশ্য বিদ্যুতের অভাবে অনেক খাদ্য নষ্ট হবে | কিন্তু চাল, ডাল, চিনি, ময়দা, গুঁড়ো দুধ, সিমের বিচি, ইত্যাদি শুকনো খাদ্য উপাদান যা আছে, তাতে তার এক বা দু'মাস অনায়াসে চলে যাবে | মৃত্যুভয়ে মানুষ অনেক রান্না খাবার এবং তৈরী খাবার (যেগুলি শুধু গরম করে নিলেই খাবার উপযুক্ত হয়ে যায়) রান্নাঘরের রেফ্রিজারেটরে রেখে পালিয়ে গেছে | বিশাল সে সব যন্ত্র | এছাড়া ডিপ ফ্রিজে অনেক হিমায়িত কাঁচা খাবার রয়েছে | যেহেতু বিদ্যুৎ নেই, সে জন্য দিয়াও এই খাবারগুলি প্রথমে খরচ করার সিদ্ধান্ত নিল | এগুলি বেশিদিন ভাল থাকবে না | কোনো উপায়ে আগুন জ্বেলে তাকে রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে | আর তার আগে রান্না খাবার, যেগুলি ভাল আছে, সেগুলি খেতে হবে | শুকনো খাবারগুলি সে পরে খাবার জন্য রেখে দেবে |

যে ঘরে ডাক্তার ও নার্সদের পোশাক পাওয়া যায়, সে ঘর থেকে দিয়াও কিছু কাগজ ও কলম সংগ্রহ করে | সে ঘরে একটা পুরনো ব্যাকপ্যাকও পেয়ে যায় | ব্যাকপ্যাকে সে কাগজ কলম ভরে নেয় | আর একটি মূল্যবান জিনিস সে রান্নাঘরে পেয়ে যায় | কয়েকটা ছুরি, এবং একটা টুল বাক্স | এগুলি এখন তার কাছে মহা মূল্যবান জিনিস | এগুলিও সে ব্যাকপ্যাকে ভরে নেয় | কিছু তৈরী খাবার সে রান্নাঘরের টেবিলে বসে পেটপুরে খেয়ে নেয় | ক্লান্তিতে তার ঘুম আসে, টেবিলে মাথা রেখে বসেই অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে নেয় |

যখন ঘুম ভাঙে তখন প্রায় দুপুর হয়ে গেছে | এদিক সেদিক খুঁজে সে কিছু বড় বড় ট্র্যাশ ব্যাগ পেয়ে যায় | একটা ব্যাগ ভর্তি করে সে ফ্রিজ থেকে দুদিনের খাবার আর পানির বোতল নিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করে | দুর্বল শরীরে এখন এ কাজটা তার জন্য ভয়াবহ কঠিন হয়ে দাঁড়ায় | তাকে একটু পর পর থেমে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে | পানি খেতে হচ্ছে | এভাবে প্রায় একঘন্টা পরিশ্রম করে বিধ্বস্ত অবস্থায় প্রায় টলতে টলতে সে ঘরে ফিরে আসে | এসেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে | সে রাতে তার আর খাওয়া হয় না |

তিন

তৃতীয় দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে দিয়াও

একটু ভাল করে খেয়ে নেয় | তালিকা অনুযায়ী প্রথম প্রয়োজনের সাময়িক সমাধান হয়ে গেছে | তাকে এখন পরবর্তী বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিতে হবে|

দ্বিতীয় বিষয় ছিল নিরাপত্তা | অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাকে তার বর্তমান অবস্থানের নিরাপত্তা বুঝতে হবে | সে হাসপাতালের ছাদে ওঠার পরিকল্পনা করে | ছাদ থেকে চারিদিকে যতদূর দেখা যায়, দেখে পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝতে হবে | তাকে নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে | কিন্তু দুর্বল শরীরে চার বা পাঁচতলা সিঁড়ি ভেঙে কাজটা যে সহজ হবে না তা সে ইতিমধ্যে টের পেয়েছে | আগের দিনের মতো থেমে থেমে প্রায় একঘন্টা সময় নিয়ে অবশেষে হাসপাতালের ছাদে ওঠে সে| সে নিশ্চিত হয় যে এই ভবনটি দশতলা|

হাসপাতালের বিশাল ছাদ | একদিকে দাঁড়ালে অন্যদিকে কাছাকাছি কোন কিছু দেখার উপায় নেই | শুধু খুব উঁচু দালানগুলির মাথা দেখা যায় | পরিকল্পনা অনুযায়ী দিয়াও একদিক থেকে শুরু করে হাসপাতালের চারিদিকে যতদূর চোখ যায় দেখতে শুরু করে | একই সাথে কাছাকাছি স্থাপনা ও রাস্তাগুলির সে একটি মোটামুটি মানচিত্র এঁকে রাখে | ব্যস্ত না হয়ে শান্তমনে ধীরে ধীরে সে তার কাজ করে যায়|

ঘুগণ শহরের বিশাল বিশাল দালানকোঠা দাঁড়িয়ে আছে আগের মতোই | কিন্তু প্রাণের কোন লক্ষণ নেই | রাস্তায় যেখানে গাড়ি থাকার, সেখানে আছে, কিন্তু চলছে না | মৃত শহর | বোঝা যায় এ জায়গাটা শহরতলি | অধিকাংশ বাড়ি দুই বা তিনতলা | অল্প কিছু দালান আছে এই হাসপাতালের মতোই আট থেকে দশতলা উঁচু | মেঘ নেই | এ সময়ের অল্প শীতে সকালের রোদে দিয়াও আরাম বোধ করে | যথেষ্ট পরিশ্রান্ত হওয়ার পর সে ছাদের এক জায়গায় বসে বিশ্রাম নেয় | সেই সাথে দুপুরের খাবার খেয়ে নেয় | খাবার পর তার আবার ঘুমোতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে জোর করে উঠে পড়ে | হিসাব অনুযায়ী সে ছাদের উত্তরদিকে পর্যবেক্ষণ শেষ করেছে | এবারে সে ছাদের পুবদিকে কাজ শুরু করে | এদিকটাও মৃত নগরী | প্রায় দু'ঘন্টা পরিশ্রম করে সে পুবদিকের পর্যবেক্ষণ ও মানচিত্র শেষ করে|

এরপর দক্ষিণদিক | শহরের বড় দালানগুলি এদিকে | তার মানে এ দিকটাই শহরের বাণিজ্যিক এলাকা | দিয়াও গভীর মনোযোগে রাস্তাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে|

অনেকক্ষণ দেখার পর তার মনে হ'ল বহু দূরে দালানকোঠার ফাঁকে রাস্তায় কিছু একটা নড়ছে | নড়তে নড়তে বিন্দুটা বড় হচ্ছে | তার মনে হ'ল একজন মানুষ তার দিকে দৌড়ে আসছে | বোধহয় মানুষটা অনেকক্ষণ ধরে দৌড়াচ্ছে, কারণ সে মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছে | আবার উঠে দৌড়াচ্ছে | প্রথমে লোকটাকে কুঁজো মনে হয়েছিল | আরো কাছে আসার পর বোঝা গেল তার পিঠে একটা ছোট্ট বোঝা রয়েছে যার ফলে দূর থেকে দেখলে তাকে কুঁজো মানুষ মনে হয় | একটা মোড়ের কাছে এসে লোকটা বসে পড়ে | এদিক ওদিক তাকিয়ে বোঝা নিয়ে লোকটা আবার উঠে দাঁড়ায়, এবং ডানদিকে মোড় নিয়ে ক্লান্ত পায়ে দৌড়োতে থাকে | ঠিক তখন লোকটা যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে প্রায় মাইল খানেক দূরে একটা বস্তু সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করে ওঠে | দিয়াও সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে|

কয়েক সেকেন্ড পরে সে লোকটাকে দেখতে পায় | তার হাতে কিছু একটা জিনিস মাঝে মাঝেই সূর্যের আলোয় জ্বলে উঠছে | একটু পরেই তার পুরো অবয়বটা বোঝা যায় | বিশাল দৈত্যের মতো একটা মানুষ | পরনে ধূসর আলখাল্লার মতো একটা পোশাক | তার হাতে বিশাল একটা ঝকঝকে 'দাঙ'| আণবিক অস্ত্র ও নানা জাতের তরঙ্গ শক্তির অস্ত্রের যুগেও ধর্মভিত্তিক জঙ্গীদের একটি প্রিয় অস্ত্র এই দাঙ | কারণ দাঙ দিয়ে মানুষকে কুপিয়ে হত্যা করলে একদিকে যেমন ভীতি উৎপাদন করা যায়, তেমনি হত্যাকারী এক ধরনের আদিম পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করে | জঙ্গীদের প্রণোদনের উদ্দেশ্যে এই ধরনের অস্ত্র দিয়ে এই ধরনের হত্যাকে যাজকেরা একটা ধর্মভিত্তিক নাম দেয়, 'স্রষ্টার নিবেদন'|

দিয়াও বুঝতে পারে যে ক্লান্ত মানুষটাকে দৈত্যটা কিছুক্ষণের মধ্যে ধরে ফেলবে | সে তাকে বাঁচাতে চাইল | কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তার যে কিছু করার নেই সেটা বুঝতে পেরে সে ক্রুদ্ধ বোধ করল | নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই হত্যাকান্ডটা আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল | দিয়াওর মনে হ'ল এই লোকটার সাথে তাকে অচিরেই লড়তে হবে | এখন তার কাজ তথ্য সংগ্রহ করা | এর সম্পর্কে যত বেশি তার জানা থাকবে ততই তার সুবিধা হবে | দিয়াও ভেবেছিল হত্যার পর দৈত্যটা মানুষটার পিঠের বোঝাটা নিয়ে চলে যাবে | কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখে দৈত্যটা নিহত মানুষটার গায়ের সমস্ত কাপড়চোপড়, এমনকি তার

জুতোটা পর্যন্ত খুলে নিল | এসব কাপড় দৈত্যটার গায়ে হবে না | দিয়াও ভাবল হয়তো মহামারীউত্তর এই গ্রহে সব জিনিসই দুর্লভ ও প্রয়োজনীয় | অথবা হয়তো দৈত্যটার সাথে আরো কেউ আছে, যে এগুলি পরতে পারবে | ঘটনাটার আরো একটা ভয়াবহ অর্থ হতে পারে | আর তা হ'ল এই যে – মানুষ বহু আগেই সমস্ত শহর লুঠ করে খালি করে ফেলেছে | হাসপাতালের মতো জায়গাগুলি সম্ভবত মানুষ কুকুন্ড ভাইরাসের ভয়ে এড়িয়ে চলে |

একটা নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড দেখার পর ঘরে ফিরে সে রাতে দিয়াওর কিছুই খেতে ইচ্ছা হ'ল না | কিন্তু তাকে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে | সে জোর করে সামান্য কিছু খেয়ে ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়ল | ঠিক ঘুমোবার আগে দিয়াওর মনে পড়ল দৈত্যটা যেদিক থেকে এসেছিল, হত্যাকাণ্ডের পর সেদিকে ফিরে না গিয়ে পশ্চিমদিকে গিয়েছিল | একসময় সে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় | তারপর বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও দিয়াও আর তাকে দেখতে পায়নি | তার মানে, হয়তো সে এদিকেই কোথাও থাকে | তাকে সাবধান হতে হবে | সে রাত থেকে সে ঘুমের আগে ঘরের দরজা বন্ধ করার বিষয়ে আরো সাবধান হয়ে যায় |

চতুর্থ দিন সকালবেলা দিয়াও প্রতিদিনের মতো খেয়েদেয়ে প্রস্তুত হয়ে নেয় | ইতিমধ্যে সম্ভাব্য বিপদের বিষয়ে তার কিছু ধারণা তৈরী হয়েছে | একটা ছুরি সে সর্বদা নিজের সাথে রাখে, কিন্তু এগুলি দিয়ে সম্ভবত সে কোন শক্তিমান শত্রুর সঙ্গে পেরে উঠবে না | তাকে আগ্নেয়াস্ত্র বা তরঙ্গাস্ত্র পেতে হবে | হাসপাতালে নিরাপত্তা কর্মীদের এমনিতে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার প্রয়োজন হয় না | কিন্তু মহামারীর কারণে যখন নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়, তখন হাসপাতালের নিরাপত্তা কর্মীদেরও কিছু তরঙ্গাস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হয় | দিয়াওর সে কথা জানার কথা নয় | তবু দিয়াও তার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে নিরাপত্তা কর্মীদের দপ্তরে অস্ত্র খোঁজার সিদ্ধান্ত নেয় | দ্বিতীয় দিনের মতোই নিচতলার নির্দেশিকা থেকে সে নিরাপত্তা কর্মীদের দপ্তর খুঁজে বের করে | বিদ্যুৎ না থাকাতে ইলেক্ট্রনিক তালাগুলি অচল | তাই দপ্তরের দরজা খুলতে কোন অসুবিধা হয় না | ভেতরে ড্রয়ার আর লকারে সাধারণ তালা দেওয়া | টুলবক্স থেকে যন্ত্রপাতি বের করে সে তালা ভেঙে অস্ত্র খুঁজতে থাকে | ড্রয়ারগুলিতে অফিসের কাগজপত্র, কোনটায় ব্যক্তিগত জিনিস, বন্ধু/বান্ধবী বা পারিবারিক ছবি, নোটবই, স্টেশনারী জিনিস, ইত্যাদি | খুঁজতে খুঁজতে আর তালা ভাঙতে ভাঙতে সে ক্লান্ত হয়ে যায় |

দিয়াও দুপুরের খাবার খেয়ে নেয় | দুটো ঘর নিয়ে নিরাপত্তাকর্মীদের দপ্তর | একটু বিশ্রাম নিয়ে দিয়াও আবার কাজ শুরু করে | প্রথম ঘরের সব তালা ভেঙে খুঁজতে খুঁজতে বিকেল হয়ে যায় | ক্লান্ত দিয়াও সেদিনের মতো নিজের ঘরে ফিরে যায় |

পাঁচতলায় তার অবস্থান সে পরিবর্তন করেনি | মাঝামাঝি রাত্রিবাস করাই তার কাছে সবচাইতে নিরাপদ মনে হয়েছে | ছাদের কাছাকাছি থাকলে ওঠানামায় অতিরিক্ত পরিশ্রম হবে | আর বেশি নিচের দিকে অবস্থান করলে রাস্তা থেকে অজানা বিপদ তাকে সহজেই খুঁজে পাবে |

পঞ্চম দিন সকাল থেকে দিয়াও নিরাপত্তা বিভাগের দ্বিতীয় ঘরে অল্পক্ষণ খুঁজেই একটা পুরনো ড্রয়ারের ভেতরে প্রায় নতুন একটা তরঙ্গাস্ত্র পেয়ে যায় | নিজের সৌভাগ্যে সে একটু অবাক হয় | শেষের দিকে যারা হাসপাতাল ছেড়ে পালায়, তারা নিশ্চয় প্রচন্ড ভয় পেয়ে তাড়াহুড়া করে পালায়, নইলে তাদের এইসব অস্ত্র ফেলে পালানোর কথা নয় | অথবা এই অস্ত্রের মালিক আগেই মারা যায় |

পরদিন দিয়াও তরঙ্গাস্ত্রটা ভাল করে পরীক্ষা করে | অস্ত্রটা পুরোপুরি কার্যক্ষম | ডাকাত দলে থাকতেই দিয়াও এই অস্ত্র ব্যবহার করা শিখেছে | যন্ত্রটার নাম কিকব | ভ্রুম গোত্রের অস্ত্র | সে নিরাপত্তা বিষয়ে কিছুটা আস্বস্ত বোধ করে | এই অস্ত্র যে ধরনের তরঙ্গ উৎপাদন করে তা দিয়াওর কাছে দুর্বোধ্য বিষয় | কিন্তু সে জানে যে তরঙ্গ আক্রমণের জন্য ছোট একটি আণবিক ব্যাটারি বসানো থাকে এই অস্ত্রে | আণবিক ব্যাটারি নিম্নতম পাঁচ বছর কার্যক্ষম থাকে | অস্ত্রের গায়ে বসানো মনিটর অন করে দিয়াও দেখতে পায় যে তার অস্ত্রের বয়স প্রায় এক বছর | অর্থাৎ আরো অন্তত চার বছর অস্ত্রটা কার্যক্ষম থাকবে | রীতিমত সুসংবাদ! এই তরঙ্গ যাকে আঘাত করবে, সে চেতনা হারাবে | তারপর এক ঘন্টার মধ্যে মারা যাবে | কিন্তু এই অস্ত্রের প্রতিষেধক ঔষধ আছে | একঘন্টার মধ্যে প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন দিতে পারলে মানুষটা বেঁচে যাবে | সাধারণত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভাগ, দমকল বিভাগ, হাসপাতাল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বিভাগ এই ধরনের

অস্ত্র ব্যবহার করে, যাতে মানুষের মৃত্যু এড়ানো যায় | সেনাবাহিনীতে তাই এ ধরনের অস্ত্রের কোন মূল্য নেই | বিশেষ করে এই জন্য যে, এই অস্ত্র দুই শত গজের বাইরে লক্ষ্যভেদে অসমর্থ | সেনাবাহিনীর পছন্দের অস্ত্র 'লশেল'| সেটা দ্রু গোত্রের বহুমুখী অস্ত্র | মূল যন্ত্রটা ছোট, কিন্তু মূল যন্ত্রের সাথে একটা নল লাগালে অস্ত্রটা একহাত লম্বা হয়ে যায় | তখন এই অস্ত্র পাঁচ মাইল দূরেও লক্ষ্যভেদ করতে পারে | সেজন্য লাগানো থাকে ছোট একটা শক্তিশালী দূরবীন | গোলাকার ম্যাগাজিনে একসাথে পঞ্চাশটি গুলি ধরে | স্বয়ংক্রিয় ও একক উভয় নিয়মে গুলি ছোঁড়া যায় | লক্ষ্যবস্তুর তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটে | পাশাপাশি লশেল অস্ত্র দিয়ে ক্রোমিন রশ্মি ছোঁড়া যায় | ক্রোমিন রশ্মি মানুষের ও পশুর তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটায় না | যে কোন মানুষ বা পশুকে অচেতন করে রাখা যায় ক্রোমিন রশ্মি দিয়ে | দুটো ব্যবস্থাই যদি অকেজো হয়ে যায়, যা খুব সহজে ঘটে না, তখন দ্বিতীয় নলের এক অংশ খুলে ফেলে একটা অসাধারণ মজবুত ও লম্বা ধারালো ছোরা পাওয়া যায় | ক্রোমিন রশ্মির উৎস সেল এমন উপাদান দিয়ে বানানো হয় যা এক বছর কার্যক্ষম থাকে | একবছর পর সেলটা বদলালেই হ'ল |

সেদিন প্রায় পুরো দিনটা দিয়াও তার কিকব নিয়ে কাটাল | ছোট হলেও অস্ত্রটা জটিল | সবগুলি যন্ত্রাংশ সাবধানে খুলে, পরিষ্কার করে, সে আবার জোড়া লাগল | কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য তরঙ্গ ছোঁড়ার সুইচ অন করে তার মনে হ'ল ব্যবস্থাটা ঠিকই আছে | কিন্তু লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত না করে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই |

চার

সপ্তম দিনে দিয়াও তার কাজের অগ্রগতি যাচাই করে | খাবারের যে ভান্ডার সে পেয়েছে, তা দিয়ে তার দু'মাসের মতো চলে যাবে | পরনের কাপড় যা পেয়েছে, তাও আপাতত চলবে | নিরাপত্তার বিষয়টা সবসমই আপেক্ষিক | নির্ভর করে বিপদের ধরণ ও পরিমাণের ওপর | একটা প্রাথমিক ব্যবস্থা হয়েছে | ভেবে ভেবে দিয়াও সেদিন নতুন কিছু পরিকল্পনা করে | তাকে আরো কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে হবে – ভাল কিছু কাপড়, বিশেষ করে গরম কাপড় এবং জুতো, যাতায়াতের জন্য ব্যবহারযোগ্য কোন বাহন | ব্যবহারযোগ্য অর্থাৎ যে বাহন মানুষের শক্তি বা প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে চলে | আর একটা দূরবীন | কিন্তু দিয়াও এখনও খুব দুর্বল | বাইরের অজানা বিপদে সীমিত অস্ত্র নিয়ে বের হওয়া এখনও নিরাপদ নয় | পালানোর প্রয়োজন হলে দিয়াওর পক্ষে এখন দৌড়ানো সহজ হবে না |

দিয়াও তার পরবর্তী দিনগুলিকে তিনভাগে ভাগ করল | সকালে কিছু খেয়ে নিয়ে সে ছাদে গিয়ে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করে দুপুর পর্যন্ত | দুপুরের খাবার পর সে তার প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা নিয়ে হাসপাতালের ঘরে ঘরে চিরুনি অভিযান চালায় | হাসপাতালে টর্চ আর প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব নেই | সে টর্চ, ব্যাটারি, এবং চিকিৎসা সরঞ্জামের একটা ভান্ডার গড়ে তোলে | বিকেলে খাওয়ার আগে সে হালকা ব্যায়াম করে | অন্ধকার হওয়ার আগে তাকে খেয়ে নিতে হয় | অন্ধকার হওয়ার পর সে শুয়ে পড়ে | এভাবে দুসপ্তাহ যাওয়ার পর তার মনে হ'ল সে এখন বাইরে বের হওয়ার জন্য উপযুক্ত | সে আরো এক সপ্তাহ ছাদের ওপরে দৌড়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নেয় |

তৃতীয় সপ্তাহের পর থেকে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায় | পর পর ক'দিন প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি হতে থাকে | এইরকম ঝড়ের মধ্যেই দিয়াও দৈত্যটাকে আবার দেখতে পায় | আগের বার সে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিক থেকেই আবার আসে | গায়ে বর্ষাতি | কিন্তু এবার তার সাথে বোঝা মাথায় আর

একজন মানুষ | কাছে আসার পর বোঝা যায় মানুষটি একজন যুবতী নারী | বৃষ্টিতে ভিজে হালকা বসন মেয়েটির গায়ের সাথে লেপ্টে আছে | দূর থেকে হলেও মেয়েটি দিয়াওর মনোযোগ আকর্ষণ করে | দিয়াও লক্ষ্য করে যে দৈত্যটা নিজে কোন বোঝা বহন না করে একজন অল্প বয়সী নারীকে দিয়ে পরিশ্রমসাধ্য কাজটি করিয়ে নিচ্ছে | আগের দিনের মতোই লোকটা কাছাকাছি এসে বাঁদিকে মোড় নিয়ে কিছুক্ষণ পর অদৃশ্য হয়ে যায় | সম্ভবত ওদিকেই তার আস্তানা | দিয়াও এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করে | অস্থিরতার কারণটা সে ঠিক বুঝতে পারে না | কিন্তু তার মনে হয় এই মেয়েটির সাথে তার

জীবনের নিরাপত্তার বিষয়টি কোনভাবে জড়িত|

কোদন্ড গ্রহে ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে কখনও এক সপ্তাহ, কখনও দুসপ্তাহ একনাগাড়ে চলতে থাকে | এভাবে দুসপ্তাহ একনাগাড়ে ঝড়বৃষ্টি হওয়ার পর রোদ ওঠে | কোদন্ডের জোড়া সূর্য, কোদন্ডবাসীর ভাষায় যার নাম 'ড্রিভা', তার আলোয় চারদিক ঝলমল করে ওঠে | কোদন্ডের নানা বর্ণের গাছপালা ড্রিভার আলোয় যেন হেসে ওঠে | মৃদু বাতাসে তাদের আন্দোলিত শাখাপ্রশাখা চিকচিক করে আনন্দ প্রকাশ করে | দিয়াওর শরীরে সেই আনন্দ সংক্রমিত হয় | সে বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে | কিন্তু একান্ত বাধ্য না হলে সে এখনও দৈত্যটার মুখোমুখি হতে চায় না | এই ক'দিন অন্ধকারে ক্রমাগত রাত কাটিয়ে সে এখন অন্ধকারে অনেক কিছু দেখতে পায় | সে ঠিক করে যে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে কাছাকাছি সুপারস্টোরগুলিতে খোঁজ নেবে | একটা দূরবীন তার খুবই প্রয়োজন | প্রয়োজন ভাল কিছু পোশাক, একটা বাহন, আর সম্ভব হলে কিছু দীর্ঘস্থায়ী খাবার |

সেদিন সন্ধ্যা নামার আগে রাতের খাবার খেয়ে সে তৈরী হয়ে নেয় | হাসপাতালে জেগে ওঠার প্রায় দেড় মাস পরে সন্ধ্যায় সে প্রথম রাস্তায় নামে | চারিদিকে সতর্ক চোখ রাখে | পকেটে কিকবের ট্রিগারে তার আঙ্গুল | অন্য হাতে একটা লোহার ক্রোবার | দৈত্যটা শহরের যে দিক থেকে এসেছিল দিয়াও তার উল্টোদিকে একটি সরল রেখায় অগ্রসর হয়, যাতে পথ চিনে হাসপাতালে ফিরতে কোন অসুবিধে না হয় | সে দেয়ালের গা ঘেঁষে খুব ধীরে ধীরে এগোয়, আর পথের দুধারের দোকানগুলি অন্ধকারে খুঁটিয়ে দেখে | চৌরাস্তার মোড়ে একটু এগিয়ে চারিদিকে যতগুলি সম্ভব দোকান পরীক্ষা করে | বিভিন্ন রকমের দোকান, ওপরে কিছু অফিস ঘর | একটা কাপড়ের দোকান পাওয়া যায় | ইলেক্ট্রিসিটি অচল থাকায় দরজাটা সহজেই খুলে ফেলে | আলো-অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে দিয়াও কিছু পোশাক নির্বাচন করে | সৌভাগ্যক্রমে একই দোকানে কয়েকটা ব্যাকপ্যাক পাওয়া যায় | একটাতে পোশাকগুলি ঢুকিয়ে দিয়াও পিঠে ঝুলিয়ে নেয় | আর একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে সে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ে | জুতো আর বর্ষাতিও খুঁজেছিল, কিন্তু এই দোকানে পাওয়া গেল না |

কাপড়ের দোকান থেকে বেরিয়ে দিয়াও হাসপাতালে ফিরে আসে | নিচের তলায় দরজার কাছে কাপড়ের ব্যাগটা রেখে অন্য ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে সে আবার আগের রাস্তায় ফিরে যায় | ফিরে আসার রাস্তা যেন ভুল না হয়, সেজন্যই তার এই বাড়তি পরিশ্রম | এবারে একটু বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে সে সুপারস্টোর খুঁজতে থাকে | প্রায় এক মাইল গিয়ে এক চৌরাস্তার মোড়ে একটা সুপারস্টোর দেখতে পায় | সুপারস্টোরের প্রধান দরজা নানারকম বাড়তি ব্যবস্থা দিয়ে বন্ধ রাখা | সেটা খোলা সম্ভব হ'ল না | জানালাগুলি খুব মোটা স্বচ্ছ ধাতুর তৈরী, সেগুলিও ভাঙা প্রায় অসম্ভব | কিন্তু জরুরী প্রয়োজনে বের হওয়ার একটা দরজা সে খোলা পেয়ে যায় | এ দোকানটা লুঠ হয়েছে | সেজন্যই দরজাটা খোলা পাওয়া গেছে | ভেতরে জমাট অন্ধকার | সঙ্গে আনা পেন্সিল টর্চটা সাবধানে নিচু করে শুধু মাঝে মাঝে জ্বালিয়ে দিয়াও তার জিনিসপত্র খুঁজতে থাকে | এ দিকটা ফার্নিচারে ঠাসা | পলায়নপর মানুষ লুঠ করেছে প্রধানত খাবার ও নিত্যব্যবহার্য জিনিস | খুঁজতে খুঁজতে দিয়াও ভ্রমণ বিভাগে তার পছন্দমত দূরবীন পেয়ে যায় | একটা বড় আর একটা ছোট দূরবীন সে ব্যাগে ভরে নেয় | বাড়তি সৌভাগ্য হিসেবে একটা কম্পাসও পাওয়া যায় | এরপর দিয়াও বাহন খুঁজতে থাকে | গন্ধে মনে হয় সে একটা খাবার বিভাগে এসে পড়েছে |

হঠাৎ দিয়াও সতর্ক হয়ে যায় | সে বিপদের গন্ধ পায়! তার কানে খুব মৃদু একটা শব্দ ধরা পড়ে | কীসের শব্দ বোঝা যায় না | কিন্তু রাতের অন্ধকারে এই মৃত নগরীতে যে কোন শব্দই বিপজ্জনক | দিয়াও পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে থাকে | শব্দটা বাড়তে থাকে | একটা ভূতুড়ে যন্ত্রের মতো শব্দ | যেন হাজার হাজার গাছের পাতা শব্দ করে তার দিকে এগিয়ে আসছে | খুব ধীরে নিচু হয়ে দিয়াও আবার টর্চ জ্বালে | যেদিক থেকে শব্দটা আসছে, সেদিকে তাকিয়ে তার গায়ের রক্ত হীম হয়ে যায় |

গাঢ় বেগুনি রঙের হাজার হাজার মাংসাশী 'ট্রাঙ্কন' কিলবিল করে তার দিকে ছুটে আসছে! প্রাণীগুলি দৈর্ঘ্যে তিন থেকে চার ইঞ্চি মাত্র | কিন্তু তাদের ভয়াবহ তীক্ষ্ণ দাঁত ছাড়াও পিঠের মেরুদণ্ডের ওপরে একটা ধারালো ব্লেডের মতো হাড় উঁচিয়ে থাকে | ধরতে গেলে হাত কেটে ফালা ফালা হয়ে যায় | এছাড়া তারা সংখ্যায় অগণিত | সংখ্যার কারণে কিকব দিয়ে তাদের আটকানো যায় না | লশেল থাকলে হয়তো কিছুটা

লড়াই করা যায়| দিয়াও দরজার দিকে দৌড় দেয়|
তাড়াহুড়া করতে গিয়ে সে অন্ধকারে ভুল করে একটা বন্ধ দরজার ওপরে গিয়ে আছড়ে পড়ে | ততক্ষণে ট্রাঙ্কনগুলি তাকে ধরে ফেলেছে | হাতের ক্রোবার দিয়ে এলোপাথাড়ি জন্তুগুলিকে আঘাত করতে করতে দিয়াও দৌড়াতে থাকে | ট্রাঙ্কনের তীক্ষ্ণ কামড়ে মনে হয় তার সারা শরীরে কেউ শত শত সুঁই ফোটাচ্ছে | একটা ট্রাঙ্কন তার কান কামড়ে ধরে | সেটাকে ছাড়াতে গিয়ে দিয়াওর কান ছিঁড়ে যায় | সেখান থেকে দরদর করে রক্ত পড়তে থাকে | হাতের যন্ত্রণায় বুঝতে পারে ট্রাঙ্কনের পিঠের ছুরি তার হাত কেটে ফেলেছে | কোনোরকমে যখন দিয়াও খোলা দরজাটা খুঁজে পায়, তখন তার সারা শরীরে কিলবিল করছে ট্রাঙ্কন| দিয়াও খানিক দৌড়ে গিয়ে মাটিতে শুয়ে গড়াতে থাকে | প্রাণীগুলি তার শরীরের চাপে মটমট শব্দে মরতে থাকে | একটা বোঁটকা গন্ধে তার বমি আসে | তখনও গলার নিচে, আর দুই পায়ের মাঝখানে তারা ঝুলে আছে | দু'হাতে তাদের ছিঁড়তে ছিঁড়তে দিয়াও আবার দৌড়াতে থাকে, তার দু'হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় | ট্রাঙ্কনমুক্ত হওয়ার পর তার খেয়াল হয় যে সে এতক্ষণ উল্টোদিকে দৌড়েছে | দিয়াও হাঁপাতে থাকে | তার শরীর এখনও আগের অবস্থায় ফেরেনি | শরীরে একই সময় অসীম ক্লান্তি আর ট্রাঙ্কনের কামড়ের যন্ত্রণা | বিপদে দিয়াওর মাথা ঠান্ডা থাকে | সে সাবধানে ধীরে ধীরে উল্টোদিকের ফুটপাথ ধরে হাসপাতালের দিকে যেতে শুরু করে | সুপারস্টোরের এলাকাটা সে এবার দৌড়ে পার হয়|
ঘরে পৌঁছে দিয়াও সব কাপড় খুলে ফেলে প্রথমে নগ্ন হয়, সারা শরীরে যেন আগুন জ্বলছে| যত কষ্টই হোক তাকে এখন স্নান করতে হবে | সব ক্ষতগুলি ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে | ঔষধ লাগাতে হবে, নইলে ঘায়ে পচন ধরবে | দিয়াও জানে যে ট্যাঙ্কের পানি শেষ হয়ে গেলে নিরাপদ পানি আর হয়তো পাওয়া যাবে না| পানি বাঁচাবার জন্য এ ক'দিন সে স্নান করেনি, আজ তা কাজে লাগল | মনের জোরে দিয়াও এই কষ্টকর কাজগুলি শেষ করল | যন্ত্রণা সত্ত্বেও সাবান দিয়ে সারা শরীর পরিষ্কার করে তারপর ক্ষতগুলিতে ঔষধ লাগাল | প্রাথমিক চিকিৎসার উপাদানগুলি এখন কাজে লাগল | আস্তে আস্তে যন্ত্রণা কমল | কানের ছেঁড়া অংশে আর হাতদুটিতে অ্যান্টিবায়োটিক স্ট্রিপ লাগিয়ে নেয়, আর বাকি ঘাগুলিতে সাধারণ স্ট্রিপ | জোর করে রাতের খাবার খেয়ে আর ব্যথার বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে| ব্যথায় ছটফট করতে করতে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ে|
পরদিন সকালে দিয়াওর ঘুম ভাঙ্গে ব্যথায় – ঔষধের ক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে| হাতমুখ ধুয়ে, নাস্তা করে, সে আবার ব্যথার ঔষধ খায় | তারপর মনে মনে গত রাতের ঘটনাটা বিশ্লেষণ করে | এই শহরে রাতে বের হওয়া মোটেও নিরাপদ নয় | ট্রাঙ্কন অন্ধকারের প্রাণী | তারা মাটির নিচে থাকে, সেখানেই তারা পোকামাকড় আর কেঁচো খুঁড়ে খায় | ক্বচিৎ কখনও খাবারের অভাব হলে তাদের ছোট দু'চারটি দল অন্ধকারে মাটির ওপরে উঠে আসে | দিয়াওর মনে হ'ল মহামারীর পর মাটির নিচের সমস্ত ট্রাঙ্কন মাটির ওপরে উঠে এসেছে | আলোহীন অন্ধকার রাতে সমস্ত শহর তাদের দখলে থাকে | সেখানে তারা সহজ বিকল্প খাবার সরবরাহ আবিষ্কার করেছে| প্রথমে ছিল ভাইরাসের আক্রমণে মৃত মানুষ, তারপর মানুষের পরিত্যক্ত প্রাণী আর খাবার | দিয়াও আজ ভাগ্যের জোরে মৃত্যুকে এড়াতে পেরেছে|
শুয়ে, ঘুমিয়ে, দিন পার করে দিয়াও | রাতে খাবার আর ব্যথার ঔষধ খেয়ে আবার ঘুমায় | পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দিয়াও টের পায় যে তার জ্বর এসেছে | মাথায় আর সারা শরীরে প্রচন্ড ব্যথা | তাকে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে | হাসপাতালের ঔষধের দপ্তর নিচের তলায়| দিয়াও কিছু খেয়ে নিয়ে একটা কম্বল হাতে ধীরে ধীরে জ্বর গায়েই নিচে নামতে থাকে | নেমে সে প্রথমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয় | একটু পানি খেয়ে ঔষধ বিভাগে খুঁজে খুঁজে ঔষধ সংগ্রহ করে| তার জানা একটা অ্যান্টিবায়োটিক সে খেয়ে নেয়| তারপর আরো কয়েক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক, জ্বরের ঔষধ, ব্যথানাশক, পেটের পীড়ার ঔষধ, ছোটখাটো কাটাছেঁড়ার যন্ত্রপাতি, সেলাইয়ের জিনিস, জীবাণুনাশক, গ্লাভস, গজ-ব্যান্ডেজ, সার্জিকাল টেপ, ইত্যাদি সে সংগ্রহ করে| দিয়াও খুব ক্লান্ত বোধ করে| জ্বরের মধ্যে খেতে ইচ্ছা করে না, তবু খাবার ঘরে গিয়ে সে অল্প কিছু খেয়ে নেয়| তারপর একটা জ্বরের বড়ি খেয়ে সেখানেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে জ্বরের ঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে| একসময় জ্বর কমে আসে|
বিকেলের দিকে তার ঘুম ভাঙে | সে একটু ভাল বোধ করে| আরো কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে দিয়াও পাঁচতলায়

ফিরে যায় | রাতের খাবার খাওয়ার পর আবার জ্বর আসে | দিয়াও নিয়ম করে সব ঔষধ খেতে থাকে | তার মাথায় নতুন দুশ্চিন্তা ঢোকে|

লুঠের পর সুপারমার্কেটের খোলা দরজা দিয়ে হয়তো ট্রাঙ্কনের দল সেখানে ঢুকে পড়েছে | হাসপাতালগুলো এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যে সেখানে পোকামাকড়ও সহজে ঢুকতে পারে না | তবু ধ্বংস হয়ে যাওয়া কোদন্ড গ্রহে এক সময় নিশ্চয় হাসপাতালেও ট্রাঙ্কনের দল ঢুকে পড়বে | তার আগে তাকে এ শহর ছাড়তে হবে | আর শহর ছাড়ার আগে একা এক বৈরী গ্রহে বেঁচে থাকার জন্য তাকে তৈরী হতে হবে|

পরদিন আর জ্বর আসে না | গায়ের ব্যথাও কম | খাবার ইচ্ছাও ফিরে আসে | দিয়াও দূরবীন দুটি পরীক্ষা করে, কোনটা কিভাবে ব্যবহার করবে সেটা বুঝে নেয় | প্রতিদিন ছাদে উঠে নিয়ম করে সে আগের মতো চারিদিক পর্যবেক্ষণ করে; প্রথমে খালি চোখে, তারপর দূরবীন দিয়ে | কোনদিকে কিসের দোকান, কোন এলাকায় ঘরবাড়ি, কোনদিকে স্কুল-কলেজ, কোনদিকে ক্রীড়া-কমপ্লেক্স, কোনদিকে শিল্প-কারখানা, এইসব কিছু সে বুঝে নিতে চায় | দিয়াও এই শহরের সমস্ত রাস্তা-ঘাটের একটা মানচিত্র তৈরী করতে চায় | ট্রাঙ্কনের আক্রমণের এক সপ্তাহ পরে সে পুরোপুরি সুস্থ বোধ করে | আবার দূরবীন নিয়ে সে প্রতিদিন সকালে ছাদে উঠে মানচিত্র তৈরীর কাজ করে | কিছু খসড়া মানচিত্র সে আগেই করে রেখেছিল | এখন প্রায় দুসপ্তাহ পরিশ্রম করে সে তার দৃশ্যমান এলাকাগুলির সমস্ত রাস্তাঘাটের একটা চলনসই মানচিত্র তৈরী করে ফেলে|

দিয়াও জানে না এখন বছরের কোন দিন | কিন্তু হাসপাতালে জেগে ওঠার পর থেকে সে দিনের হিসাব রাখার চেষ্টা করে এসেছে | তার হিসাব অনুযায়ী সেদিন থেকে চৌষট্টি দিন পার হয়ে গেছে | খাবার যা বাকি আছে, তাতে হয়তো তিন থেকে চার সপ্তাহ চলে যাবে | তার অর্থ, ঝুঁকি নিয়ে হলেও তাকে দিনেরবেলা বেরোতে হবে | ট্রাঙ্কনের কারণে এই শহরে রাতেরবেলায় বের হওয়া যাবে না | ট্রাঙ্কনের বিষয়টা নিয়ে সে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকে|

পাঁচ

দিনেরবেলা বের হওয়ার আগে আরো এক সপ্তাহ দিয়াও তার আস্তানায় বসে পরিকল্পনা আর প্রস্তুতি শুরু করে | হাসপাতালের সিকিউরিটি বিভাগে সে উদ্দেশ্যহীনভাবে দিনের পর দিন জিনিসপত্র ঘাঁটে – যদি কোন প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়ে যায় | এভাবে ঘাঁটতে ঘাঁটতে একদিন সে একটা মহা মূল্যবান জিনিস পেয়ে যায় | "সুপারকাটার" – মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা আর ভারী একটা ধাতুর তৈরী জিনিস | বোতাম টিপে এই যন্ত্র দিয়ে এক ধরনের শক্তি তৈরী করা যায়, যা দিয়ে গ্রহের প্রায় যে কোন জিনিস কাটা যায় | আবার উল্টোদিকের বোতাম টিপে ছোট একটা আগুনের শিখা ছুঁড়ে মারা যায় | জিনিসটা সে যত্ন করে রেখে দেয় |

দিয়াও একদিন সকালে সঙ্গে কিকব, ক্রোবার, টর্চ আর ব্যাকপ্যাক নিয়ে বেরোয়; যেদিকে দৈত্যটাকে যেতে দেখেছিল সেদিকটা সে এড়িয়ে চলে | প্রতিদিন সকালে নিয়ম করে প্রায় দু'ঘন্টা সময় নিয়ে এক একটি এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে | তারপর এলাকাটা তার মানচিত্রে চিহ্নিত করে | অধিকাংশই লুঠ হয়ে যাওয়া খালি বিল্ডিং; অল্প কিছু অক্ষত রয়ে গেছে – কোনটি অবস্থানের কারণে, কোনটি লুঠ হওয়ার জিনিস নয় বলে, আর কোনটি অজ্ঞাত কারণে রয়ে গেছে দিয়াও সবকিছুই চিহ্নিত করে, যদি কোন কাজে লেগে যায়! একদিন এক দোকানে সে আগুন জ্বালাবার যন্ত্র আর কিছু ব্যাটারি পেয়ে যায় | আর একদিন এক অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্রের ভাঁড়ার ঘরে সে আবার কিছু দীর্ঘস্থায়ী খাবার আবিষ্কার করে – সিমের বিচি, ডাল, মিষ্টি কুমড়ো, ইত্যাদি | তার মানে আগুন জ্বেলে খাবার রেঁধে খাওয়া যাবে | দিয়াও খুশি হয়ে ওঠে | খুঁজতে খুঁজতে একদিন সে একটু বেশি দূরে চলে যায় | হঠাৎ দেখে একদল হিংস্র মাংসাশী 'হিঙ্গেল' খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে | এগুলি নেকড়ের মতো প্রাণী, কিন্তু নেকড়ের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী | সৌভাগ্যক্রমে হিঙ্গেলগুলি দিয়াওকে দেখতে পায়নি, কিন্তু তারা গন্ধ পায় | বাতাস শুঁকে শুঁকে তারা দিয়াওর দিকে এগিয়ে আসে | দৌড়ে গিয়ে দিয়াও প্রথমেই যে দালান খোলা পায় তার ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় | তারপর দোতলায় উঠে দোতলার জানালা দিয়ে হিঙ্গেলগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে | সেগুলি দৃষ্টির আড়াল হওয়ার পরেও দিয়াও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে; তারপর নিচে নেমে আসে|

একদিন একটা খাবারের গুদাম দিয়াওর চোখে পড়ে | জানালার বালাই নেই, প্রকান্ড গুদামের দুদিকে দুটি দরজা শুধু, শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ইত্যাদি আছে | দিয়াও খাবারের

খোঁজে দরজাটা খুলতে গিয়ে একটু থমকে গেল | তার শরীরে সে বিপদ সংকেত টের পায় | টর্চ জ্বেলে দরজাটা সামান্য ফাঁক করে সে উঁকি দেয় | যা ভেবেছিল, তাই; ভেতরে হাজার হাজার ট্রাঙ্কন খাবারের বস্তায় কিলবিল করছে | দিয়াও ঝট করে দরজাটা বন্ধ করে দেয় | তারপর দুদিকের দুটি দরজাই ভাল করে পরীক্ষা করে | খুব মজবুত কাঠের তৈরী দরজা | দরজাটা তাকে ভাবায় – ভাবে যে এই কাঠের দরজাকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগানো যায় |

আবার একদিন একটা দালানের দোতলা থেকে দিয়াও দৈত্যটাকে দেখতে পায় | সঙ্গে সেই মেয়েটি | সেদিনও মেয়েটির মাথায় বোঝা | দিয়াও দোতলা থেকে দ্রুত নেমে আসে | খুব সাবধানে সে দূর থেকে দুজনকে অনুসরণ করে | অনেক অলিগলি পেরিয়ে দৈত্যটা প্রথম দিনের সেই বড় রাস্তায় আসে, যেখানে দিয়াও তাকে প্রথমদিন দেখেছিল | বড় রাস্তায় প্রায় তিন মাইল হেঁটে দৈত্যটা আর মেয়েটি বাঁয়ে একটা ছোট রাস্তায় ঢোকে | এদিকে বাড়িঘর কম | গাছ-গাছালির সংখ্যা বেশি | আরো কিছুদূর যাওয়ার পর কাঁটাতার ঘেরা একটা বিশাল এলাকায় ওরা দুজন ঢুকে পড়ে | চারিদিকে ছোট ছোট নিচু দালান | সেগুলিও কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ভাগ করা | কোথাও চেইন লিংক দিয়ে তৈরী দেওয়াল | কোথাও ইঁটের দেওয়াল | একটু পর পর লোহার দরজা পার হতে হয় | যেন কোন পরিত্যক্ত জেলখানা | কিন্তু মাঝখানের বিশাল উঁচু দালানটা দেখে দিয়াও বুঝতে পারে এটা একটা উপাসনালয় | লোকটা একটা উপাসনালয়ে থাকে! বিষয়টা অদ্ভুত! দিয়াও কারণ অনুমান করতে চেষ্টা করে | হয়তো সে এই উপাসনালয়ের কর্মী ছিল | অথবা স্থাপনার কাঠামো তাকে নিরাপত্তা দেয় | জনহীন উপাসনালয়ে শেষপর্যন্ত দৈত্যটা উঁচু দালানটার সামনে এসে থামে | দালানটা তালা দেওয়া | দৈত্যটা তালা খুলে ঢুকে পড়ে | মেয়েটাও ঢোকে | সতর্ক দিয়াও বহুদূরে অবস্থান করে | উপাসনালয়ের ভেতরে গাছগাছালির সংখ্যা খুব বেশি নয় | সে দূরে একটা গাছের নিচে বসে পড়ে | অনেকক্ষণ বসে থেকে সে বুঝতে পারে যে সেদিন আর দৈত্যটার বেরোবার সম্ভাবনা নেই | মনে মনে সে একটা পরিকল্পনা করে | আশপাশের সবগুলি গাছ সে লক্ষ্য করে | তারপর একটা গাছ নির্বাচন করে সে তার আস্তানায় ফিরে যায় |

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করার পর দিয়াও চিন্তা করে | সে জানে তাকে কী করতে হবে | তৈরী হয়ে দিয়াও আবার সেই আগের সুপারমার্কেটে গিয়ে ঢোকে | খুঁজে খুঁজে সে ছিটকিনি, আর সেগুলি লাগাবার যন্ত্রপাতি জোগাড় করে | জিনিসগুলি নিয়ে গুদামঘরে আসে | দরজাগুলো খুবই শক্ত, কিন্তু সেগুলি ধাতুর তৈরী নয়, কাঠের তৈরী | একটু কষ্ট করে দিয়াও দুই দরজাতেই ছিটকিনি লাগাতে সমর্থ হয় | ছিটকিনিগুলি সে এমনভাবে লাগায় যাতে ভেতর থেকে ধাক্কাধাক্কি করে সেগুলি খোলা অসম্ভব হয় | তারপর ছিটকিনিগুলি খোলা রেখেই সে তার বাসস্থানে ফিরে আসে | সে রাতে দিয়াও সুপার-কাটারটা বের করে | সে যে ডাকাত দলে ছিল, তারা ছোটখাটো মূল্যবান জিনিস লুকোনোর জন্য চামড়া কেটে মাথার পেছনে চুলের নিচে একটা ছোট থলে বানিয়ে রাখে | দিয়াও যন্ত্রটা সেখানে রাখে | তার ঝাঁকড়া চুলের পেছনে জিনিসটা কারো চোখে পড়া অসম্ভব | সে একটা ব্যাকপ্যাকে সারাদিনের খাবার, পানি, কিকব, টর্চ, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস ভরে রাখে |

পরদিন দিয়াও খুব ভোরে উঠে পড়ে | নাস্তা সেরে সূর্য ওঠার ঠিক আগে সে রাস্তায় নেমে আসে | চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দিয়াও উপাসনালয়ের পথে রওয়ানা হয় | নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে সে আগের দিনের নির্বাচিত গাছে উঠে বড়

শিল্পী: রিতিকা নন্দী (বয়স ১৫)

দালানের দিকে নজর রাখে | ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে যায় কাউকে সেই দালান থেকে বের হতে দেখা যায় না | গাছে বসেই সে তার দুপুরের খাওয়া সেরে নেয় | বিকেল পর্যন্ত একইভাবে কাটিয়ে দিয়াও ঘরে ফিরে আসে | তিনদিন এভাবে নজর রাখার পর চতুর্থ দিনে দৈত্যটাকে বেরোতে দেখা যায়; সঙ্গে মেয়েটি | তারা কোনদিকে যায় দিয়াও খেয়াল করে | তারপর গাছ থেকে নেমে দূর থেকে সাবধানে তাদের অনুসরণ করে | লোকটা দিয়াওর মতোই সারাদিন ধরে খাবার আর

প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করার জন্য ঘুরে বেড়ায় | মেয়েটিকে দৈত্যটা ভারবাহী পশুর মতো ব্যবহার করে | দিয়াও ধৈর্য ধরে দিনের পর দিন লোকটাকে অনুসরণ করে; প্রায় তিন সপ্তাহ পর তার ধৈর্যের পুরস্কার পায়| একদিন কোন প্রয়োজনে লোকটা দুপুরবেলা উদ্ভ্রান্তের মতো বেরোয়, মেয়েটিকে সঙ্গে না নিয়ে; কিন্তু সে দালানের সামনের দরজা তালাবন্ধ করে রেখে যায়| লোকটা দৃষ্টির আড়াল হওয়ার পর দিয়াও গাছ থেকে নেমে আসে| নির্দিষ্ট দালানটার কাছে গিয়ে সে চারিদিক ঘুরে মেয়েটিকে খুঁজতে থাকে, শেষে একটা জানালা দিয়ে দিয়াও মেয়েটাকে দেখতে পায়| দেখে মনে হয় না যে তার বয়স ষোলো বা সতেরোর বেশি হবে | মেয়েটি মাটিতে বসে কাঠের চুলো জ্বালিয়ে কিছু একটা রান্না করছে | দিয়াও অনেকক্ষণ কোন শব্দ না করে তাকে দেখে| এতদিন দূর থেকে দেখে সে বুঝতে পারেনি যে মেয়েটি অসাধারণ রূপসী | কিন্তু শ্রম আর যত্নের অভাবে সহজে তা বোঝা যায় না | তার ওপর গভীর বিষণ্নতায় ক্লান্ত ভারাক্রান্ত তার মুখ | দিনের পর দিন দৈত্যটার ক্রীতদাসের মতো কাজ করে এই মেয়ে| দিয়াও স্তব্ধ বিস্ময়ে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকে| আর ঠিক তখনি তার শরীরে বিপদ সংকেত বেজে ওঠে|

তার বিহ্বল অবস্থার কারণে প্রতিক্রিয়ায় সামান্য দেরি হয়ে যায়| সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দৈত্যটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে| দৈত্যটা নড়ে না| সে দুহাতে দিয়াওকে শূন্যে তুলে অবলীলায় দূরে নিক্ষেপ করে | দিয়াও মাটিতে পড়তে পড়তে তার পকেটের কিকবে হাত দেয়| শূন্যে পড়ন্ত অবস্থায় সে কিকবের বোতাম টেপে| তার আক্রমণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় | ইতিমধ্যে দৈত্যটা তার গায়ের ওপরে এসে পড়েছে| সে দিয়াওর শরীরটা ওপরে তুলে এবার প্রচন্ড জোরে মাটিতে আছড়ে দেয় | মাথায় প্রচন্ড আঘাত পেয়ে দিয়াও জ্ঞান হারায়|

জ্ঞান ফেরার পর সে নিজেকে জানালাবিহীন একটা ঘরে দেখতে পায় | নোংরা ঘর, চারদিকে আবর্জনা, দুর্গন্ধ | মাথায় প্রচন্ড যন্ত্রণা| দিয়াও মাথার পেছনে হাত দিয়ে দেখে জায়গাটা ফুলে আছে| চটচটে রক্ত হাতে লাগে| তার পিপাসা পায়| সে তার ব্যাকপ্যাকটা খোঁজে, কোথাও নেই | অন্যান্য জিনিস-গুলিও নেই | কিকব এখন দৈত্যটার হাতে | পানির জন্য দিয়াও দরজায় শব্দ করে, সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে যায় | দৈত্যটা সেখানে দাঁড়িয়ে – তার দুচোখে আগুন | দৈত্যটা তৈরী ছিল, তার হাতে একটা ছোট লাঠি | লোকটা ভেতরে ঢুকে কোন কথা না বলে লাঠি দিয়ে দিয়াওকে এলোপাথাড়ি পেটাতে থাকে| দিয়াও কুন্ডলি পাকিয়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে আর ব্যথায় চেঁচাতে থাকে | অনেকক্ষণ পিটিয়ে ক্লান্ত হয়ে লোকটা ঘর বন্ধ করে চলে যায়| দিয়াও অজ্ঞানের মতো পড়ে থাকে | ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে|

শেষ রাতে তার ঘুম ভাঙ্গে| সারা শরীরে ব্যথা | তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে| দিয়াও উঠে বসে| পানির পিপাসা অসহ্য হলে সে দরজায় শব্দ করে, কেউ সাড়া দেয় না | বারবার শব্দ করার পর হঠাৎ দরজাটা খুলে যায় | এবারে দৈত্যটা ঘরে ঢুকে দিয়াওকে লাথি মারতে থাকে | লোকটার গায়ে দৈত্যের মতোই জোর | দিয়াও আবার কুন্ডলি পাকিয়ে পড়ে পড়ে মার খায় আর চেঁচায় | একসময় অবসন্ন দিয়াওর চেঁচানি থেমে যায় | লোকটাও তখন থামে | দিয়াও সারারাত মড়ার মতো পড়ে থাকে|

পরদিন মেয়েটি দিয়াওকে খাবার দিতে আসে, সঙ্গে লোকটা| তার হাতে এক বালতি পানি, সে দিয়াওর মুখে পানি ছুঁড়ে মারে; দিয়াও জেগে ওঠে|

"শোন ছোকরা, এই মেয়েটার নাম 'এক নম্বর' | আর আজ থেকে তোমার নাম 'দুই নম্বর'| কথাটা মনে রেখো|"

মেয়েটা খাবার আর পানি নামিয়ে রাখে| তরপর দুজনে বেরিয়ে যায় | দরজা বন্ধ হয়ে যায় | দিয়াও পানি খায় | সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা | খুব কষ্ট করে সে খেতে থাকে | দৈত্যটার পরিকল্পনা সে বুঝতে পারে| মেয়েটার মতো তাকেও লোকটা দাস হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে | সে মাথার পেছনে হাত দিয়ে আশ্বস্ত হয়| তার সুপারকাটার যন্ত্রটা যথাস্থানে আছে|

রাতে খাবার দিতে এসে লোকটা হঠাৎ 'দুই নম্বর' বলে হাঁক দেয় | দিয়াও তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়, লোকটা দেরি না করে হাতের লাঠি দিয়ে দিয়াওকে আবার মারতে থাকে | দিয়াও কাতরায় | মেয়েটি ভয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে | দিয়াও জ্ঞান হারাবার পর তারা খাবার রেখে চলে যায়|

শেষ রাতে দিয়াওর জ্ঞান ফেরে | অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পানি খায়, খাবার খায়|

সে বাঁচার কৌশল নিয়ে ভাবতে শুরু করে | এরপর থেকে লোকটা দুই নম্বর বলে হাঁক দিলেই দিয়াও উঠে দাঁড়ায়| তার

হুকুম পালনের চেষ্টা করে | মারের সংখ্যাও কমে আসে | মাঝে মাঝে মেয়েটির আর্তনাদ শুনে দিয়াও বুঝতে পারে যে তাকেও মাঝে মাঝে মার খেতে হয় | এইভাবে কিছুদিন দিয়াও লোকটাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে | কিছুদিন পর মাঝে মাঝে মেয়েটি একাই খাবার নিয়ে আসে | লোকটা আশেপাশেই থাকে | মেয়েটির সাথে দিয়াওর চোখে চোখে কথা হয় | ভয়ে সে মুখ খোলে না |

প্রায় দু'সপ্তাহ ঘরবন্দী থাকার পরে লোকটা একদিন মেয়েটিকে ঘরে তালাবন্দী রেখে দিয়াওর কোমরে শিকল বেঁধে তাকে নিয়ে বেরোয় | ঘরবাড়ি খুঁজে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করে সে দিয়াওর মাথায় বোঝা চাপিয়ে দেয় | এভাবে কোনদিন দিয়াওকে, কোনদিন মেয়েটিকে দিয়ে সে বোঝা বহনের কাজ করায় | কিন্তু কাজের শেষে দিয়াওকে সবসময় বন্দী করে রাখে | মেয়েটি রান্না করে, লোকটাকে খেতে দিয়ে দিয়াওকে খাবার দিয়ে যায় | তারা চোখে চোখে কথা বলে | দিনের পর দিন মেয়েটার বিষণ্ন মুখ দেখে তার জন্য দিয়াওর মনে গভীর মায়া তৈরী হয় | তার মনে হয় মেয়েটা তার খুব আপন কেউ |

শীত শেষ হয়ে এসেছে | বসন্তের আবির্ভাব অনুভব করা যায় গাছে গাছে, আর বাতাসের উষ্ণতায় | কথা বলার সুযোগ নেই | চোখে চোখে কথায় আর সামান্য স্পর্শে মেয়েটি আর দিয়াও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে | দিয়াওর মনে হয় মেয়েটি এই দৈত্যটার হাত থেকে মুক্তি চায় | অনুভব করে যে তারা দুজনেই একে অপরের ওপর নির্ভর করে | একদিন খাবার সময় সুযোগ পেয়ে দিয়াও ফিসফিস করে মেয়েটিকে তার নাম জিজ্ঞেস করে |

"আমার নাম কিকি" মেয়েটিও ফিসফিস করে উত্তর দেয় |

"এই দৈত্যটার নাম কি?" দিয়াও আবার ফিসফিস করে |

"লোকটা পুরোহিত প্রধান বিহাও |"

শুনে দিয়াও চমকে ওঠে |

"সে কী করতে চায়?" বিস্মিত ভীত দিয়াও প্রশ্ন করে |

"সে দাসদাসী সংগ্রহ করে একটি পুরোহিত শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় |"

এরপর সেদিন আর কথা হয় না | ধীরে ধীরে কিকির কাছে সে আরো অনেক কিছু জানতে পারে | পুরোহিত বিহাও চায় ধর্মকে ব্যবহার করে দাসপ্রথার প্রচলন ও কোদন্ড শাসন করতে | কুকুন্ড ভাইরাসের আক্রমণের আগে সে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গ্রহের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল | ভাইরাসের আক্রমণে কোদন্ড জনহীন হয়ে যাওয়ায় তার পরিকল্পনা ভেস্তে যায় | কিন্তু সে হাল ছাড়েনি | কিকি আর দিয়াও তার প্রথম দুজন দাস | আরো দাস সংগ্রহ করে সে তার রাজ্য গড়ে তুলতে চায় | কিকির মতো মেয়েদের দাস বানিয়ে সে বংশ বিস্তার করতে চায় | মহামারীর কারণে কিকির বাবা মা মারা যান | কিকির বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী | তাঁর একটি ব্যবসা ছিল পুরোহিতদের খাবার সরবরাহ করা | সেই উপলক্ষ্যে পুরোহিতের সাথে পরিচয় | মৃত্যুর আগে কিকির বাবা এই পুরোহিতের হাতে তাঁর ছেলেমেয়েকে সমর্পণ করেন | কিন্তু কিকির ছোট ভাই 'ভিনি' পুরোহিতের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ করে | বিহাও তাকে হত্যা করে; কিকি সেজন্য বিহাওকে ঘৃণা করে |

দিনের পর দিন যায় দিয়াও মুক্তির উপায় খোঁজে | দিয়াও আর কিকি দাস-দাসী হয়ে কাজ করে যায় | তাদের বন্দীদশা প্রলম্বিত হয় | কিন্তু দিয়াও তার মধ্যেই একটু একটু করে মুক্তির পরিকল্পনা করে আর সেগুলি কিকিকে জানায় | কিকি রাজি হয় | জিনিসপত্র সংগ্রহ করার সময় দিয়াও একদিন একটা জ্বালানির বোতল কৌশলে তার ঘরের কোনায় আবর্জনার মধ্যে লুকিয়ে রাখে |

নির্দিষ্ট রাতে খাওয়ার পর বিহাও যখন তার ঘরে তালা দিয়ে ঘুমোতে যায়, দিয়াও তখন কাজে লেগে যায় | সে তার মাথার পেছনে হাত দিয়ে ছোট সুপারকাটারটা বের করে আনে | বোতাম টিপে সে যন্ত্রটাকে চালু করে | ছুরির মতো একটা ফলা বের হয়ে আসে | সেটা দিয়ে দিয়াও দেওয়ালে চক্রাকারে একটা আঁচড় দেয় | প্রথমে দেওয়ালে একটা সুতোর মতো দাগ হয় | যতবার তাতে সে আঁচড় দেয়, সুতোটা তত গভীর হতে থাকে | কাজটা পরিশ্রমসাধ্য; কিন্তু যন্ত্রটা অত্যন্ত কার্যকরী | সমস্ত রাত পরিশ্রম করে দিয়াও সেই ঘর থেকে পালানোর একটা পথ বানিয়ে ফেলে | সূর্য ওঠার একটু আগে সে জ্বালানির বোতলটা খুলে তার দরজার নিচে ঢেলে দেয় | তারপর সুপারকাটারের উল্টো দিকের বোতাম টিপে দরজার নিচে আগুন ছুঁড়ে দেয় | জ্বালানিতে আগুন লেগে দরজার ওপাশে মুহূর্তে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে | দিয়াও দেয়ালের কাটা জায়গায় মাথা ঢুকিয়ে দেয় | তারপর তার সমস্ত শরীর দেওয়ালের ওপাশে বেরিয়ে আসে | ইতিমধ্যে

বিহাও আগুন টের পেয়ে ভয়ানক চেঁচামেচি শুরু করেছে | দিয়াও দৌড়ে ঘরের সামনে চলে আসে | সেখান থেকে আনুমানিক দু'শ গজ সদর দরজার দিকে সে দৌড়ে যায় | আগুনের কারণে ইতিমধ্যে বিহাও আর কিকি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে | দিয়াও তার পরিকল্পনামতো এক জায়গায় কতগুলি পাথরের অবস্থান মনে রেখেছিল | সেখানে থেমে সে বিহাওকে লক্ষ্য করে পর পর কয়েকটি পাথর ছুড়ে মারে | কিকি বিহাও-র কাছ থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখে, যাতে তার গায়ে পাথর না লাগে | বিহাও একটা দানবীয় চিৎকার করে দিয়াওকে তাড়া করে | দিয়াও তীরের মতো ছুটতে থাকে | তার উদ্দেশ্য খোলা জায়গাগুলিতে যেন তার আর বিহাও-র মধ্যে অন্তত দু'শ গজের বেশি দূরত্ব থাকে | দিয়াওর কিকব বিহাও-র দখলে | কিন্তু কিকব দু'শ গজের বেশি দূরত্বে কার্যক্ষম নয় |

শহরের প্রায় সব অলিগলির নকশা দিয়াওর মাথায় আছে | সে গুদামঘরের দিকে দৌড়াতে থাকে | ক্ষিপ্রতায় দৈত্যটা তার সমকক্ষ নয় | সে দিয়াওকে ধরার জন্য প্রাণপণে দৌড়ায় | মোড় নেওয়ার সময় দিয়াও খেয়াল রাখে যাতে বিহাও তাকে হারিয়ে না ফেলে | ইতিমধ্যে বিহাও কিকব দিয়ে কয়েকবার দিয়াওকে আঘাত করতে চেষ্টা করেছে | দূরত্ব বজায় রাখার কারণে সে বেঁচে গেছে | সে জানে যে ঝুঁকিটা বিপজ্জনক, কিন্তু বিহাও-র দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঝুঁকিটা তাকে নিতেই হতো | প্রায় আধঘন্টা দৌড়ে দিয়াও গুদামঘরটা দেখতে পায় | দিয়াওর হাতে তখনও একটা পাথর | বিহাওকে ক্ষেপানোর জন্য দিয়াও মুহূর্তের জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে পাথরটা বিহাও-র দিকে ছুঁড়ে মারে | পাথরটা বেশিদূর যায় না | কিন্তু বিহাও তা দেখতে পায় | পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গুদামঘরের দরজা খোলাই ছিল | দিয়াও দৌড়ে গুদামঘরের ভেতরে ঢুকে যায় | বিহাও তা দেখতে পায় |

বিহাও তখন ক্রোধে অন্ধ | সে অন্ধের মতোই দিয়াওকে তাড়া করে গুদাম ঘরে ঢুকে পড়ে | দিয়াও বিশাল গুদামঘরের অর্ধেকের বেশি পার হয়ে যায় | তারপর সে আক্রান্ত হয়; কিন্তু সে থামে না | সে জানে তাকে কী করতে হবে | প্রাণপণে দৌড়ে গুদাম ঘর থেকে বেরিয়ে সে দরজার ছিটকিনি আটকে দেয় | তারপর সেই আরেক রাতের মতো মাটিতে শুয়ে গড়াতে থাকে | কিছুক্ষণ এভাবে গড়িয়ে সে ক্ষতবিক্ষত শরীরে ট্রাঙ্কনমুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় | এদিকে তার কথামত কিকি দূর থেকে বিহাওকে অনুসরণ করে এসেছে তাদের পেছন পেছন | বিহাও গুদাম ঘরে ঢোকার একটু পরেই কিকি সেদিকের দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে দেয় | বিহাও-র আর্তনাদ তারা শুনতে পায়, কিন্তু এরপর ট্রাঙ্কনের হাতে তার কী পরিণতি হ'ল সে খবর নেওয়ার কোন আগ্রহ দিয়াও বা কিকির অবশিষ্ট থাকে না | কিকির হাত ধরে আহত দিয়াও ধীরে ধীরে তার পুরনো বাসস্থানে ফিরে আসে | আগের মতোই সে নিজেকে পরিষ্কার করে | প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ করে | তারপর ঔষধ খায় | কিন্তু এবারে তার আগের মতো কষ্ট হয় না, কিকি তাকে সাহায্য করে | তার যখন জ্বর আসে তখন কিকি তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে | অল্পদিনের মধ্যে দিয়াও সুস্থ হয়ে ওঠে |

দিয়াও আর কিকি আরো কিছুদিন মৃত শহরে বসবাস করে | তারা খুঁজে খুঁজে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করে | ঔষধ, শুকনো খাবার, কাপড়, কম্বল, বর্ষাতি, জুতো, অস্ত্র, দড়ি, কাঠমিস্ত্রির যন্ত্রপাতি, পেরেক, নাট-বল্টু, আগুন ও আলো জ্বালাবার যন্ত্রপাতি, ফসলের বীজ, ফলের বীজ, ফুলের বীজ, আরো সব প্রয়োজনীয় জিনিস | এরপর একদিন এক বাড়িতে দিয়াও একজোড়া লশেল পেয়ে যায় | সঙ্গে এক ডজন গুলির ম্যাগাজিন | দিয়াও তার ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারে না! সম্ভবত কোন অস্ত্র ব্যবসায়ীর কাজ | সবশেষে তারা জোগাড় করে ফেলে দুটি 'ভিটোন' | ড্রিভার আলো ব্যবহার করে ভিটোন গাড়ি ঘন্টায় চল্লিশ মাইল বেগে চলে | অন্য কোন জ্বালানির প্রয়োজন হয় না |

এর প্রায় তিন মাস পরে এক শুভ সকালে দিয়াও আর কিকি সমস্ত মালপত্র ভিটোনদুটিতে চাপিয়ে সেই কুকুন্ড আর ট্রাঙ্কন আক্রান্ত শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে নতুন জীবনের সন্ধানে | দিয়াওর মনে প্রবল আত্মবিশ্বাস | কোদন্ড গ্রহে সে সৎ ও সুন্দর মানুষের এক সমাজ গড়ে তুলবে, যারা ধর্ম-বর্ণ-জাতি-ভাষা বা যে কোন ছুতোয় হানাহানি করবে না | বিহাওদের মতো নিষ্ঠুর পুরোহিতদের সেখানে কোন স্থান হবে না | সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক হবে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় | কিকি খুব খুশি কারণ সে তখন দেড় মাস অন্তঃসত্ত্বা | কোদন্ড গ্রহে দিয়াওর স্বপ্ন সফল করার জন্য আসছে তাদের সন্তান |

প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা ১৪২৮ (2021)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হবে।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
লেখা pdf করে পাঠাবেন না। ওয়ার্ড-এ পাঠাবেন। প্রসঙ্গত Vrinda টাইপও ঠিক হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
7614 Westmoreland Drive
Sugar Land, TX 77479
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২৫ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই ও বাংলা ছায়াছবির ডিভিডি আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com

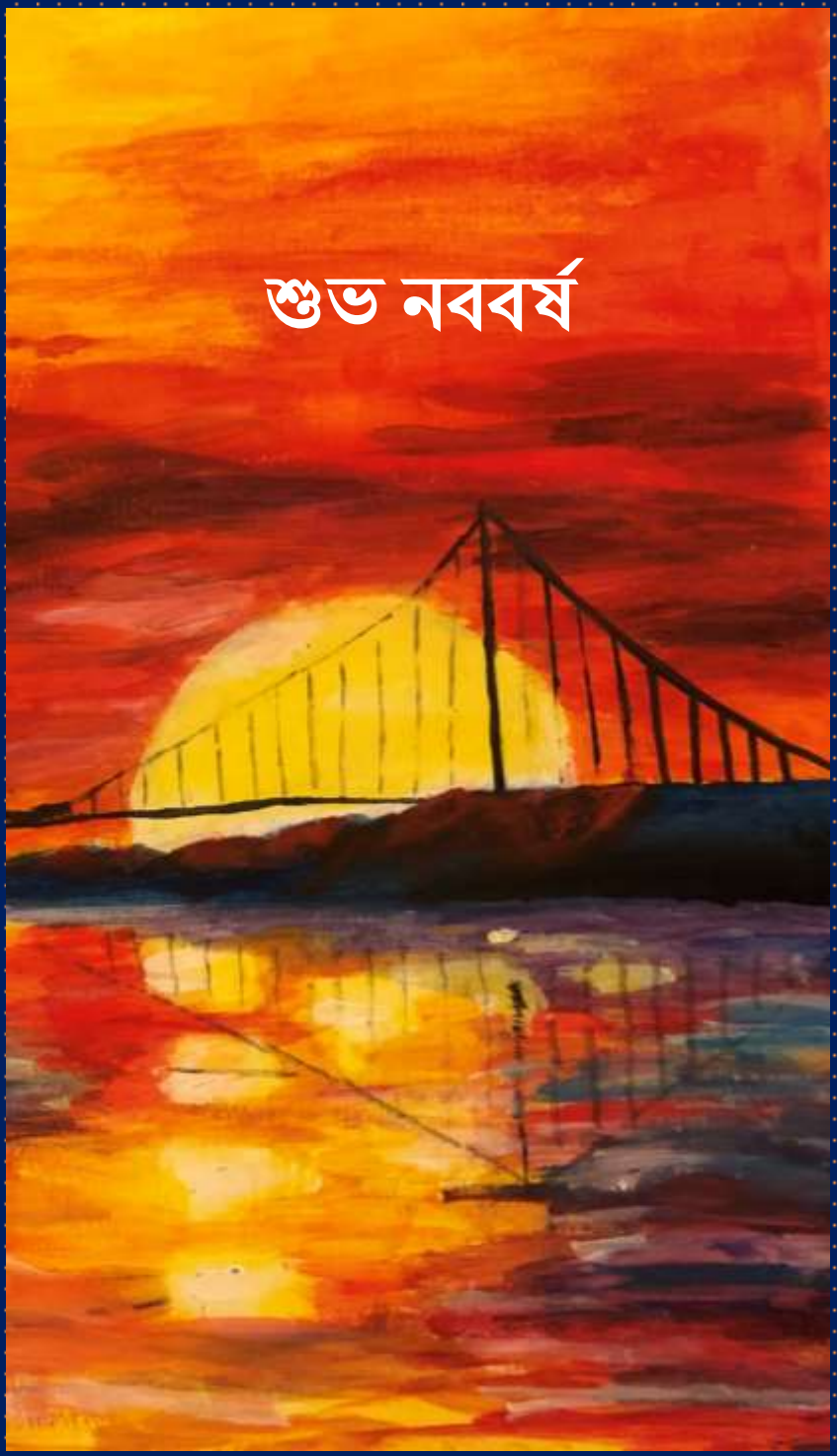
শুভ নববর্ষ